খুতুবাতে যুলফিকার [২৬]

শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী
হাফিযাহুল্লাহ

# এসো চিরশান্তির পথে

[ আল্লাহর মহব্বত ও নৈকট্য লাভের উপায়, তাওবার দর্শন, গুনাহ বর্জনের উপায়, ফিকহ ও তাসাওউফের ভিত্তি, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও কুধারণার প্রতিকার প্রভৃতি প্রসঙ্গে হৃদয়ছোঁয়া বয়ান ]

মুহাম্মাদ রাইহান খাইরুল্লাহ
অনূদিত

# এসো চিরশান্তির পথে

[আল্লাহর মহব্বত ও নৈকট্য লাভের উপায়, তাওবার দর্শন,
গুনাহ বর্জনের উপায়, ফিকহ ও তাসাওউফের ভিত্তি,
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও কুধারণার প্রতিকার
প্রভৃতি প্রসঙ্গে হৃদয়ছোঁয়া বয়ান]

**শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দা.বা.-এর**
বয়ান সংকলন **'খুতবাতে যুলফিকার'**-এর ২৬তম খণ্ড


**টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক**

https://t.me/islaMic_fdf

খুতবাতে যুলফিকার [২৬]

# এসো চিরশান্তির পথে

[আল্লাহর মহব্বত ও নৈকট্য লাভের উপায়, তাওবার দর্শন,
গুনাহ বর্জনের উপায়, ফিকহ ও তাসাওউফের ভিত্তি,
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও কুধারণার প্রতিকার
প্রভৃতি প্রসঙ্গে হৃদয়ছোঁয়া বয়ান]


মূল উর্দু বয়ান

**শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী** হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ

**মুহাম্মাদ রাইহান খাইরুল্লাহ**

দাওরা : মাদরাসা বাইতুল উলুম, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।
ইফতা : শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, খিলক্ষেত, ঢাকা।
উসতাদ : জামিয়া দারুল উলুম নূরিয়া, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।



মাকতাবাতুল আযহার

# খুতবাতে যুলফিকার (২৬)

## এসো চিরশান্তির পথে

মূল উর্দু শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী

অনুবাদ মুহাম্মাদ রাইহান খাইরুল্লাহ

MAKTABATUL AZHAR


প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৬ খ্রি.



গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক



মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

ইমেইল : maktabatulazhar@yahoo.com

| প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র | শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১ | শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২ |
|---|---|---|
| ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা | দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, | ৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট, |
| ☎ : 02 988 15 32 | ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, | জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, |
| ▪ : 019 24 07 63 65 | ঢাকা ▪ 017 15 02 31 18 | ঢাকা ▪ : 01975023118 |

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

বর্ণবিন্যাস : নির্ঝর বর্ণশীলন। ০১৯১৮৩৩৯৬৩৩

মূল্য : ২৬০ [দুশ ষাট] টাকা মাত্র

KHUTBATE ZULFIQAR [26]

Published by : Maktabatul Azhar, Dhaka, Bangladesh

Lecture : Shaikh Zulfiqar Ahmad Naqshbandi

Translated by : Muhammad Raihan Khairullah

Price : Tk. 260.00 US $ 20.00 only.

# নাযরানা

## 'তাকে'

যে আমার জীবনে এসেছিল শুকতারা হয়ে,
আমার জীবনকে সাজিয়েছিল রংধনুর সাত রঙে,
আমাকে দিয়েছিল অফুরন্ত সুখ ও অনাবিল শান্তি,
দিয়েছিল লেখালেখির উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা,
তার কাছে আমার প্রাপ্তি বলে শেষ হওয়ার নয়...!
এক সময় সে হারিয়ে গেছে
আমার জীবন থেকে,
দূরে, বহু দূরে...
হয়তো তারার দেশে...
নির্জন রাতে দূর আকাশের নিঃসঙ্গ চাঁদকে দেখে
তার কথা মনে পড়ে।
জানি না সে কোথায় আছে, কেমন আছে!
শুধু কামনা করি, মহান আল্লাহ যেন তাকে
সুখে রাখেন; সব সময়, সবখানে!

—অনুবাদক

## অনুবাদকের অভিব্যক্তি

শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুম-এর বয়ান সংকলন 'খুতবাতে যুলফিকার'। উর্দু ভাষায় এখন পর্যন্ত ৩২ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। মাকতাবাতুল আযহার সবগুলো খণ্ড বাংলায় প্রকাশ করার প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। এ বরকতময় কাজে শরিক থাকতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। তাঁর প্রতি অসংখ্য শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা।

বহু দিন থেকে খুতবাতে যুলফিকারের নাম শুনে আসছি, কিন্তু পড়ার সুযোগ হয়নি। অনুবাদের উসিলায় এ খণ্ডটি ভালো করে পড়ার ও হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ হয়েছে। আমার পাঠপ্রতিক্রিয়া বা অনুভূতি হলো- পীর সাহেবের বয়ান অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও উপকারী। তাঁর বয়ান পাঠ করলে অন্তরের কাইফিয়াত পরিবর্তন হয়ে যায়, অন্তর কোমল হয়। মানুষকে আল্লাহমুখী করতে এবং গুনাহ থেকে দূরে রাখতে বয়ানগুলোর জুড়ি নেই। অতি কঠিন হৃদয়কেও নাড়া দিবে এ সকল বয়ান।

শায়খ যুলফিকার নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুম বর্তমান বিশ্বে জীবিত পীরদের মধ্যে অন্যতম। পাকিস্তানি হলেও প্রায় সারা বছর বিভিন্ন দেশে সফরে থাকেন। সম্ভবত বর্তমানে তিনিই একমাত্র পীর, যিনি মুরীদদের প্রতি সরাসরি তাওয়াজ্জুহ প্রদান করেন আর তাতে মুরীদের মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়, কলব পরিষ্কার-ঝকঝকে হয়ে যায়।

আগে থেকেই হযরতের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা ছিল, এ তথ্য জেনে ইচ্ছেটা বেড়ে গেছে বহু গুণ। আমার যা অবস্থা, ভালো হওয়ার তো কোনো আশা দেখছি না! হযরতের নেক তাওয়াজ্জুহ লাভ করে যদি মানুষ হতে পারি...! আল্লাহ তাআলা যেন অতি দ্রুত সে সুযোগ করে দেন!

অনুবাদের ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছি মূল ভাব অক্ষুণ্ন রাখতে। 'কিতাবমেলা'য় প্রকাশিত হবে বলে সম্পাদনায় একটু তাড়াহুড়ো করতে

হয়েছে। তবুও বইটিকে নির্ভুলরূপে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে যথাসাধ্য কোশেশ করেছি। বিচারের ভার পাঠকের হাতে। কোথাও ভুল ধরা পড়লে জানানোর অনুরোধ। কৃতজ্ঞ থাকব ইনশাআল্লাহ।

বইটি পাঠ করে কারো জীবনে যদি পরিবর্তন আসে, তাহলে এত শ্রম সার্থক মনে করব। মহান আল্লাহ আমাদের এ মেহনতকে কবুল করে নিন!

বইটি প্রকাশ করা পর্যন্ত যতজনের কাছে সহযোগিতা পেয়েছি, সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা! আব্বাজানের কাছেও যথেষ্ট সহায়তা নিয়েছি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে জাযায়ে খায়র দান করুন, আমীন!

পরিশেষে পাঠকের কাছে আমার জন্য, শ্রদ্ধেয় আব্বু-আম্মুর জন্য, পরিবার-পরিজন ও আসাতিযায়ে কেরামের জন্য দুআর আবেদন জানাচ্ছি। আমিও আমার প্রিয় পাঠকদের জন্য অন্তর থেকে দুআ করব, ইনশাআল্লাহ!

— **মুহাম্মাদ রাইহান খাইরুল্লাহ** আফাল্লাহু আন্‌হ
মধ্যবাড্ডা, মোল্লাপাড়া, ঢাকা।
০৭-১০-২০১৬ খ্রি.

## সংক্ষিপ্ত সূচি


বয়ান : ১

আল্লাহর মহব্বতের ভিত্তি / ২১

বয়ান : ২

আল্লাহর নৈকট্যের স্তর / ৬৫

বয়ান : ৩

তাওবার দর্শন / ৮৯

বয়ান : ৪

ফিকহ্ ও তাসাওউফের ভিত্তি / ১৪৫

বয়ান : ৫

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা / ১৯৩

বয়ান : ৬

কুধারণার প্রতিকার / ২১৯

বয়ান : ৭

বিস্ময়কর আটটি বিষয় / ২৫১

# সূচিপত্র

## বয়ান : ১
## আল্লাহর মহব্বতের ভিত্তি


চয়নিকা ........................................ ২২
মহব্বতের খামির ........................................ ২৩
মহব্বতের স্থান ও ফলাফল ........................................ ২৪
তোমার উপর আমার হক রয়েছে... ........................................ ২৪
আল্লাহ তাআলার মহব্বত লাভের কিছু দুআ ........................................ ২৫
দুতরফা ভালোবাসা : আদর্শ ভালোবাসা ........................................ ২৭
প্রিয়তমের সান্নিধ্যের প্রতি ব্যাকুলতা ........................................ ২৮
পরিচয় ও মহব্বত একে অপরের সম্পূরক ........................................ ২৯
প্রকৃত অনুগ্রহকারীর প্রতি ভালোবাসা ........................................ ২৯
মারেফতের ভিত্তি ........................................ ৩০
দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি ........................................ ৩০
আল্লাহর মহব্বতের পরিণতি ........................................ ৩১
আরেক কদম অগ্রসর হওয়ার সুযোগ ........................................ ৩১
খাঁটি ভালোবাসা ........................................ ৩২
নির্ভেজাল ভালোবাসার প্রমাণ ........................................ ৩৩
প্রথম বিষয় ........................................ ৩৩
দ্বিতীয় বিষয় ........................................ ৩৩
তৃতীয় বিষয় ........................................ ৩৪
ভালোবাসার বাস্তবতা ........................................ ৩৪
আল্লাহর মহব্বতের ভিত্তি ছয়টি বিষয়ের উপর ........................................ ৩৪
১. মৃত্যুর প্রতি মহব্বত ........................................ ৩৫
২. দুনিয়া বিমুখতা ........................................ ৩৫

৩. সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকা ........................................ ৩৬
৪. আল্লাহর প্রতীকসমূহের প্রতি ভালোবাসা থাকা ........................ ৩৬
৫. গভীর রাতের মুনাজাতের আকাঙ্ক্ষা নসিব হওয়া ........................ ৩৭
৬. ঈমানদারদের প্রতি অনুরাগ থাকা ........................................ ৩৮
তিনটি বিস্ময়কর তথ্য ........................................................ ৩৮
আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বত কেমন হওয়া উচিত?........................ ৩৯
সেই যুগ এসে গেছে! ........................................................ ৪০
ইবলিসের দুর্ভাগ্যের মূল কারণ ..............................................৪১
মহব্বতের পরীক্ষা ............................................................ ৪২
ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী... ........................................................ ৪২
ধোঁকা ও বাস্তবতার পরিচয় .................................................. ৪৪
আল্লাহর প্রতি ধ্যানের পুরস্কার .............................................. ৪৪
একটি সংশয়ের নিরসন ...................................................... ৪৫
ইবাদতের নগদ পুরস্কার ...................................................... ৪৬
আল্লাহ তাআলার রক্ষণাবেক্ষণ .............................................. ৪৬
একটি মজার কথা ............................................................ ৪৭
ভালোবাসার জোয়ার .......................................................... ৪৮
মহব্বতকারীদের সাথে ওঠাবসার বিধান .................................. ৪৮
আল্লাহর অসন্তুষ্টির মারাত্মক পরিণতি .................................... ৪৯
আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পুরস্কার .............................................. ৪৯
মর্যাদাবান মানুষ .............................................................. ৫০
ধৈর্যশীল মানুষ ................................................................ ৫০
আল্লাহ তাআলার প্রতিবেশী .................................................. ৫০
সুসময় ..........................................................................৫১
একটি সুসংবাদ ................................................................ ৫২
জাহান্নাম থেকে মুক্তি— এতটুকু আমলের মাধ্যমে... ........................ ৫৩
আমাদের গুনাহের অবস্থা .................................................... ৫৩
যে অন্তর থেকে আপন রবকে ডাকবে... .................................... ৫৪
তার কান্না এতই পছন্দ হয়েছে যে... ........................................ ৫৫
তবে তো কোনো সমস্যা নেই... .............................................. ৫৫
ক্ষমা করার বাহানা ............................................................ ৫৬

আল্লাহ আর কবে দিবেন আমায়? ........................................ ৫৬
মহব্বতের ইশারা ........................................ ৫৭
মহব্বত লাভ হয় মেহনতে ........................................ ৫৭
আল্লাহর সৌন্দর্যের গর্ব ........................................ ৫৮
আল্লাহর প্রেমিক ........................................ ৫৯
আল্লাহপ্রেমীদের কাফেলা ........................................ ৬১
আল্লাহর কাছে আল্লাহকে চেয়ে নিন! ........................................ ৬১

## বয়ান- ২ :
## আল্লাহর নৈকট্যের স্তর

চয়নিকা ........................................ ৬৬
সবচেয়ে বড় নেয়ামত ........................................ ৬৭
আল্লাহর নৈকট্য কীভাবে অর্জিত হবে? ........................................ ৬৮
আদব-শিষ্টাচার অর্জন ........................................ ৬৮
দীন হলো আদবের নাম ........................................ ৬৯
আদব ও উপকারী ইলম ........................................ ৭০
হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর আদব ........................................ ৭১
আমার মুরশিদের আদব ........................................ ৭২
হযরত গোলাম রাসূল রহ. এর আদব ........................................ ৭২
উপকারী ইলমের মাধ্যমে আমল নসিব হয় ........................................ ৭৪
আমলের মাধ্যমে হিকমত নসিব হয় ........................................ ৭৫
হিকমত কী? ........................................ ৭৫
হিকমতের ফলাফল : দুনিয়াবিমুখতা ........................................ ৭৮
দুনিয়াবিমুখতা : বাস্তবতা ........................................ ৭৯
একটি ঘটনা ........................................ ৭৯
দুনিয়াবিমুখতার মাধ্যমে আখেরাতের ভাবনা অর্জন হয় ........................................ ৮১
আখেরাতের ফিকিরের পুরস্কার : আল্লাহর নৈকট্য ........................................ ৮২
কিছু পাওয়ার দুই পদ্ধতি ........................................ ৮২
সম্পর্কের মাধ্যমে নেয়া ........................................ ৮৩
ফেরেশতাদেরকে দেখাতে... ........................................ ৮৪
সারকথা ........................................ ৮৪
দুতরফা ভালোবাসা ........................................ ৮৫

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এর দুআ ........................................ ৮৬

## বয়ান- ৩ :
## তাওবার দর্শন

চয়নিকা ........................................ ৯০
গুনাহ কাকে বলে? ........................................ ৯১
তাওবা কী? ........................................ ৯১
তাওবার গুরুত্ব ........................................ ৯২
তাওবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ........................................ ৯২
আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার দশটি প্রতিবন্ধক ........................................ ৯৩
প্রথম প্রতিবন্ধক : আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অজ্ঞতা ........................................ ৯৩
সর্বজ্ঞানী ও সহনশীল সত্তা ........................................ ৯৪
হান্নান ও মান্নান-এর গুণ ........................................ ৯৫
অজ্ঞতা দূরত্ব সৃষ্টি করে ........................................ ৯৫
পরিচয় ভালোবাসা সৃষ্টি করে ........................................ ৯৬
দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক : বিদআত ........................................ ৯৭
বিদআত কীভাবে শুরু হয়? ........................................ ৯৮
আমল কবুল হওয়ার দুটি শর্ত ........................................ ১০০
সুন্নাত ও বিদআতের মাঝে পার্থক্য ........................................ ১০০
তৃতীয় প্রতিবন্ধক : অভ্যন্তরীণ রোগ ........................................ ১০১
চতুর্থ প্রতিবন্ধক : কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া ........................................ ১০২
পঞ্চম প্রতিবন্ধক : সগীরা গুনাহ ........................................ ১০২
সগীরা গুনাহ কীভাবে কবীরা হয়? ........................................ ১০৩
১. বারবার একই গুনাহ করা ........................................ ১০৩
২. গুনাহকে ক্ষুদ্র মনে করা ........................................ ১০৩
৩. পাপকে উপভোগ করা ........................................ ১০৪
৪. গুনাহ গোপন রাখার কারণে স্পর্ধা দেখানো ........................................ ১০৫
৫. প্রকাশ্যে গুনাহ করা ........................................ ১০৫
৬. অনুসরণীয়দের গুনাহ ........................................ ১০৫
ষষ্ঠ প্রতিবন্ধক : শিরক ........................................ ১০৬
সপ্তম প্রতিবন্ধক : সম্পদশালীদের বিলাসিতা ........................................ ১০৭
অষ্টম প্রতিবন্ধক : উদাসীনতা ........................................ ১০৮

নবম প্রতিবন্ধক : রসম-রেওয়াজ ........................................ ১০৮
দশম প্রতিবন্ধক : স্বনির্ভরতা ........................................ ১০৯
যে কাউকে মানে না ........................................ ১০৯
ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শ্রেষ্ঠত্ব ........................................ ১১১
ফিকহ বোর্ড ........................................ ১১১
ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মেধা ........................................ ১১২
তাওবার নিয়ত ........................................ ১১২
তাওবার রুকন ........................................ ১১৫
প্রথম রুকন : ইখলাস ........................................ ১১৫
দ্বিতীয় রুকন : গুনাহ থেকে বিরত হওয়া ........................................ ১১৫
তৃতীয় রুকন : লজ্জা-অনুতাপ ........................................ ১১৬
তাওবা কীভাবে করবে? ........................................ ১১৬
১. তাওবার সূচনা ........................................ ১১৭
২. গুনাহের স্থল বর্জন ........................................ ১১৭
৩. রোযার আধিক্য ........................................ ১১৮
৪. আখেরাতের ভাবনা ........................................ ১১৯
৫. সব ধরনের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা ........................................ ১২০
গুনাহ বর্জনের উপায় ........................................ ১২০
প্রথম করণীয় : গুনাহের মন্দ পরিণতির প্রতি দৃষ্টিপাত ........................................ ১২০
১. অপদস্থতা ........................................ ১২০
২. চেহারার মলিনতা ........................................ ১২১
৩. আত্মার কলুষতা ........................................ ১২১
৪. দুশমনের মোকাবেলায় দুর্বলতা ........................................ ১২২
৫. পরিবারের কাছে ভালোবাসা লোপ পাওয়া ........................................ ১২২
৬. নিজের প্রতি ঘৃণা ........................................ ১২২
৭. বান্দা ও আল্লাহর মাঝে ঘৃণার দেয়াল ........................................ ১২২
৮. নিরন্তর অনুতাপ ........................................ ১২৩
৯. রিযিকের স্বল্পতা ........................................ ১২৩
খরচের খাত দেখে আয়ের উৎস নির্ণয় ........................................ ১২৫
১০. প্রভাব লোপ পাওয়া ........................................ ১২৬
১১. শয়তানের প্রাধান্য বিস্তার ........................................ ১২৭

১২. হৃদয়ের মরিচা ..........১২৭
১৩. নেক কাজের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া ..........১২৭
১৪. আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হওয়া ..........১২৮
১৫. ইলম থেকে মাহরুমি ..........১২৮
১৬. বয়স কমে যাওয়া ..........১২৮
১৭. ইসলামের শত্রুদের সাথে সাদৃশ্য ..........১২৯
দ্বিতীয় করণীয় : আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ ..........১২৯
তৃতীয় করণীয় : আল্লাহর ভয় ..........১৩০
চতুর্থ করণীয় : মৃত্যুর স্মরণ ..........১৩০
পঞ্চম করণীয় : আত্মশুদ্ধি ..........১৩০
ষষ্ঠ করণীয় : আত্মজিজ্ঞাসা ..........১৩১
সপ্তম করণীয় : বুযুর্গদের সাহচর্য গ্রহণ ..........১৩১
তাওবা কবুল হওয়ার লক্ষণ ..........১৩১
১. পরবর্তী জীবন আগের চেয়ে উত্তম হওয়া ..........১৩২
২. পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকা ..........১৩২
৩. গুনাহের কামনা মুক্ত হওয়া ..........১৩২
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা .......... ১৩৩
৪. বিনয় ..........১৩৪
রিযিকে বরকত হওয়ার আমল ..........১৩৪
তাওবা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ ..........১৩৫
তাওবার নিয়ত করে নিন ..........১৩৬
নবীগণের ক্ষেত্রে আল্লাহর পরাক্রমশালিতা ..........১৩৬
এখনি তাওবা করে নিন! ..........১৪০

## বয়ান- ৪ :
## ফিকহ ও তাসাওউফের ভিত্তি

চয়নিকা ..........১৪৬
তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধির মেহনত ..........১৪৭
বায়আতের উদ্দেশ্য ..........১৪৭
ভাবনার বিষয় .......... ১৪৮
শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত .......... ১৪৮
তাসাওউফ শাস্ত্র কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ভাবিত ..........১৪৯

ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভাবন ........................................ ১৫০
হযরত ইবনে মাসউদ রা. হলেন বীজ বপনকারী ........................................ ১৫০
হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর ইলমি অবস্থান ........................................ ১৫১
পানি সিঞ্চন করেছেন আলকামা রহ. ........................................ ১৫২
ফসল কর্তন করেছেন ইবরাহীম নাখায়ী রহ. ........................................ ১৫২
ফসল মাড়াই করেছেন হাম্মাদ রহ. ........................................ ১৫৩
পিষেছেন ইমাম আবু হানীফা রহ. ........................................ ১৫৪
ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ইলমি অবস্থান ........................................ ১৫৫
চল্লিশ বছর এশার অযু দিয়ে ফজরের নামায ........................................ ১৫৬
খামিরা তৈরি করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ........................................ ১৬০
রুটি তৈরি করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ........................................ ১৬১
ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর ইলমি অবস্থান ........................................ ১৬২
আমাদের কাজ শুধু রুটি খাওয়া ........................................ ১৬৩
তাসাওউফ কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ........................................ ১৬৩
তাসাওউফের উদ্দেশ্য ........................................ ১৬৪
আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায় ........................................ ১৬৪
তিনটি মৌলিক বিষয় ........................................ ১৬৫
১. স্বল্প আহার ........................................ ১৬৫
ক্ষুধার্ত থাকার ফযিলত ........................................ ১৬৬
সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ ........................................ ১৬৭
অনাহারের দশটি উপকারিতা ........................................ ১৬৮
অপছন্দনীয় দুটি বস্তু ........................................ ১৬৮
মুনাজাত ও মুলাকাতের মধ্যে তফাত ........................................ ১৬৯
শূন্য উদরের স্বাদ ........................................ ১৭০
২. তাহাজ্জুদের পাবন্দি ........................................ ১৭০
৩. শায়খের সাথে সম্পর্ক ........................................ ১৭১
এখনি সময়... ........................................ ১৭২
আল্লাহপ্রত্যাশীদের অবস্থা ........................................ ১৭৩
আমাদের আমল প্লাস্টিকের ফুলের মতো ........................................ ১৭৫
তিনটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব ........................................ ১৭৫
১. আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি ........................................ ১৭৫

২. সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি বিমুখতা ..............................১৭৬
৩. ইখলাস ও তলব ..................................................১৭৭
দুই রকম বীজ ..................................................... ১৮০
দুই ধরনের জন্তু ...................................................১৮১
দুই প্রকারের মানুষ ...............................................১৮১
আমাদের চেয়ে তো গাছই ভালো ..................................১৮২
উদ্দেশ্য ভুলে যাবেন না! ..........................................১৮২
স্থিরতার গুরুত্ব .................................................... ১৮৩
তরবারির ছায়ায় আমল ........................................... ১৮৪
সুযোগ পাওয়া যায় না কেন? ..................................... ১৮৪
অনুশোচনার অনুভূতির বরকত .................................... ১৮৫
অজ্ঞতার প্রতিষেধক হলো মহব্বত ................................. ১৮৭
আল্লাহর রহমতের প্রতি ভরসা .................................... ১৮৮
অসহায়ের সহায়— আল্লাহ ........................................ ১৮৮
হযরত ঈসা আ. এর নসিহত .......................................১৯০
বান্দার জন্য আল্লাহর অপেক্ষা ....................................১৯১

## বয়ান- ৫

## আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

চয়নিকা ..............................................................১৯৪
ইসলাম হলো স্বভাবজাত ধর্ম ........................................১৯৫
দুতরফা সম্পর্ক .....................................................১৯৬
ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য ..............................................১৯৬
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ........................................১৯৭
মজবুত সমাজের জন্য বুনিয়াদি চারটি বিষয় ........................১৯৭
শরীর ও আত্মার উদাহরণ ...........................................১৯৮
গৃহের মাঝে দীন হলো আত্মার ন্যায় ................................১৯৯
মানুষ ও রোবটের মাঝে পার্থক্য .................................... ২০০
ভালোবাসাও হতে হবে শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে ............. ২০৩
মুহাম্মাদি শরীয়তের সুন্দর শিক্ষা ................................... ২০৪
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার উপকারিতা .............................. ২০৭

ভালোবাসা বৃদ্ধি ........ ২০৮
সম্পদ বৃদ্ধি ........ ২০৮
বয়স বৃদ্ধি ........ ২০৮
রিযিকে প্রশস্ততা ........ ২০৯
অপমৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকা ........ ২০৯
পাপ মোচন ........ ২১১
আমল কবুল হওয়া ........ ২১১
জান্নাত লাভ ........ ২১২
রহমত বর্ষণ ........ ২১২
বরকত বর্ষণ ........ ২১২
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ ........ ২১২
আত্মীয়তা ছিন্ন করার অপকারিতা ........ ২১৩
দুনিয়াতেই শাস্তি ........ ২১৩
জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া ........ ২১৫
শবে কদরের ফযিলত থেকে বঞ্চিত হওয়া ........ ২১৫
জুমআর বরকত থেকে মাহরুমি ........ ২১৫
আল্লাহর রহমত থেকে মাহরুমি ........ ২১৫
তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ ........ ২১৬
সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও! ........ ২১৬
নিজেকে পর্যবেক্ষণ করুন ........ ২১৭
আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক তৈরি করুন ........ ২১৭

## বয়ান– ৬
## কুধারণার প্রতিকার

চয়নিকা ........ ২২০
আল্লাহর স্মরণ ........ ২২১
অন্তরের যিকিরের ফযিলত ........ ২২২
আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ সৃষ্টির পদ্ধতি ........ ২২২
সত্তাগত ও গুণগত তাজাল্লীর মধ্যে পার্থক্য ........ ২২৩
‘আল্লাহ আল্লাহ’র যিকির কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ........ ২২৪
একটি প্রশ্নের উত্তর ........ ২২৫
আল্লাহ আল্লাহ ডাকের স্বাদ ........ ২২৬

আল্লাহ শব্দের প্রভাব ....................২২৬
কুধারণা কখন হয়? .................... ২২৭
কুধারণা কী? .................... ২২৮
কুধারণার চিকিৎসা ....................২২৯
যুন নুন মিসরী রহ. এর ঘটনা ....................২২৯
আলী হাজবীরী রহ. এর ঘটনা .................... ২৩০
মনের উপর শয়তানের কব্জা ....................২৩১
পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়! ....................২৩১
এমন সুধারণা থাকা উচিত .................... ২৩২
মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি .................... ২৩২
জুনাইদ বাগদাদী রহ. এর অন্তর্দৃষ্টি .................... ২৩৩
হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. এর ঘটনা .................... ২৩৩
অন্তর্দৃষ্টির প্রার্থনা করো! .................... ২৩৫
কুধারণার অস্ত্র কখন কার্যকর হয়? .................... ২৩৫
কুধারণার অপারেশন .................... ২৩৬
ধোপার কাছে ময়লা কাপড়ই আসে! .................... ২৩৬
শবে কদরের ফযিলত থেকে বঞ্চিত হওয়া .................... ২৩৭
মুক্তির ভার আল্লাহর হাতে থাকায় রক্ষা! .................... ২৩৭
নিজের ভালো এবং অন্যের মন্দ দেখা .................... ২৩৮
শায়খ হলেন আয়নার মতো .................... ২৪০
আল্লাহওয়ালাদের বিচক্ষণতা ....................২৪১
তুমি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছ? .................... ২৪২
কুধারণা একটা চারিত্রিক ব্যাধি .................... ২৪৩
রাসূল সা. এর ব্যাপারে এক যুবকের কুধারণা .................... ২৪৩
আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কুধারণা .................... ২৪৭
কান্নার বিষয় .................... ২৪৮

## বয়ান- ৭
## বিস্ময়কর আটটি বিষয়

চয়নিকা .................... ২৫২
কাফের ও মুমিনের জীবনের মধ্যে পার্থক্য .................... ২৫৩
দুনিয়ার ধোঁকা .................... ২৫৪

আশি বছরের বুড়োর আত্মপ্রবঞ্চনা ........ ২৫৫
এক সেক্রেটারি সাহেবের আত্মপ্রবঞ্চনা ........ ২৫৬
বিস্ময়কর আটটি বিষয় ........ ২৫৭
প্রথম বিষয় ........ ২৫৭
দ্বিতীয় বিষয় ........ ২৫৯
তৃতীয় বিষয় ........ ২৬০
চতুর্থ বিষয় ........ ২৬১
পঞ্চম বিষয় ........ ২৬৫
ষষ্ঠ বিষয় ........ ২৬৬
সপ্তম বিষয় ........ ২৬৮
অষ্টম বিষয় ........ ২৭১

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

(سورة البقرة : ١٦٥)

বয়ান- ১

# আল্লাহর মহব্বতের ভিত্তি

محبت الٰہی کا مدار

বয়ান : হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী

দামাত বারাকাতুহুম

# চয়নিকা

আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বত কেমন হতে হবে? ছোট্ট শিশু যেভাবে মাকে মহব্বত করে তেমন হতে হবে। ছোট্ট বাচ্চাকে মায়ের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরালে সে কেমন ব্যাকুল হয়ে যায়! কী কান্নাকাটিই না করে! তাকে শিক্ষিত মহিলা কোলে নিক, সুন্দরী নারী কোলে নিক বা অন্য যেমন মহিলাই কোলে নিক না কেন, সে মায়ের কোলে ফিরে না আসা পর্যন্ত কান্না বন্ধ করে না। এর কারণ হলো– শিশুটি তার মাকে মহব্বত করে। সে থেমে যায় না, অস্থির হয়ে থাকে, কান্নাকাটি করে। মা যতই ব্যস্ত হন না কেন, সব কাজ ফেলে ছুটে আসেন এবং সন্তানকে বুকে তুলে নেন। মাকে ছাড়া শিশু যেমন স্থির থাকে না, হায়, আমাদেরও যদি তেমনি আপন প্রতিপালকের সান্নিধ্য ছাড়া শান্তি লাভ না হত! এমন মহব্বত যেন আমাদেরও নসিব হয়! আমীন!

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ:

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ .

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ . وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ .

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ.

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

'আল্লাহর প্রতি ঈমানদারদের প্রবল ভালোবাসা হয়ে থাকে!'

(সূরা বাকারা : ১৬৫)

মুমিনরা আল্লাহ তাআলার প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা পোষণকারী হয়ে থাকেন।

## মহব্বতের খামির

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে তাঁর মহব্বতের খামিরে তৈরি করেছেন। প্রতিটি মানবের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবেই সত্যানুসন্ধান ও সত্যানুসন্ধিৎসার প্রবল আগ্রহ থাকে। মহানবী সা. এ কথাটিই এভাবে বলেন–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.

'প্রতিটি মানবসন্তানই ইসলামি ফিতরাত তথা স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।'

(সহীহ বুখারী : হাদীস নং ১৩৮৫)

যখন মানবসন্তান কালিমা পড়ে নেয় তখন সে আল্লাহকে মহব্বতকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ প্রতিটি ঈমানদারের অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত থাকে। অবশ্য কম-বেশির পার্থক্য থাকে। যে পরিশ্রম করে তার অন্তরে মহব্বতের প্রকৃতি গভীর থেকে গভীর হয় এবং হৃদয়ের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। আর যে উদাসীনতায় লিপ্ত হয় তার অন্তরে মহব্বত থাকলেও সেই মহব্বতের পরিমাণ কিছুটা কম হয়।

## মহব্বতের স্থান ও ফলাফল

তাসাওউফ ও সুলুকের যতগুলো স্তর রয়েছে তার সারনির্যাস হলো আল্লাহ তাআলার মহব্বত। কিছু স্তর এর জন্য ভূমিকাস্বরূপ, যেমন- তাওবা, আল্লাহমুখিতা, দুনিয়াবিমুখতা ও সাধনা। উক্ত মহব্বত অর্জনের জন্য এমন দশটি ভূমিকা রয়েছে। যখন মহব্বত অর্জিত হয়ে যায় তখন বাকি স্তরগুলো তার ফলাফল হিসেবে অর্জিত হয়। যেমন- সবর, আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সন্তুষ্টি ও তা মেনে নেয়া। এ সবই মহব্বতের ফলাফল। আসল উদ্দেশ্য এটাই যে, অন্তর আল্লাহ রব্বুল ইযযতের মহব্বতে ভরপুর হয়ে যাবে, যাতে তার ইবাদত-বন্দেগি করা সহজ হয়ে যায়।

## তোমার উপর আমার হক রয়েছে...

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يا ابن آدم! خلقت أشياء لك وخلقتك لي.

‘হে আদম সন্তান, আমি বস্তুসমূহকে তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি আর তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছি।’

সুতরাং পুরো দুনিয়া সৃজিত হয়েছে মানুষের জন্য আর মানুষ সৃজিত হয়েছে দয়াময় আল্লাহর জন্য।

আরেকটি হাদীসে কুদসীতে আছে–

يا عبدي أحقي آدم إني لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا.

‘ওহে আদম-সন্তান, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাই তোমার উপর আমার হক রয়েছে যে, তুমি আমাকে ভালোবাসবে!’

(আন নবুওয়াত : ১/৭৯)

তাই তো হাদীসে এসেছে, রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন–

لا إيمان لمن لا محبة له.

'যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা নেই তার ঈমানই নেই।'

(মাউসুআতুল খুতাব : ১)

## আল্লাহ তাআলার মহব্বত লাভের কিছু দুআ

রাসূল সা. এ মহব্বত আল্লাহ তাআলার কাছে চেয়ে নিতেন। এমন কিছু দুআ উদ্ধৃত হলো :

* নবী কারীম সা. বলতেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার মহব্বত কামনা করছি!'

(মুসনাদে আহমাদ : ৩৬/৪২৩ নং ২২১০৯)

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা. এত বেশি নেয়ামত লাভ করেছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই ইরশাদ করেন–

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

'আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বড়!'

(সূরা নিসা : ১১৩)

এত অনুগ্রহ লাভ করা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রিয় হাবীব সা. তাঁর আঁচল পেতে দিতেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর প্রতি মহব্বত বৃদ্ধির জন্য দুআ করতেন।

* রাসূল সা. এ দুআ করতেন–

اللهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ.

'হে আল্লাহ! আপনার মহব্বতকে আমার জন্য সমস্ত কিছুর মহব্বতের চেয়ে বেশি প্রিয় বানিয়ে দিন!'

(কানযুল উম্মাল : নং ৩৬৪৮)

অর্থাৎ আপনার ভালোবাসা আমার অন্তরে যেন সকল বস্তুর ভালোবাসার চেয়ে প্রবল হয়ে যায়। কুরআন মাজীদেও এমন মহব্বতের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ

'আপনি বলে দিন, তোমাদের কাছে যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা– যা মন্দা হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান– যা তোমরা পছন্দ করো, এ সবই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত।'

(সূরা তাওবা : ২৪)

এখানে মূলত ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু ভালোবাসা এমন রয়েছে, যা শরীয়তে জায়েয। যেমন- বাবা-মার ভালোবাসা, সন্তানের ভালোবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা। কিন্তু এ সবই নিচে থাকবে আর আল্লাহ তাআলার মহব্বত তাদের সবার চেয়ে বেশি ও প্রবল হবে।

* রাসূল সা. আরেকটি দুআ করতেন–

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

'হে আল্লাহ! আপনার মহব্বতকে আমার কাছে আমার প্রাণ, আমার পরিবার ও শীতল পানির চেয়ে অধিক প্রিয় করে দিন!'

(তিরমিযী : নং ৩৪৯০)

এখানে শীতল পানির কথা বলা হলো কেন? কারণ উত্তপ্ত মরুভূমিতে কেউ যদি পথ চলে, গরমে তার পুরো শরীর ঘর্মাক্ত থাকে, পিপাসায় গলা শুকিয়ে যায়, তখন তার পুরো সত্তা শুধু শীতল পানির খোঁজে থাকে। তেমনি কারো প্রতি মহব্বত হলে তা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে। তৃষ্ণায় কাতর মরুভূমির মুসাফির যেমন পানির মুখাপেক্ষী থাকে, ভালোবাসায় কাতর ব্যক্তির তৃষ্ণাও তেমন হয়ে থাকে। এজন্যই শীতল পানির চেয়ে বেশি মহব্বত কামনা করা হয়েছে।

* রাসূল সা. আরেকটি দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা কামনা করি এবং আপনার জ্যোতির্ময় চেহারার প্রতি তাকানোর স্বাদ আস্বাদনের ব্যাকুলতা কামনা করি।'

(মুসনাদুল আবরার : নং ১৩৯২)

কবি বলেন—

محبت معانی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی ☆

یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی

'মহব্বত শব্দে ও ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়,
এটা এমন বাস্তবতা, যা কাউকে বোঝানো বড় দায়!'

এটা বোঝাও মুশকিল যে, ভালোবাসা আসলে কী জিনিস!!

لطف مے تا نہ شناسی بخدا تا نہ چشی

'কোনো ব্যক্তি এই মহব্বতের মদিরার স্বাদ জানতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তা আস্বাদন করবে।'

কোনো এক বুযুর্গ বলেন–

کچھ حقیقت نہ ہو محبت کی ☆

اک نشہ سا ضرور ہوتا ہے

'ভালোবাসার কোনো বাস্তবতা না থাকুক,
তা এক রকমের নেশা নিশ্চয়।'

ভালোবাসার পরিচয় হলো, যে কাউকে ভালোবাসে, সে অবশ্যই এক ধরনের নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে পাগলামি ও উন্মত্ততা ভর করে। সে তার প্রিয়তমের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের জন্য ব্যাকুল থাকে। কারণ তার হৃদয়ে প্রিয়তমের মহব্বতের সেই নেশা থাকে।

## দুতরফা ভালোবাসা : আদর্শ ভালোবাসা

আল্লাহর প্রতি মহব্বত একতরফা নয়, বরং উভয় দিক থেকে। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা এবং মুমিনদের আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা।

জগতের নিয়ম হলো, দুই দিক থেকে ভালোবাসা হলে সবাই বলে– 'বাহ! কী চমৎকার মিল! কী সুন্দর ভালোবাসা! দুই পক্ষ থেকেই ভালোবাসা!' তবে এক্ষেত্রে বান্দার তুলনায় আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অধিক হয়ে থাকে। প্রমাণ হলো নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসী–

ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي وإنا إلى لقائهم لأشد شوقا.

'জেনে রাখো, আমার সাক্ষাতের প্রতি নেককারদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে, আর নিশ্চয় তাদের সাক্ষাতের প্রতি আমি এরচেয়ে বেশি আগ্রহী!'

(জামিউল আহাদীস : নং ১১৬০)

বিষয়টি অনেকটা এমন– বান্দা তার প্রতিপালকের রহমতের দিকে এক কদম অগ্রসর হয়, আর আল্লাহ তাআলার রহমত তার দিকে দুই কদম অগ্রসর হয়। যেমনটি তিনি হাদীসে কুদসীতে বলেন–

وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

'বান্দা যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমার রহমত তার দিকে ছুটে যায়!'

(ইবনে মাজাহ : নং ৩৮২২)

## প্রিয়তমের সান্নিধ্যের প্রতি ব্যাকুলতা

'মহব্বত'। চার অক্ষরের একটি শব্দ। কিন্তু–
গভীরতায় এটি সমুদ্রের চেয়েও বেশি;
উচ্চতায় পর্বতের চেয়েও উঁচু;
উষ্ণতায় আগুনের চেয়েও তীব্র।

মহব্বতের কারণে মানুষের মধ্যে বিস্ময়কর অবস্থা দেখা দেয়। জীবনভর মানুষের মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, যা তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না, তার জন্য দিন-রাতের পার্থক্য থাকে না, পানাহার তার জন্য মামুলি বিষয় হয়ে যায়; তার কাছে সর্বক্ষণ একটিই উদ্দেশ্য থাকে যে–
প্রিয়তমের নৈকট্য যেন অর্জন হয়...
প্রিয়তমের সান্নিধ্য যেন অর্জিত হয়...
প্রিয়তমের সন্তুষ্টি যেন হাসিল হয়...!

## পরিচয় ও মহব্বত একে অপরের সম্পূরক

মাহবুবের পরিচয় যত বেশি হবে, মহব্বতও তত বাড়বে। উদাহরণত–
ক. মানুষ যখন জানতে পারে, অমুক ফল এত মিষ্টি আর তার স্বাদ এত মজাদার, এ তথ্যটা সে যত বেশি জানবে ততই তার ঐ ফলের জুস পান করার আগ্রহ বাড়বে।
খ. কোনো দর্শনীয় স্থানের ব্যাপারে যদি কেউ শোনে যে, অমুক স্থান এত মনোরম, এত মনোমুগ্ধকর, এত চিত্তাকর্ষক, এভাবে যত বেশি ঐ স্থানের সৌন্দর্যের বন্দনা শুনবে, তত বেশি তার সেই স্থান দেখার আকাঙ্ক্ষা বাড়বে।
গ. একবার এক ছোট্ট শিশুকে আমি জান্নাতের কাহিনী শোনালাম। সে এ সব শুনে বলে উঠল– 'তাহলে চলুন না ওখানে!' জান্নাতের বিবরণ শুনেই শিশুটির মনে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, সে এ কথা না বলে থাকতে পারেনি!

সুতরাং আল্লাহর মারেফত (পরিচয় লাভ) ও মহব্বত দুটো পরস্পরের জন্য আবশ্যক। হাসান বসরী রহ. এর বর্ণনা দেন এভাবে–

من عرف الله لم يحب غيره، ومن عرف الدنيا زهد فيه.

'যে আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করবে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত করতে পারবে না (বা আল্লাহ তাআলাকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না) আর যে দুনিয়ার হাকিকত জানবে, সে দুনিয়া বর্জন না করে পারবে না!'
(তাবাকাতুস সুফিয়াহ)

## প্রকৃত অনুগ্রহকারীর প্রতি ভালোবাসা

রাসূল সা. এক হাদীসে ইরশাদ করেন–

'তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, কেননা তিনি তোমাদেরকে আপন নেয়ামত দিয়ে সিক্ত করেছেন।'

বান্দা যদি এ কথা ভাবে যে, আল্লাহ রব্বুল ইযযাত তাকে কতই না নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন, তাহলে অন্তরে আল্লাহর প্রতি মহব্বত আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, শ্রবণশক্তি দিয়েছেন, সুস্থতা দিয়েছেন, বাকশক্তি দান করেছেন, জ্ঞানের আলো দিয়েছেন, সম্মান দান করেছেন, রিযিক দিয়েছেন। এমন কত শত নেয়ামত আছে, যা তিনি চাওয়া ছাড়াই

দিয়েছেন। এ সব ভেবে অন্তর থেকে আওয়াজ আসে– এমন প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভালোবাসা উচিত।

## মারেফাতের ভিত্তি

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

المحبة أساس المعرفة.

'মহব্বত হলো মারেফাত (তথা আল্লাহর পরিচয় লাভ)-এর ভিত্তি।'

## দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি

আল্লাহ তাআলাকে এ কারণেও ভালোবাসা উচিত যে, দুনিয়ার যত প্রিয় মানুষ রয়েছে, একদিন না একদিন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দুনিয়াকে যে ভালোবাসবে, সে একদিন না একদিন দুনিয়া ত্যাগ করবে। আর যে আল্লাহকে ভালোবাসবে সে কোনো একদিন আল্লাহকে পাবে।

একবার রাসূল সা. এর কাছে জিবরাইল আ. এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল–

وأحبب من شئت، فإنك مفارقه.

'যাকে ইচ্ছা আপনি ভালোবাসুন; কিন্তু একদিন আপনাকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।'

(শুআবুল ঈমান : নং ১০৫৪)

পৃথিবীতে পরস্পরকে মহব্বতকারী দুইজন থাকলে তারা সব সময় একসঙ্গে থাকতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার কথাই ধরুন, তারাও সর্বদা একসাথে থাকতে পারে না। কখনো স্বামী সফরে যায়, কখনো স্ত্রী বাপের বাড়ি যায়। অর্থাৎ দুনিয়াতেও অস্থায়ী বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। আর কারো মৃত্যু হলে তো বিচ্ছেদ হয়েই যায়। যত তীব্র ভালোবাসাই থাকুক না কেন, একজনের মৃত্যু হলে ভালোবাসার সম্পর্ক চিরতরে শেষ হয়ে যায়। সুতরাং দুনিয়ার প্রেমাস্পদ পরিশেষে বিচ্ছিন্ন হয়েই যায়। এটা কখনো সম্ভব নয় যে, তারা সর্বদা একসঙ্গে থাকবে।

উলামায়ে কেরাম فإنك مفارقه বাক্যে একটি নুকতা (সূক্ষ্ম তত্ত্ব) বর্ণনা করেছেন। এখানে বাবে মুফাআলাহ থেকে শব্দটি ব্যবহার করে বালাগাত

তথা অলঙ্কার শাস্ত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছে। এই বাব থেকে শব্দটি ব্যবহারের ফলে এতে যে বিশেষ অর্থ সৃষ্টি হয়েছে তা হলো- যে দুজন পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের যে কোনো একজনের পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। কখনো স্বামী তার স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে পারে, কখনো স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। আর কখনো কারো মৃত্যুর ফলে দুজনের বিচ্ছেদ হতে পারে।

## আল্লাহর মহব্বতের পরিণতি

দুনিয়ার যত মহব্বত রয়েছে তার শেষ পরিণতি হলো বিচ্ছেদ। শুধু একজন প্রেমাস্পদ এমন আছেন, যাঁর মহব্বত লাভ হলে তিনি কখনো বিচ্ছিন্ন হন না। দিন-রাত, সুস্থতা-অসুস্থতা, আনন্দ-বেদনা, সর্বাবস্থায় তিনি মানুষের সঙ্গে থাকেন। মানুষ পর্বতচূড়ায় আরোহন করুক, জমিনের নিম্নাঞ্চলে নেমে যাক অথবা সমুদ্রের গভীরে অবগাহন করুক, তবুও এ প্রেমাস্পদ কোনো অবস্থাতেই পৃথক হন না। তিনি কুরআন মাজীদে বলে দিয়েছেন–

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকেন।'
(সূরা হাদীদ : ৪)

এ বিষয়টির কারণে অন্তর এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়– ভালোবাসলে আপন স্রষ্টাকেই ভালোবাসা উচিত।

## আরেক কদম অগ্রসর হওয়ার সুযোগ

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ভালোবাসেন আর বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসে। তবে বান্দা এই মহব্বতে আরো এক কদম অগ্রসর হতে পারে। তা এভাবে–
ক. মুমিন বান্দা যখন অধিকহারে আল্লাহর যিকির করতে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে নিজের প্রিয় বানিয়ে নেন। এর ফলে বান্দা তো জমিনে বসে যিকির করে, অপরদিকে আল্লাহ তাআলা আরশে বসে ঐ বান্দাকে স্মরণ করেন।

কুরআন মাজীদে বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে :

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ.

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।'
(সূরা বাকারা : ১৫২)

খ. বান্দা প্রিয় নবী সা. এর সুন্নাতের উপর আমল করলে আল্লাহ তাআলা তাকে আপন করে নেন। কুরআনে তিনি ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ.

'আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।'
(সূরা আলে ইমরান : ৩১)

সুন্নাতের অনুসরণের বদৌলতে মানুষ তার প্রতিপালকের প্রিয় হয়ে যায়।

গ. বান্দা ইবাদতে নিমগ্ন হলে আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন–

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.

'আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার এত নৈকট্য অর্জন করে যে, আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি।'
(সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৫০২)

অর্থাৎ ইবাদতগুযার বান্দা আপন প্রতিপালকের প্রিয় হয়ে যায়। সুতরাং প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য হলো, এ সকল আমল ও ইবাদতের মাধ্যমে বেশি বেশি আল্লাহর মহব্বত লাভ করা।

## খাঁটি ভালোবাসা

বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা একেবারে খাঁটি ও নির্ভেজাল। কারণ তিনি স্রষ্টা ও অধিকর্তা। হাদীসে কুদসীতে আছে–

يا ابن آدم، إن ذكرتني ذكرتك وإن نسيتني ذكرتك.

'হে আদম সন্তান, তুমি আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাকে স্মরণ করি। তুমি আমাকে ভুলে গেলেও আমি তোমাকে স্মরণ করি।'

অর্থাৎ তুমি আমাকে ভুলে গেলেও আমি তোমার কথা মনে রাখি এবং আমি আমার রহমত বণ্টন করে তোমার প্রতি রহমত প্রেরণ করি।

এক বুযুর্গ বলতেন–

'ওহে বন্ধু, আহারের সময় পুড়ে যাওয়া সবজিও যদি তুমি পাও, তবুও তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। এটা দেখো না যে, তুমি কী খানা পেয়েছ, বরং এটা দেখো যে, আল্লাহ তাআলা রিযিক বণ্টনের সময় তোমাকেও স্মরণে রেখেছেন।'

## নির্ভেজাল ভালোবাসার প্রমাণ

আমাদের বুযুর্গরা বলেন–

صدق المحبة في ثلاث.

ভালোবাসার সত্যতা প্রমাণিত হয় তিনটি বিষয় দেখে—

**প্রথম বিষয়**

أن يختار كلام حبيبه على كلام غيره.

'প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের কথাকে অন্যের কথার উপর প্রাধান্য দিবে।'

অর্থাৎ তার কাছে কুরআন তেলাওয়াত ভালো লাগবে। দুনিয়াবি কথাবার্তা, গল্প-গুজব বা মতবিনিময়ের পরিবর্তে কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত বেশি মজা লাগবে। কারণ এটা প্রকৃত প্রেমাস্পদের কথা। সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এমনি ছিল। কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল, ভালোবাসা ছিল। তারা কুরআনের আশেক ছিলেন।

**দ্বিতীয় বিষয়**

ويختار مجالسة حبيبه على مجالس غيره.

'প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের মজলিসকে অন্যের মজলিসের উপর প্রাধান্য দিবে।'

বর্তমানে তো মানুষের অবস্থা এই যে, বন্ধুদের সাথে বসে গল্প-গুজব করা সহজ, কিন্তু একাকীত্বে আপন প্রতিপালককে স্মরণ করা অতি কষ্টকর। যখনই কাউকে জিজ্ঞেস করি– 'ভাই কি মুরাকাবা করেছেন?'

উত্তর পাই– 'সুযোগ হয়নি!'

এ যুগের মজনুদের দেখুন, এরা লায়লাকে স্মরণ করার সুযোগই পায় না! আধুনিক যুগের মজনুরা আল্লাহকে স্মরণ করার সুযোগই পায় না! তাহলে

স্মরণ করে কাকে? আল্লাহর স্মরণ তো অন্তর থেকে পৃথক হওয়াই উচিত নয়।

### তৃতীয় বিষয়

ويختار رضاء حبيبه على رضاء غيره.

'আর সে অন্যের সন্তুষ্টির পরিবর্তে নিজ প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়।'

অর্থাৎ অগ্রাধিকার দেয়। এ মহব্বতের প্রমাণ মিলে বিয়ের সময়। তখন বলা হয়– এসো, চাচা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাকে মানিয়ে নিই। খালা মন খারাপ করেছেন, তাকে খুশি করি। পড়শীকেও সন্তুষ্ট করি। কাজের বুয়া রাগ করেছে, তাকেও মানিয়ে নিই। বাড়ির চাকর মন খারাপ করেছে, তাকে খুশি করি। বিয়ের সময় সবাই অসন্তুষ্ট হওয়া লোকদেরকে খুশি করে, কিন্তু যে প্রতিপালক আগে থেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন, সুন্নাতপরিপন্থী আমল করে তাকে আমরা নারাজ করে দিই।

## ভালোবাসার বাস্তবতা

কারো প্রতি মানুষ আসক্ত হলে তার জন্য নিজের সবকিছু কুরবান করে দেয়। তখন সে দুনিয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। সে শুধু তার প্রেমাস্পদকে দেখে। তাই তো বলা হয়–

حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت ولا تبقى منك شيئا.

'মহব্বতের প্রকৃত রূপ হলো- তুমি তোমার সবকিছু তোমার প্রেমাস্পদকে দিয়ে দিবে। তোমার কাছে আর কিছুই থাকবে না।'

নিজের ভালোবাসা, নিজের কামনা-বাসনা, নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা কোন সত্তার জন্য হবে? শুধুই আল্লাহ তাআলার জন্য হবে।

## আল্লাহর মহব্বতের ভিত্তি ছয়টি বিষয়ের উপর

আমাদের বুযুর্গরা বলেন– মানুষ যদি এটা বিবেচনা করতে চায় যে, তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত কী পরিমাণে আছে, তাহলে সে ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে তা অনুমান করতে পারবে। যথা :

## ১. মৃত্যুর প্রতি মহব্বত

যে আল্লাহকে ভালোবাসে, তার কাছে মৃত্যু ভালো লাগে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে না। ভাইয়েরা! এই মুহূর্তে যদি আমি জানতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি সন্তুষ্ট, তাহলে আল্লাহর কসম, আমি এখানে বসে থেকে এখনি মরে যেতে প্রস্তুত! কারণ মূল উদ্দেশ্য তো এটাই! এমন লোকদের কাছে মৃত্যু প্রিয় হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের উপায় হলো মরণ। রাসূল সা. ইরশাদ করেন–

الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب.

'মৃত্যু একটি পুল, যা এক বন্ধুকে অপর বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়।'

হযরত ইবরাহীম আ. এর কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা আযরাইল আ. এসে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনাকে স্মরণ করেছেন!' অর্থাৎ আপনার শেষ সময় এসে গেছে!

তিনি উত্তর দিলেন–

هل رأيت خليلا يقبض روح خليله؟

'আপনি কি এমন কোনো বন্ধু দেখেছেন, যে তার বন্ধুর রূহ কবয করে?'

আযরাইল আ. ফিরে গিয়ে আল্লাহকে এ কথা জানালেন। আল্লাহ তাআলা সংবাদ পাঠালেন, তুমি গিয়ে আমার বন্ধুকে এ কথা বলো–

هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟

'আপনি কি এমন কোনো বন্ধু দেখেছেন, যে তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করে?'

হযরত ইবরাহীম আ. বুঝে গেলেন, রূহ কবয করা মূলত আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের মাধ্যম। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন– 'মৃত্যুর ফেরেশতা, জলদি করো, জলদি করো! আমার রূহ কবয করে নাও এবং আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।'

## ২. দুনিয়া বিমুখতা

আল্লাহ তাআলা ছাড়া সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। মনে রাখতে হবে, দুনিয়া থেকে বিমুখ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ তাআলার মহব্বতের

স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না। কেউ যদি কামনা করে, আল্লাহ তাআলার মহব্বতও লাভ হবে এবং দুনিয়াও ঠিক থাকবে, তবে এটা অসম্ভব চিন্তা। কারণ–

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ.

'আল্লাহ কোনো মানুষের বুকে দুটি হৃদয় দেননি।'

(সূরা আহযাব : ৪)

সুতরাং এক অন্তরে আল্লাহর মহব্বত থাকবে, আরেক অন্তরে প্রবৃত্তি ও শয়তানের মহব্বত থাকবে, এটা সম্ভব নয়। হৃদয় একটিই এবং তা একজনের জন্যই।

## ৩. সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকা

এমন ব্যক্তির সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকার সৌভাগ্য হয়। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে তার মুখে প্রিয়তমের কথা থাকে। তার কাছে শুধু এটাই ভালো লাগে। কুরআনে এ বিষয়ের বিবরণ এভাবে এসেছে–

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ.

'যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত হয়ে...।'

(সূরা আলে ইমরান : ১৯১)

## ৪. আল্লাহর প্রতীকসমূহের প্রতি ভালোবাসা থাকা

এমন ব্যক্তির আল্লাহ তাআলার শাআয়ের (প্রতীক)- এর প্রতি ভালোবাসা থাকে। কারণ আল্লাহর শাআয়ের হলো এমন জিনিস, যাতে আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ততা থাকে। যেমন-

কালামুল্লাহ (আল্লাহর কালাম) আল্লাহর প্রতীক।

বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) আল্লাহর প্রতীক।

রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর রাসূল) আল্লাহর প্রতীক।

আউলিয়াউল্লাহ (আল্লাহর অলীরা) আল্লাহর প্রতীক।

বরং যেখানে আল্লাহর প্রকৃত অলীদের পদচারণা ঘটে, সে সব স্থানও আল্লাহর প্রতীক হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এর সাক্ষ্য দেন–

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

'নিশ্চয় সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।'
(সূরা বাকারা : ১৫৮)

এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তাআলার মহব্বত বৃদ্ধি পেলে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত বস্তুসমূহের প্রতিও মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। তখন অন্তরে বাইতুল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হবে, কালামুল্লাহর ভালোবাসা হবে, রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি মহব্বত হবে। এই ভালোবাসা এ কথার প্রমাণ যে, সে আল্লাহকে ভালোবাসে।

আপনাদেরকে গ্রাম্য এলাকার মহব্বতের একটি কাহিনী শোনাই। সেখানকার এক মাওলানা সাহেব পড়াশোনা শেষ করে গ্রামে ফিরে এলেন। তার অনেক হাদীস মুখস্থ ছিল। তিনি বয়ান করতে গেলে প্রায়ই বলতেন–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(ক-লা রাসূলুল্লাহি সা.) অর্থাৎ রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন।
ওখানে এক সাধাসিধে লোক ছিল। বেচারা আরবি ভাষা বুঝত না। সে প্রতিদিনই ক-লা রাসূলুল্লাহি সা. শুনত। সে তো এর অর্থ বুঝত না। সে ভাবত, মাওলানা সাহেব বলছেন– 'কালা রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. কালো। সে কিছুদিন সবর করল, এরপর আর সহ্য করতে পারল না। একদিন মাওলানা সাহেব বয়ানে ক-লা রাসূলুল্লাহি সা. বললেন। বয়ান শেষ হওয়ার পর ঐ গ্রাম্য ব্যক্তি এসে মাওলানা সাহেবের জামার কলার ধরে রাগে চিৎকার করে বলল, 'আরে মৌলবী, তুমি কালো, তোমার বউ কালো! আমার প্রিয় রাসূল সা. তো সুদর্শন ও গৌর বর্ণের ছিলেন।' সে এ কথা বলেছিল মহব্বতের কারণে। রাসূল সা. এর প্রতি এই মহব্বত মানুষের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে।

## ৫. গভীর রাতের মুনাজাতের আকাঙ্ক্ষা নসিব হওয়া

এমন ব্যক্তি গভীর রাতের দুআ-মুনাজাতের আকাঙ্ক্ষা লাভ করে। সে রাতে জেগে আল্লাহ তাআলার দরবারে মুনাজাত করতে আগ্রহী হয়।
দাউদ তায়ী রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে এ ইলহাম পাঠালেন– হে দাউদ, ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, যে আমার প্রতি মহব্বতের দাবি করে, অথচ রাত

এলে ঘুমিয়ে যায়। প্রেমিক কি তার প্রেমাস্পদের নির্জন সান্নিধ্য কামনা করে না?'

অর্থাৎ মানুষ আমার মহব্বতের দাবি করার পরও কেন রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হয় না? নিজের প্রিয়তম স্রষ্টার সাথে রহস্যালাপ কেন করে না?

এমন ব্যক্তির জন্য ইবাদত করা সহজতর হয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে ভালোবাসে এবং তাকে বলা হয় যে, তুমি কিছুক্ষণের জন্য তার কাছে বসো। তখন কিছু সময়ের জন্য প্রেমাস্পদের কাছে বসা তার জন্য কষ্টকর হবে কি? সে তো খুশি হবে, বরং বলবে, সময় কেন এত দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে? হায়, সময় যদি থেমে যেত আর আমি আমার প্রিয়তমের কাছে আরো দীর্ঘ সময় থাকতে পারতাম!

একজন মুমিন যখন মসজিদে আসে তখন এমন অবস্থাই তার কাছ থেকে প্রকাশ পায়। সে ধীরস্থিরভাবে ইবাদত করে। মহানবী সা. ইরশাদ করেন–

المؤمن في المسجد كالسمك في الماء.

'মুমিন ব্যক্তি মসজিদে এসে এমন প্রশান্তি অনুভব করে, মাছ যেমন পানিতে অনুভব করে।'
(কাশফুল খাফা : নং ২৬৭৯)

### ৬. ঈমানদারদের প্রতি অনুরাগ থাকা

আল্লাহ তাআলার প্রতি যার ভালোবাসা থাকে, তার অন্তরে সহজাতভাবেই ঈমানদারদের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা জন্মে। মুমিনদেরকে তার ভালো লাগে। ভেবে দেখুন, বাবা-মার প্রতি ভালোবাসার কারণে ভাই-বোনদের প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। তেমনি কেউ যদি আল্লাহকে ভালোবাসে, তাহলে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, তাদের প্রতি সহজাতভাবে এক ধরনের ভালোবাসা তার অন্তরে তৈরি হবে।

## তিনটি বিস্ময়কর তথ্য

কুরআন মাজীদে বিস্ময়কর তিনটি তথ্য রয়েছে :

**ক.** আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ.

'তাহলে আল্লাহ তাআলা অতি শীঘ্র এমন জাতি পাঠাবেন, আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসবেন এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে।'

(সূরা মায়িদা : ৫৪)

**খ.** আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলেন–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

'আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।'

(সূরা বায়্যিনাহ : ৮)

প্রথম আয়াতে আল্লাহর মহব্বতের কথা আগে এনেছেন আর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা আগে বলেছেন।

**গ.** আরেক স্থানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا.

'এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন, যেন তারা তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে।'

(সূরা তাওবা : ১১৮)

কুরআনের এ তিনটি আয়াত পাঠ করলে বিস্মিত হতে হয় এবং এ কথা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাআলা বাস্তবেই চান, যেন তার বান্দারা আপন প্রতিপালককে মহব্বত করে।

## আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বত কেমন হওয়া উচিত?

আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বত কেমন হতে হবে? ছোট্ট শিশু যেভাবে মাকে মহব্বত করে তেমন হতে হবে। ছোট্ট বাচ্চাকে মায়ের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরালে সে কেমন ব্যাকুল হয়ে যায়! কী কান্নাকাটিই না করে! তাকে শিক্ষিত মহিলা কোলে নিক, সুন্দরী নারী কোলে নিক বা অন্য যেমন মহিলাই কোলে নিক না কেন, সে মায়ের কোলে ফিরে না আসা পর্যন্ত কান্না বন্ধ করে না। এর কারণ হলো– শিশুটি তার মাকে মহব্বত করে। সে স্থির হয় না, ব্যাকুল হয়ে থাকে, কান্নাকাটি করে। মা যতই ব্যস্ত হন না কেন, সব কাজ ফেলে ছুটে আসেন এবং সন্তানকে বুকে তুলে নেন। মাকে ছাড়া শিশু যেমন স্থির থাকে না, হায়, আমাদেরও যদি তেমনি আপন প্রতিপালকের

সান্নিধ্য ছাড়া শান্তি লাভ না হত! এমন মহব্বত যেন আমাদেরও নসিব হয়! বাচ্চা তার মায়ের জন্য পাগল হয় আর মুমিন তার স্রষ্টার জন্য পাগল হয়। পাখি যেমন আপন নীড়ে ফিরে প্রশান্তি লাভ করে, তেমনি মুমিন যখন আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে যিকির ও মুরাকাবায় বসে অথবা জায়নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে প্রশান্তি লাভ করে।

মনে রাখতে হবে, নিজের অন্তরে আল্লাহর প্রতি মহব্বত যাচাই করতে হলে দেখতে হবে, জায়নামাযের সাথে সম্পর্ক কতটুকু? জায়নামাযে বসার সময়ই যদি না পাওয়া যায়; শুধু নামায পড়েই জায়নামায ভাঁজ করে পলায়ন করার প্রবণতা থাকে, তবে এটা মহব্বতের প্রমাণ নয়। যে প্রকৃত অর্থে আল্লাহকে ভালোবাসে তার সময় কাটে জায়নামাযে বসে। জায়নামাযে বসতে তার ভালো লাগে। সে প্রশান্তি নিয়ে জায়নামাযে সময় কাটায়।

## সেই যুগ এসে গেছে!

বর্তমানে এমন সময় এসে গেছে যে, আমরা প্রকৃত স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে দুনিয়াবি জিনিসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছি। এর মূল কারণ হলো- আমরা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। রাসূল সা. ইরশাদ করেন–

سيأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا :

يحبون الدنيا وينسون الآخرة،

يحبون المال وينسون الحساب،

يحبون الذنوب وينسون التوبة،

يحبون القصور وينسون القبور.

‘অতি সত্বর আমার উম্মত এমন সময়ের মুখোমুখি হবে, যখন তারা পাঁচটি বস্তুকে ভালোবাসবে আর পাঁচটি বস্তুকে ভুলে যাবে :

১. তারা দুনিয়াকে ভালোবাসবে আর আখেরাতকে ভুলে যাবে।

২. তারা ধন-সম্পদ ভালোবাসবে আর হিসাব দেয়ার কথা ভুলে যাবে।

৩. তারা গুনাহকে মহব্বত করবে আর তাওবার কথা ভুলে যাবে।

৪. তারা মহল ও প্রাসাদের প্রতি আসক্ত হবে আর কবরের কথা ভুলে যাবে।'

(আরশীফে মুলতাকা : ১/১৪২৪৭)

আজ সেই সময় এসে গেছে। আল্লাহ তাআলার মহব্বত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মাঝে আল্লাহর মহব্বত এতটুকুও অবশিষ্ট নেই যে, ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠে মসজিদে যাবে। আযানের আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে বান্দা দুনিয়াবি কাজ-কর্ম ছেড়ে আপন প্রতিপালকের স্মরণে মসজিদে চলে আসবে। যাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত রয়েছে, তারা সব সময় আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকেন এবং তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ খুঁজে বেড়ান।

تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دلنشیں ہوتی

'হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মোর– কোথাও এমন স্থান খুঁজে পাব,
যেখানে নির্জনে বসে শুধু তাঁরই স্মরণে কাটাব!'

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন–

جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
بیٹھے رہیں تصور جاناں کئے ہوئے

'হৃদয় শুধু দিন-রাত একটুখানি সুযোগ খুঁজে বেড়ায়,
যখন থাকব বিভোর হয়ে শুধু প্রেমাস্পদের কল্পনায়!'

এমন হলে মানুষ আল্লাহর মহব্বতে বসে থাকতে মজা পাবে এবং এ মহব্বত তার আমলে ও ইবাদতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে।

## ইবলিসের দুর্ভাগ্যের মূল কারণ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. আজিব একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব লিখেছেন। তিনি বলেন : আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা না থাকার কারণে শয়তান বিতাড়িত হয়েছে। তার কাছে ইলম ছিল, ইবাদত ছিল, আমলও ছিল, তারপরও সে বিতাড়িত হয়েছে। এর কারণ, তার অন্তরে ভালোবাসা ছিল না। চারটি 'আইন' (আরবি হরফ) রয়েছে। ইলম, আমল, আরেফ ও আশেক। এ চারটি শব্দ আইন দিয়ে শুরু হয়। বিতাড়িত শয়তানের কাছে প্রথম তিন আইন ছিল,

কিন্তু শেষেরটা থেকে সে বঞ্চিত ছিল। শেষের আইন 'ইশক' এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা না থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে বিতাড়িত করেছেন।

কবি বলেন–

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی

'নমরুদের আগুনে আশেক নির্দ্বিধায় ঝাঁপ দিয়েছে,
আর বিবেক-বুদ্ধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখেছে!'

## মহব্বতের পরীক্ষা

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে, এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর কোনো পরীক্ষা এলে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে যে, তিনি আমার কথা শোনেন না, আমি এটা পাইনি, ওটা পাইনি, তাহলে সে ভালোবাসার মিথ্যা দাবিদার।

একজন বুযুর্গ ছিলেন। একবার তার কাছে কিছু লোক একত্র হলো। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কেন এখানে এসেছ?'
তারা বলল, 'আমরা আপনাকে মহব্বত করি, তাই এখানে এসেছি।'
তিনি এ কথা শুনে আশপাশ থেকে পাথর নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন। ঐ লোকেরা পড়িমড়ি করে ছুটে পালাল। বুযুর্গ পেছন থেকে উচ্চ স্বরে বললেন–

لو كنتم أحبائي ما فررتم على بلائي.

'তোমরা আমাকে মহব্বত করলে আমার পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে ছুটে পালাতে না!'

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো পরীক্ষা এলে বান্দার সবর করা উচিত। এমন যেন না হয় যে, আপন প্রতিপালকের ঘরের দরজাই ভুলে গেল!

## ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী...

যে ব্যক্তি মহানবী সা. কে মহব্বতের দাবি করবে কিন্তু উলামায়ে কেরামকে মহব্বত করবে না, বুঝে নিতে হবে যে সে আপন দাবিতে

মিথ্যাবাদী। আমার শায়খ ও মুরশিদ রহ. আলেমদেরকে এত মহব্বত করতেন এবং এত সম্মান করতেন যে, তিনি বলতেন–

'কোনো আলেম যদি আমার বুক মাড়িয়ে যায় তবুও আমি তাতে কষ্ট পাব না।'

যে ব্যক্তি জাহান্নামকে ভয় পাওয়ার দাবি করে, অথচ গুনাহ বর্জন করে না, সে মিথ্যা দাবি করে। কারণ যার অন্তরে দোযখের ভয় থাকবে, সে কখনোই গুনাহ করার স্পর্ধা দেখাবে না।

যে ব্যক্তি জান্নাতের মহব্বতের দাবি করে, কিন্তু ইবাদত করে না, সেও তার দাবিতে মিথ্যাবাদী। এটা কীভাবে হতে পারে যে, কোনো মানুষের অন্তরে জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকবে, অথচ সে জান্নাতে যাওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করবে না! এজন্যই মাশায়েখ বলেন–

صدق المحبة على العمل بطاعة المحبوب.

'মহব্বতের সত্যতার প্রমাণ হলো, প্রেমাস্পদের আনুগত্য হয় এমন আমল করা।'

এ সংক্রান্ত চমৎকার একটি শের (কবিতা) আছে। অনেক কিতাবে এর রচয়িতার নাম বলা হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. আর অনেক কিতাবে ভিন্ন কারো নাম আছে। শেরটি হলো–[১]

لَوْ كانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأَطَعْتَهُ
إنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ-

'তোমার ভালোবাসা সত্য হলে তুমি তো তার অনুসরণ করতে,
কারণ প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের অনুগত হয়।'

---

১. অধিকাংশ গ্রন্থে রচয়িতার নাম বলা হয়েছে ইমাম শাফেয়ী রহ.। কবিতার প্রথম অংশ নিম্নরূপ :

تَعْصِي الإله وَأنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ
هذا محالٌ في القياس بديعُ-

'প্রভুর নাফরমানি করছ, আবার তার ভালোবাসাও প্রকাশ করছ!
এ তো অসম্ভব, মোটেও বোধগম্য নয়।'

## ধোঁকা ও বাস্তবতার পরিচয়

মনে রাখতে হবে, যে মহব্বতের সম্পর্ক 'বক্তব্যে'র সাথে তা ধোঁকা আর যে মহব্বতের সম্পর্ক 'অবস্থা'র সাথে তা প্রকৃত মহব্বত। এমন ব্যক্তিকে যদি বলা হয়- আল্লাহর নামে প্রাণ উৎসর্গ করো, তবে সে নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে যায়। কবি বলেন-

ولو قيل لى مت. مت سمعا وطاعة
وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا-

'প্রিয়তম যদি বলে, মরে যাও! তবে আমি এখনই মরতে প্রস্তুত!
আর মৃত্যু-আহ্বানকারীকে নির্ভয়ে বলব, আহলান সাহলান!'

আরেক কবি কতই না সুন্দর বলেছেন-

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا-

'তাঁর তরে প্রাণ উৎসর্গ করব? সংশয় কী? প্রাণটা যে তাঁরই দেয়া,
বাস্তবতা তো এটাই যে, প্রাণ উৎসর্গ করেও তাঁর হক আদায় হবে না!'

এমন মানুষ প্রাণ উৎসর্গ করেও ভাবে, আমি তো ভালোবাসার হক আদায় করতে পারিনি! মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহ. বলেন-

'চুলার উপর রাখা ডেগকে আগুন যেভাবে উত্তপ্ত করে, তেমনি ইশক এমন আগুন, যা সাগরকেও উত্তপ্ত ও উত্তাল করে তোলে।'

## আল্লাহর প্রতি ধ্যানের পুরস্কার

আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ. এর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন-

'হে দাউদ, পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দিন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসবে, আমি তার প্রিয় হব! যে আমার কাছে বসবে, আমি তার সঙ্গী হব! যে আমার যিকির ও স্মরণে মজা পাবে, আমি তার বন্ধু হব! যে আমার সাথে থাকবে, আমি তার সাথে থাকব! যে আমাকে নির্বাচন করবে, আমিও তাকে নির্বাচন করব! যে আমার কথা শুনবে, আমি তার দুআ কবুল করব!'

আমরা যদি আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলি, তবে এটা কীভাবে হতে পারে যে, সেই মহান সত্তা আমাদের দুআ ফিরিয়ে দিবেন? মহান আল্লাহ তো তার বান্দাদেরকে মহব্বতের নগদ বিনিময় দান করেন!

# একটি সংশয়ের নিরসন

বর্তমানে অনেকে প্রশ্ন করে– ইবাদতকারী দুনিয়ায় নগদ ইবাদত করে, অথচ এর বিনিময় দেয়া হবে পরকালে জান্নাতের নেয়ামতের মাধ্যমে। এতে তো নগদ বিনিময় পাওয়া গেল না!

এর উত্তর হলো– আসলে তাদের বুঝতে ভুল হয়েছে। এক বুযুর্গ বলেন– এটা কীভাবে সম্ভব যে, বান্দা আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে নগদ বিনিময় করবে আর আল্লাহ তার প্রতিদান বাকি রেখে দিবেন এবং জান্নাতে তা প্রদান করবেন। এটা আল্লাহ তাআলা শান ও মর্যাদার পরিপন্থী। পরকালে বিনিময় প্রদানের কথা বলার আসল কারণ হলো- এই ইবাদত ও আনুগত্যের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা যে ধরনের পুরস্কার দিতে চান, তা পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভবই না! না কোয়ালিটি (Quality- গুণমান) এর দিক দিয়ে, না কোয়ান্টিটি (Quantity- পরিমাণ) এর দিক দিয়ে; আর না পরিমাপ ও মাত্রার দিক দিয়ে।

কোয়ালিটির দিক বিবেচনায় দেয়া সম্ভব না হওয়ার কারণ হলো- জান্নাতের খাবার এমন হবে যে, দুনিয়াতে এর কল্পনাও করা সম্ভব না। জান্নাতি মানুষদের সৌন্দর্যও অত্যধিক। এত বেশি যে, জান্নাতি হুর যদি আকাশের নিচে তার কাপড় প্রকাশ করে, তবে সূর্যের রশ্মিও ম্লান হয়ে যাবে। মৃতদের সাথে কথা বললে তারা জীবিত হয়ে যাবে। লবণাক্ত পানিতে থুথু ফেললে তা মিঠা হয়ে যাবে। এবার ভেবে দেখুন, এমন নেয়ামত মানুষ কীভাবে দুনিয়ায় পেতে পারে?

আর কোয়ান্টিটি বা পরিমাণের দিক বিবেচনায় দেয়া অসম্ভব হওয়ার কারণ হলো- সবাইকে জান্নাত দেয়ার পর দেখা যাবে, সবচেয়ে নিম্ন স্তরের জান্নাতি এই দুনিয়ার চেয়ে দশ গুণ বড় জান্নাত লাভ করেছে। সবচেয়ে নিচু স্তরের জান্নাতিই যদি দুনিয়া থেকে দশ গুণ বড় জান্নাত পায়, তাহলে ভেবে দেখুন, মানুষকে পৃথিবীতে কীভাবে আমলের বিনিময় দেয়া যেতে পারে! সুতরাং এটা অসম্ভব যে, মানুষের ইবাদত ও আমলের পরিপূর্ণ বিনিময় ইহকালেই দিয়ে দেয়া হবে।

মূলত প্রত্যেক দানকারী তার অবস্থান ও সামর্থ্য অনুযায়ী দান করেন। আমি-আপনি কাউকে কিছু দিতে গেলে কিছু অংশ দিয়ে বাকিটা পকেটে রেখে দিই। সে ব্যক্তি যদি বাদশাহর কাছে চায়, তাহলে বাদশাহ বলবে, তার

ঘরে এই পরিমাণ সম্পদ পৌঁছে দাও! তিনি টাকা-পয়সাও দিবেন আবার ঘরেও পৌঁছে দিবেন। কারণ তার অবস্থান ও ক্ষমতা এমন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শান এমন যে, কেয়ামতের দিন তিনি যখন দান করবেন, সেই দান এত বেশি হবে যে, দুনিয়া সেই দানকে ধারণ করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা নেক আমলের প্রতিদান যদি দুনিয়াতেই দিয়ে দিতেন তাহলে দুনিয়া যেমন অস্থায়ী, প্রতিদানও তেমন অস্থায়ী হত। আল্লাহ তাআলা কি চান না যে, তিনি যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি তার পুরস্কারও হবে চিরস্থায়ী? আর এমন প্রতিদান দুনিয়ায় দেয়া সম্ভবই নয়। এজন্যই আখেরাতে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ যেন বলছেন– হে আমার প্রিয় বান্দা! তুমি অস্থায়ী জগৎ থেকে বের হয়ে এসো। তুমি দুনিয়ায় আমার দান ও পুরস্কার কী দেখবে! আমার পুরস্কার দেখতে চাইলে অস্থায়ী জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করো, এই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হও, এরপর এসে দেখো, আমি তোমাকে কী পরিমাণ পুরস্কার দিই!

## ইবাদতের নগদ পুরস্কার

পরকালের আসল পুরস্কারের কথা তো বলা হলো। নগদের কথা রয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা নগদও দান করেন। ভেবে দেখুন, ইবাদত করলে কি শুধু জান্নাতের নেয়ামতই পাওয়া যায়? আরেকটি বিনিময়ও তো রয়েছে। তা হলো- আল্লাহর মহব্বত ও নৈকট্য। দুনিয়াতে এ মহব্বত নগদে পাওয়া যায় কি? অবশ্যই! বোঝা গেল, যে বান্দা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে দুনিয়াতেই তার মহব্বতের পুরস্কার দিয়ে ধন্য করেন।

## আল্লাহ তাআলার রক্ষণাবেক্ষণ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে, মহান আল্লাহ তার সকল কাজের রক্ষক হয়ে যান। কুরআনের বাণী দেখুন–

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।'
(সূরা আলে ইমরান : ১৭৩)

আরেক স্থানে আছে :

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

'তিনি কতই না উত্তম বন্ধু ও উত্তম সাহায্যকারী।'

(সূরা আনফাল : ৪০)

এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা উত্তম কর্মবিধায়ক, উত্তম বন্ধু ও উত্তম সাহায্যকারী হয়ে যান।

## একটি মজার কথা

মজার একটি কথা বলছি। তালিবে ইলমদের জন্য বেশ মজার নুকতা (সূক্ষ্ম তত্ত্ব) আল্লাহকে মহব্বতকারী ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ.

'হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন, আর যারা তাঁকে ভালোবাসবে।'

(সূরা মায়িদা : ৫৪)

এখানে সূক্ষ্ম কথাটি হলো- আল্লাহ তাআলা এ কথা ঐ সকল লোকদের উদ্দেশ্যে বলছেন, যারা নিজেদের ধর্ম থেকে ফিরে গেছে, স্বধর্ম ত্যাগ করেছে, মুরতাদ হয়ে গেছে, বঞ্চিত হয়েছে। বোঝা গেল, আল্লাহকে মহব্বতকারী এ সকল লোকেরা হবে তারা, যাদেরকে মুরতাদদের বিপরীতে আনা হবে। এটা একটা নিয়ম যে, বিপরীতে কাউকে আনা হলে সব সময় তার বিপরীতধর্মী কাউকেই নির্বাচন করা হয়, যাতে তারা দুজন পরস্পরের মোকাবেলা করতে পারে। কিছু লোক মুরতাদ হবে আর তাদের বিপরীতে মহব্বতকারী লোকদের আনা হবে। এর ফলে বোঝা গেল, মহব্বতকারীরা কখনো ঈমান থেকে মাহরুম হবে না। ঈমান থেকে মাহরুম হলে তো ধর্মত্যাগীদের বিপরীত হলো না। সুতরাং যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহপ্রেমী হয়ে জীবনযাপন করবে, মহান আল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত তার ঈমান নিরাপদ রাখবেন। আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করার কত বড় পুরস্কার! সুবহানাল্লাহ! কুরআন মাজীদ থেকে প্রমাণ মিলছে যে, আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির হেফাযত করবেন

মৃত্যু পর্যন্ত। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর মহব্বত লাভের দুআও করতে হবে এবং তাঁকে মহব্বতও করতে হবে।

## ভালোবাসার জোয়ার

আল্লামা আলুসী রহ. বলেন–

قدم الله تعالى محبته على محبة عباده.

'মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মহব্বতের তুলনায় নিজের মহব্বতের কথা আগে এনেছেন।'

এর কারণ কী? শুনুন–

إنهم يحبون ربهم بفيضان محبة ربهم.

'কারণ তারা তাদের পালনকর্তাকে ভালোবাসে, তাদের পালনকর্তার ভালোবাসার জোয়ারের কারণে।'

সুতরাং আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি এ কারণে যে, তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন। এ ভালোবাসা যেন আল্লাহর ভালোবাসার দলিল। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

'যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী হন। আর যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।'
(সহীহ বুখারী : নং ৬৫০৭; সুনানে দারেমী : নং ২৭৯৮)

## মহব্বতকারীদের সাথে ওঠাবসার বিধান

আরেক হাদীসে সাহাবী হযরত আবু জুহাইফা রা. বলেন–

جالسوا الكبراء وخالطوا الحكماء وسائلوا العلماء

'বড়দের সাথে ওঠাবসা করো, বিজ্ঞদের সাথে মেলামেশা করো আর প্রশ্ন করো আলেমদেরকে।'
(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : নং ২৫৫৮৯)

এরা হলেন আল্লাহকে মহব্বতকারী। তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও ওঠাবসা করে জীবনযাপন করতে হবে। যেন এর ফলে আল্লাহর মহব্বত অর্জিত হয়।

বড় তরমুজকে দেখে ছোট তরমুজ যেমন রং ধারণ করে আর চুম্বকের কাছে থেকে লোহা যেমন চুম্বকের আকর্ষণ লাভ করে, তেমনি আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্যে থেকে আধ্যাত্মিক সাধনাকারীও আল্লাহর মহব্বত পেয়ে যায়। আল্লাহ খুশি তো সারা জগৎ খুশি।

## আল্লাহর অসন্তুষ্টির মারাত্মক পরিণতি

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, 'যে ব্যক্তি সৃষ্টিজীবকে সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজীবকে তার প্রতি অসন্তুষ্ট বানিয়ে দেন।'

বাস্তবেই এমনটি হয়! আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন, বিয়ে-শাদিতে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মানুষকে খুশি করতে ব্যস্ত থাকে সবাই। অবশেষে ফলাফল এই হয় যে, যাদেরকে খুশি করার জন্য এতকিছু করল, তারাও সন্তুষ্ট থাকে না।

## আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পুরস্কার

হযরত আয়েশা রা. আরো বলেন–

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বান্দার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, বান্দা তার যতই বিরোধী হোক না কেন, এক সময় আল্লাহ তাআলা সেই বিরোধী লোকদেরকেও তার বন্ধু বানিয়ে দেন।'

কারণ মানুষের অন্তর তো আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো– আল্লাহর ইবাদত করা, অধিকহারে তাঁর যিকির করা, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে আপন প্রতিপালককে স্মরণ করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

আমি বাহন জন্তুর পিঠে রাসূল সা. এর পেছনে বসেছিলাম। তখন রাসূল সা. বলেন–

يا غلام! احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك.

'হে বালক, তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখো, আল্লাহ তোমাকে স্মরণ রাখবেন। তুমি আল্লাহমুখী হও, আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে।' (শুআবুল ঈমান : নং ১৯৫)

স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহর সাথে পরিচয় করে নিলে অস্বাচ্ছন্দ্যের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন। যখনই প্রার্থনা করবে, আপন রবের কাছেই প্রার্থনা করবে। সাহায্য চাইলে আপন পরওয়ারদেগারের সাহায্য চাও।

## মর্যাদাবান মানুষ

কেয়ামতের দিন মানুষের হিসাব-নিকাশ হওয়ার আগে একটি ঘোষণা হবে– 'মর্যাদাবানরা কোথায়?' তখন কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাবে।
তাদেরকে বলা হবে– 'কোনো হিসাব ছাড়া তোমরা জান্নাতে চলে যাও।'
লোকেরা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, 'এই মর্যাদাবান লোকেরা কারা?'
ফেরেশতারা উত্তরে বলবে, 'এরা এমন লোক, দুনিয়ায় তাদের সাথে কেউ বাড়াবাড়ি করলে তারা আল্লাহর ওয়াস্তে তাদেরকে ক্ষমা করে দিত।'

হায়, আমাদের অবস্থা কী? আমরা তো বলি– আমরা ইঁটের জবাব পাটকেল দিয়ে দিই!!

## ধৈর্যশীল মানুষ

উক্ত ব্যক্তিরা জান্নাতে চলে গেলে পুনরায় ঘোষিত হবে– 'ধৈর্যশীল লোকেরা কোথায়?' তখন কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে আর তাদেরকেও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। মানুষজন ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, 'এই ধৈর্যশীল লোকেরা কারা?'
তারা উত্তর দিবে, 'আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে এরা নিজেদের নফসকে বাধা দিত এবং ধৈর্যধারণ করত। এ কারণেই তাদেরকে আজ বিনা হিসাবে জান্নাতে পাঠানো হয়েছে।'
বর্তমানে প্রবৃত্তি মানুষকে প্ররোচনা দেয় আর মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে,
কু-নজর দিতে আত্মা উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু বান্দা নজরের হেফাযত করে,
অন্তর চায় ঘুষ নিতে আর মানুষ নিজেকে বিরত রাখে।
যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে নিজের আত্মাকে ধৈর্য ধারণ করতে বাধ্য করবে, তার এ আমলের বিনিময়ে কেয়ামতের দিন বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

## আল্লাহ তাআলার প্রতিবেশী

এরপর তৃতীয় ঘোষণা হবে– 'আল্লাহর প্রতিবেশীরা কোথায়?'

কিছু লোক ঘোষণা শুনে উঠে দাঁড়াবে। তাদেরকেও বলা হবে– 'তোমরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করো।'
মানুষ এ দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করবে, 'আল্লাহর এই প্রতিবেশীরা কারা?'
তাদেরকে জানানো হবে, 'এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরকে মহব্বত করত। এদেরকে আল্লাহ তাঁর প্রতিবেশী আখ্যা দিয়েছেন এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাব ছাড়া জান্নাত দান করেছেন।'

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহকে ভালোবাসার প্রতিদান তো পাওয়া যাবেই, আল্লাহর জন্য কোনো মাখলুককে ভালোবাসলেও আল্লাহ তাকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন। এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে বেশি বেশি এ দুআ করা উচিত– তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা দান করেন!

## সুসময়

মহান আল্লাহ যতক্ষণ না চাইবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ নেয়ামত লাভ করব না। সবকিছু হয় উপর থেকে। ওদিক থেকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয় আর নিজে নিজেই পথ খুলে যায়। কবি বলেন–

حسن کا انتظام ہوتا ہے
عشق کا یونہی نام ہوتا ہے

'সব ব্যবস্থা হবে সুন্দর-বেহতর,
এরই নাম হলো ইশক-মহব্বত!'

তিনি যখন চান, নিজের পক্ষ থেকেই আগমনের পথ সুগম করে দেন। কবির ভাষায়–

سن لے اے دوست! جب ایام بھلے آتے ہیں
گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

'শোনো হে বন্ধু, যখন সুসময় আসবে,
মিলনের সুযোগ তিনিই করে দিবেন।'

তিনি নিজেই মিলনের পথ খুলে দেন, পদ্ধতিও বলে দেন। তিনি রাতে জাগ্রত করেন। মানুষ উদাসীনতার ঘুমে বিভোর থাকে আর বিশ্ব-প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলে পাঠান— যাও, ডানার ঝাঁপটা দিয়ে আমার বান্দাদেরকে জাগিয়ে দাও। এখন আমার দেয়ার সময়। এরা ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে আমার কাছে প্রার্থনা করবে আর আমি তাদের আঁচল ভরে দান করব।

## একটি সুসংবাদ

হযরত গাঙ্গুহী রহ. একটি কথা বলতেন—
'আল্লাহর নাম যত উদাসীনতা ভরেই নেয়া হোক না কেন, কেয়ামতের দিন তা মানুষের কোনো না কোনো উপকারে আসবেই।'
কারণ আল্লাহর নাম অত্যন্ত বরকতময়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে—

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ

'আপনার প্রতিপালকের নাম বরকতময়।'
(সূরা রহমান : ৭৮)

প্রতিপালক নিজেই যখন বলেন— 'আপনার রবের নাম বরকতময়', তখন তার বরকত এত বেশি যে, কেউ তার প্রতিপালকের নাম উদাসীনতার সাথে উচ্চারণ করলেও কিছু না কিছু উপকার লাভ করে। আর কেউ যদি মহব্বতের সাথে এ নাম উচ্চারণ করে তবে সে কি উপকৃত হবে না???

এক ব্যক্তি আমাকে অভিযোগের সুরে বলল—
'এই যে আপনারা সব সময় আল্লাহ আল্লাহ জপতে থাকেন, এটা আবার কী?'
আমি তাকে এই কবিতা শুনিয়ে দিলাম—

ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو
ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے

'কোনো উদ্দেশ্য না থাকলেও তোমার নাম জপেই যাব,
আমরা যে তোমার নামের আশেক, দেওয়ানা!'

কারো প্রতি ভালোবাসা তৈরি হলে তার নাম মুখে নিতেও মধুর লাগে! তেমনি আল্লাহর নাম নিলেও মুখে মিষ্টির স্বাদ অনুভূত হয়!

## জাহান্নাম থেকে মুক্তি— এতটুকু আমলের মাধ্যমে...

মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তির মুখে মহব্বত ও ভক্তির সাথে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে এবং যার চোখ থেকে অনুতাপের অশ্রু প্রবাহিত হবে, সে ব্যক্তি একদিন না একদিন জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। তাই যখনি আল্লাহর নাম রসনায় উচ্চারিত হবে, তখন তার নামের বরকতে দুআ চাইতে হবে। এভাবে– হে আল্লাহ! আপনার নামের বরকতে এ দুআ করছি!

## আমাদের গুনাহের অবস্থা

আল্লাহ তাআলার রহমতের দরিয়ার মোকাবেলায় আমাদের গুনাহের তো কোনো অস্তিত্বই নেই! কাহিনী আছে :

এক মাছি এসে বসল হাতির পিঠে। চলে যাওয়ার সময় কৈফিয়ত দিয়ে বলল, 'ওহে হাতি, আমি তোমার পিঠে কিছুক্ষণ বসেছি, তাই তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

হাতি বলল, 'আরে মিয়া, আমি না তোমার বসার খবর পেয়েছি, না তোমার চলে যাওয়া অনুভব করেছি! আবার এসেছ মাফ চাইতে!'

হাতি যদি একটি মাছির ওজন অনুভব না করে, তবে আল্লাহর রহমতের সামনে বান্দার গুনাহও অনুভব হবে না। আল্লাহ তাআলার রহমতের বিশাল সমুদ্রের কাছে আমাদের গুনাহের অবস্থানই বা কী!

আমরা যদি আল্লাহ তাআলার দরবারে মহব্বতের সাথে আমাদের গুনাহ মাফের আর্জি জানাই, তাহলে নিশ্চয় তিনি আমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং আমাদেরকে তাঁর রহমতের চাদরে ঢেকে নিবেন। সেই মহান দয়ালু সত্তার কাছে প্রার্থনা করলে তিনি তা শোনেন ও সাড়া দেন। তবে এই প্রার্থনা হতে হবে অন্তর থেকে। উদাসীনতাময় দুআ করলে কী ফায়দা হবে? কোনো ভিক্ষুক যদি আমাদের কাছে হাত পাতে আর উদাসীনতার ভাব দেখায়, চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখে, তবে তাকে কিছু দেয়ার বদলে থাপ্পড় দিতে ইচ্ছা করবে না? এ কেমন বেয়াদবি? হাত পেতেছে, আবার মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছে! আফসোস, আজ আমরা এভাবে দুআ করি যে, মুখে তো বাক্য উচ্চারণ করি, কিন্তু অন্তর আল্লাহ থেকে গাফেল থাকে। এটা আল্লাহ তাআলার সহনশীলতা যে, এরপরও তিনি এমন দুআকে আমলনামায় লিখিয়ে দেন। অন্যথায় তা তো মুখের উপর নিক্ষেপ করার যোগ্য!

# যে অন্তর থেকে আপন রবকে ডাকবে...

অন্তর থেকে আপন প্রতিপালককে যারা ডাকে তাদের কাহিনী শুনুন। এক বৃদ্ধা মহিলা ছিল। তার স্বামী কোনো কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বলল, 'তুমি আমার মায়ের মতো!' এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় যেহার বলে। ইসলামপূর্ব আরবে প্রচলন ছিল– স্বামী তার স্ত্রীকে এমন কথা বললে স্ত্রী সব সময়ের জন্য তালাক হয়ে যেত। তাই স্বামীর মুখে এ কথা শুনে বৃদ্ধা পেরেশান হয়ে গেল; শেষ বয়সে কিনা স্বামী তাকে এমনভাবে তালাক দিয়ে দিল! বৃদ্ধা নবীজির দরবারে হাজির হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর প্রিয় বান্দা! আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। আমি বৃদ্ধা, সহায়-সম্বলহীন। ঘর-বাড়ি নেই। যাওয়ার জায়গা নেই। এখন আমাকে কেউ বিয়েও করবে না। সন্তান হওয়ার বয়স নেই, আশাও নেই। এখন আমি কী করব?'

রাসূল সা. নিয়ম অনুযায়ী তাকে বলে দিলেন যে, তালাক তো হয়ে গেছে!

সে এ কথা শুনে আরো পেরেশান হয়ে গেল। তাকে কয়েকবার বোঝানোর পর আল্লাহর রাসূল সা. চুপ হয়ে গেলেন। বৃদ্ধা ভাবল– স্বামী তো আমাকে ঘর থেকে বের করেই দিয়েছে, এখন আল্লাহর রাসূল সা.ও আমার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামালেন না, উত্তর দিয়েই চুপ হয়ে গেলেন! এখন তো আমার আর ঠিকানা রইল না।

তার যখন আর কোনো উপায় মাথায় এল না, তখন আপন প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করল এবং তাঁর উদ্দেশ্যে আহাজারি করে বলল–

'আমার প্রভু! আমি বৃদ্ধা। সন্তানরা বড় হয়ে গেছে। স্বামী ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। আবার বিয়ে করাও সম্ভব না। সন্তান হওয়ার আশাও নেই। ঘর-বাড়ি কিছুই নেই আমার। সহায়-সম্বলহীন অসহায় এই আমি কোথায় ঘুরে মরব? তোমার মাহবুবের দরবারে হাজির হয়েছি, তিনিও একই কথা বলে চুপ হয়ে গেছেন। মাওলা! এখন তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই। কেউ যখন শোনে না, তখনও তো তুমি শোনো। এই বুড়ির ফরিয়াদ শোনো।'

দয়াময় আল্লাহ তখনি রাসূল সা. এর কাছে অহী পাঠালেন–

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْۤ اِلَى اللّٰهِ

'যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করছে আপনার সাথে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, নিশ্চয় আল্লাহ তার কথা শুনেছেন।'
(সূরা মুজাদালাহ : ১)

হে প্রভু! আপনি কতই না দয়ালু যে, এক বৃদ্ধা আপনার কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছে আর আপনি অহী নাযিল করেছেন। এখন কোনো বুড়ো– যে গুনাহ করে করে চুল-দাড়ি সাদা করে ফেলেছে– যদি আপনার ঘরে বসে আপনাকে ডাকে এবং আপনার কাছে রহমত কামনা করে, তাহলে হে আল্লাহ, আপনার রহমত কেন নাযিল হবে না! তার গুনাহ কেন মাফ করবেন না!

## তার কান্না এতই পছন্দ হয়েছে যে...

হাদীস শরীফে এসেছে– রাসূল সা. একবার খুবই মর্মস্পর্শী বয়ান করলেন। বয়ান শুনে এক সাহাবী কান্নাকাটি-আহাজারি আরম্ভ করলেন। মহানবী সা. তাঁর রোনাজারি দেখে বললেন, 'তার কান্না আল্লাহ তাআলার এত পছন্দ হয়েছে যে, তার উসিলায় মাহফিলে উপস্থিত সবাইকে তিনি মাফ করে দিয়েছেন।'

তিনি কতই না মেহেরবান যে, এত বড় মজমার মধ্য হতে একজনের ফরিয়াদ কবুল করে তার উসিলায় বাকি সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন।

## তবে তো কোনো সমস্যা নেই...

একবার এক সাহাবীর কাছে কেয়ামতের আলোচনা করা হলো। তিনি অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়ামতের দিন কে হিসাব নিবেন?'
কী সরল প্রশ্ন!
উত্তর পেলেন, 'আল্লাহ তাআলা হিসাব নিবেন।'
বললেন, 'তিনিই যদি হিসাব নেন, তবে তো কোনো সমস্যা নেই!'

তাঁর এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল- ফেরেশতারা হিসাব নিলে তো কঠিন হবে। তাই যখন তিনি শুনলেন, স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন হিসাব নিবেন, তখন বলে উঠলেন– 'আল্লাহ তাআলা হিসাব নিলে তো চিন্তার কিছু নেই!' কারণ তিনি জানতেন, আল্লাহ তাআলা বড় দয়ালু, বড় মেহেরবান! আল্লাহর

রহমতের প্রতি সাহাবীদের কত ভরসা ছিল, কত স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তথ্যটা জেনে নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারলেন– 'আল্লাহ তাআলা হিসাব নিলে তো ভয়ের কিছু নেই!'

## ক্ষমা করার বাহানা

হাদীস শরীফে আছে, এক গুনাহগার ব্যক্তি ছিল। সে একবার গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে বলে উঠল, 'ইয়া রব!'
এর ফলেই আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দিলেন। ফেরেশতারা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন যে, সারা জীবনের গুনাহ একবার 'হে প্রভু' বলার কারণে মাফ হয়ে গেল! আল্লাহ তাআলা তাদের জিজ্ঞাসু নেত্রের উত্তরে বললেন–

أعلم عبدي أن له ربا.

'আমার বান্দা কি এটা জেনেছে যে, তার প্রতিপালক আছেন?'
(সহীহ বুখারী : নং ৭০৬৮)

অর্থাৎ সে যদি এটা জেনেই থাকে যে, তার একজন প্রতিপালক আছেন, তবে আমি তার গুনাহ মাফ করে দিচ্ছি।

আমাদেরও তো সেই একই প্রতিপালক, নয় কি? আমরা তো তাঁর কাছেই প্রার্থনা করি, তাঁর রহমত কামনা করি, যেন তিনি তাঁর রহমত বর্ষণ করেন।

## আল্লাহ আর কবে দিবেন আমায়?

এক দরিদ্র, অসহায় বৃদ্ধা ছিল। খাবার মিলত না তার। ক্ষুধার কষ্টে সে ছটফট করত আর ঘরে ঘরে গিয়ে খাবার চাইত। অনেকে কিছু দিত আর অনেকে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলত, 'আল্লাহ দিবেন, আল্লাহ দিবেন!'
কিছুদিন পর বৃদ্ধার মৃত্যু হলো। এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখল। তাকে জিজ্ঞেস করল, 'একটু বলবেন কি, আপনার সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে?'
সে বলল, 'আমাকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হলো। ফেরেশতারা আমাকে জিজ্ঞেস করল– কী নিয়ে এসেছ? আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম– একটু খাবারের আশায় সারা জীবন আমি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি, মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়েছি। যার কাছেই হাত পাততাম, সেই বলত– আল্লাহ দিবেন, আল্লাহ দিবেন। এখন তো আমি আল্লাহর সামনে

উপস্থিত হয়েছি। তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছ, কী নিয়ে এসেছি। আমি সারা জীবন শুনে এসেছি, আল্লাহ দিবেন। এখন বলো, আর কবে আল্লাহ আমায় দিবেন?

আমার এ কথা আল্লাহ তাআলার এত পছন্দ হলো যে, তিনি এর কারণেই আমাকে মাফ করে দিলেন।

## মহব্বতের ইশারা

এক লোকের নলখাগড়া দিয়ে বানানো একটি কুটির ছিল। কোথা থেকে এক মাহুত এসে তাকে বলল, 'আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাচ্ছি।'

সে বলল, 'আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে রাজি নই।'

কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, 'তুমি তো মাহুত, হাতি নিয়ে আসবে, অথচ আমার ঝুপড়িতে হাতি ঢুকতে পারবে না।'

হাতিওয়ালা এ কথা শুনে মুচকি হেসে বলল, 'তুমি একবার শুধু হ্যাঁ বলে দেখো, আমি তোমার পর্ণকুটিরকে মহল বানিয়ে দিব। যেখানে অনায়াসে হাতি আসতে পারবে।'

ঠিক একই ব্যাপার কুরআন মাজীদে বিধৃত হয়েছে–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'আল্লাহ মুমিনদের বন্ধু।'

(সূরা বাকারা : ২৫৭)

মুমিন যদি এখন রাজি হয়ে বলে, 'জি আল্লাহ, আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই', তবে তিনিও ডাকে সাড়া দিবেন। তখন পরম করুণাময় আমাদের ঝুপড়িকে মহল বানিয়ে দিবেন। ভালোবাসার আদব শিক্ষা দিয়ে তাঁর ভালোবাসার নেয়ামত নিজেই দান করবেন। এটা হলো বড়দের পক্ষ থেকে মহব্বতের ইঙ্গিত। তিনি যখন ইঙ্গিত করেছেন, তো আমরা এর জন্য প্রস্তুত। হে প্রিয়তম! আমরা আপনাকে মহব্বত করতে সম্পূর্ণ রাজি। আপনিও আমাদেরকে আপন মহব্বতে শামিল করুন!

## মহব্বত লাভ হয় মেহনতে

'মহব্বত' ও 'মেহনত'– এ দুটি শব্দ (আরবি-উর্দুতে) দেখতে প্রায় একই রকম। শুধু নোকতা উপর-নিচে হওয়ার পার্থক্য। মেহনত শব্দে নোকতা

উপরে থাকে। তাই যার ভেতর বড়ত্ব রয়েছে তার এখনি মেহনত করতে হবে। কারো অন্তরে অহঙ্কার, গর্ব, আত্মম্ভরিতা থাকলে বিনয় ও নম্রতা তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ নোকতাকে উপর থেকে নিচে আনতে হবে। বড়রা যে বলেন– নিচু হও, ঝুঁকে যাও, আপন সত্তাকে মিটিয়ে দাও, নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করো, এর উদ্দেশ্যও এটাই যে- মানুষ মেহনতের নোকতাকে উপর থেকে নিচে আনবে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার এই মেহনত ও সাধনার ফলাফল হিসেবে আপন ভালোবাসা দান করবেন।

## আল্লাহর সৌন্দর্যের গর্ব

মনোযোগ সহকারে একটি কথা শুনুন। ইলমি নুকতা (সূক্ষ্ম তত্ত্ব); তালিবে ইলমদের জন্য লক্ষণীয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'ঈমানদারদের আল্লাহর প্রতি তীব্র ভালোবাসা থাকে।'
(সূরা বাকারা : ১৬৫)

এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালোবাসার আদেশ দেননি। আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি যে– তোমরা আমাকে ভালোবাসো। বরং এখানে সংবাদ দেয়া হয়েছে। এটি সংবাদমূলক বাক্য। কী সংবাদ দেয়া হচ্ছে?– 'ঈমানদারদের আল্লাহর প্রতি তীব্র ভালোবাসা থাকে।'

তাই এখানে তালিবে ইলমদের অন্তরে এ প্রশ্ন তৈরি হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালোবাসার আদেশ দিলেন না কেন?

মুফাসসিরীনে কেরাম এর উত্তরে বলেছেন–

সৌন্দর্যের অধিকারীদের অন্তরে আপন সৌন্দর্যের গর্ব থাকে। তাদের অনুভূতি থাকে এমন- কেউ যখন জানতে পারবে যে আমি এত সুন্দর, তখন তাকে বলতে হবে কেন, আমাকে ভালোবাসো! সে তো এই অনুপম সৌন্দর্যের কারণেই প্রবলভাবে ভালোবাসবে। তো আল্লাহ তাআলাও যেন বলছেন– ওহে মুমিনগণ! আমি কতই না সৌন্দর্যের অধিকারী! এত সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমরা আমাকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না! আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তোমরা যখন আমার সৌন্দর্যের কথা শুনবে, আমার দয়া ও করুণার কাহিনী শুনবে, আমার রহমতের ব্যাপারে জানবে যে,

আমি সবচেয়ে সেরা দয়ালু, সবার চেয়ে বড় ফয়সালাকারী, শ্রেষ্ঠ দাতা, তখন তোমরা আমাকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না!

এই মহব্বত একটি কল্যাণকর বস্তু। বান্দা আল্লাহকে মহব্বত না করে থাকতে পারে না। বন্ধুরা, এতে সৌন্দর্যের অধিকারীদের গর্বের রহস্য রয়েছে। তারা ভাবে, আমাকে পাওয়ার ও কামনা করার লোকের অভাব নেই। কেউ কামনা না করলেও কিছু যায়-আসে না। তেমনি এখানেও আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন– মুমিনরা আমাকে তীব্রভাবে ভালোবাসে। কেউ ভালো না বাসলেও আমার সৌন্দর্যে কোনো তফাত হবে না, আমার বড়ত্বে কোনো খাদ তৈরি হবে না। মনে রাখবে, আমাকে কামনাকারী লোকের অভাব নেই!

## আল্লাহর প্রেমিক

আল্লাহকে মহব্বতকারী মানুষেরা অনেক বড় ইউসুফ-যুলাইখা। আল্লাহপ্রেমীরা অনেক বড় মজনু-লায়লা। এটা তো আমাদেরই প্রয়োজন যে, আমরা আল্লাহপ্রেমীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। দুনিয়াতে এ পর্যন্ত কত না আল্লাহপ্রেমী অতিবাহিত হয়েছেন! তাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি। খোদাপ্রেমীরা রাতের নির্জনতায় তাঁকে ডাকেন, তাঁর সামনে আঁচল পাতেন, তাঁর নামে জীবন উৎসর্গ করেন, সম্পদ লুটিয়ে দেন। তাঁর ভালোবাসায় গভীর রাতে রোনাজারি করেন। এই আশেকদের কাহিনী শুনলে বিস্মিত হতে হয়। কয়েকটি কাহিনী শুনুন—

* আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি বনী ইসরাইলের এক বৃদ্ধকে, যে একান্ত নির্জনে বসে আল্লাহর সাথে কথা বলছে-

'হে আল্লাহ! আপনার রাসূল মুসা আ. এর কাছে আমি শুনেছি, আপনার স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, আপনার খেদমতের লোক নেই। আল্লাহ! আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি। প্রভু! আপনি চলে আসুন, আমি আপনার খেদমত করব। আমি আপনাকে অনেক কিছু দিব...!'

মুসা আ. ঘটনাক্রমে তার এই কথাবার্তা শুনতে পেলেন এবং তাকে সতর্ক করে বললেন যে, আল্লাহর সাথে এভাবে কথা বলা বেয়াদবি, এভাবে বলা উচিত নয়। বৃদ্ধ ভয় পেল, মুসা আ. চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা মুসা আ. এর কাছে অহী প্রেরণ করলেন– 'ওহে মুসা! আমি তো আপনাকে

পাঠিয়েছি, যেন আপনি মানুষকে আমার সাথে সম্পৃক্ত করেন, অথচ আপনি আমার সাথে মানুষের সম্পর্ক ভেঙ্গে দিচ্ছেন!'

ভাবার বিষয় হলো, সেই বৃদ্ধ এমন এমন কথা বলছিল, যা আল্লাহর শান-উপযোগী নয়। সে তো কেবল ভালোবাসার জন্যই বলেছিল। এমন কথাও যদি আল্লাহর ভালো লাগে, তবে যে কথা আল্লাহর শান অনুযায়ী হবে এবং কেউ মহব্বতের নির্যাস মিশিয়ে বলবে, তাহলে তা আল্লাহর কাছে কতটা পছন্দনীয় হবে?

* এক নারী তাহাজ্জুদের সময় দুআ করছিলেন- 'হে আল্লাহ, আমার সাথে আপনার মহব্বতের সম্পর্ক। আমার অমুক কাজটি এমন করে দিন...!'

এক ব্যক্তি এই দুআ শুনতে পেয়ে বলল, 'এভাবে বলা ঠিক নয়। এভাবে বলুন– হে আল্লাহ, আপনার সাথে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক।'

তিনি উত্তর দিলেন– 'এটা কী করে হতে পারে? আল্লাহ আমাকে ভালো না বাসলে আমাকে গভীর রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করতেন না আর আপনাকে এভাবে সারা রাত মিষ্টি ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখতেন না!'

এই হলো প্রকৃত মহব্বত!

* আল্লামা শিবলী নোমানী রহ.ও এমন প্রেমিক ছিলেন। তাঁর সামনে কেউ আল্লাহর নাম নিলে তিনি তার মুখে গুড়ের টুকরো পুরে দিতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'এ কাজ আপনি কেন করেন? আপনার সামনে কেউ আল্লাহর নাম নিলে তার মুখে গুড় পুরে দেন কেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'যে আমার প্রিয়তমের নাম নিবে আমি তার মুখে মিষ্টান্ন দিব না তো কী করব?'

* ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. রাতের নির্জনতায় কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন, নামায পড়তেন, প্রতিপালকের সাথে কথা বলতেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার অযু দিয়ে ফজর আদায় করেছেন। আপন রবের সাথে মহব্বতের এরচেয়ে বড় দলিল আর কী হতে পারে?

* আল্লাহপ্রেমীদের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. রয়েছেন। কুরআনের জন্য তাঁকে কশাঘাত করা হয়েছিল আর তিনি মুখ বুজে সহ্য করেছেন।

* আল্লাহপ্রেমীদের দলে আরো রয়েছেন ইমাম মালেক বিন আনাস রহ.। তার যুগের শাসক তাকে অপমানিত করতে তার মুখে কালি মেখে মদীনার

অলিগলিতে ঘুরিয়েছে। কিন্তু তিনি নিজেই বললেন, 'যারা জানে, তারা তো জানেই, আর যারা জানে না তারাও যেন জেনে নেয়– আমি মালেক বিন আনাস। আমাকে দীনের জন্য এভাবে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে।'

আল্লাহর মহব্বতে কুরবানি করেছেন, প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, ইজ্জত-সম্মান জলাঞ্জলি দিয়েছেন, এমন কত না মহামানব অতিবাহিত হয়েছেন। এ কথা চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, যুগে যুগে কত আল্লাহপ্রেমী গত হয়েছেন।

## আল্লাহপ্রেমীদের কাফেলা

রাসূল সা. এর যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যত বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন তাদের জীবনী পাঠ করে দেখুন, বুঝতে পারবেন তাঁদের অন্তরে কী পরিমাণ আল্লাহর ভালোবাসা ছিল। তাঁদের দিন-রাত কীভাবে কাটত। নকশবন্দী শায়খরা একটি জামাত, একটি দল, একটি কাফেলা– যারা আল্লাহর মহব্বতের পথে যাত্রা করেছেন। যারা এই মনজিলে পৌঁছেছেন তারা কতই না সৌভাগ্যবান ছিলেন। আমরা এখন তাঁদের আদর্শেই পথ চলব। আমরাও যদি আল্লাহকে ভালোবাসার এ পথে চলি এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকি, তবে নিশ্চয়ই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আমাদেরকেও তাঁর প্রকৃত মহব্বত দান করবেন এবং আমাদেরকেও সেই সব আল্লাহপ্রেমীদের সাথে কেয়ামতের দিন মিলিত করবেন। বন্ধুরা, আমরা যদি পিছে রয়ে যাই, তবে ক্ষতি আমাদেরই। দুনিয়ায় আল্লাহপ্রেমীদের কমতি নেই।

## আল্লাহর কাছে আল্লাহকে চেয়ে নিন!

তাই আজকের এই মাহফিলে আমরা খাঁটি দিলে দুআ করি–

প্রভু হে! আমাদের অন্তরকে আপনার ভালোবাসা দিয়ে ভরপুর করে দিন! দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। কেউ বলে, অমুকের হাতে বায়আত হয়েছে। কেউ বলে, এ তো সুফী। কেউ বলে, তিনি যিকিরকারী। কেউ কেউ বলে, ইনি সালেক। এ সব শব্দ তো আপন স্থানে রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ! হৃদয়ে যদি আপনার ইশকের স্বাদ অনুভব না হয়, তবে কেয়ামতের দিন কীভাবে মুখ দেখাব! আজ সময় হয়েছে, আপনার প্রেমিকদের মজমা এটা, আমাদের শুধু একটাই কামনা, একটাই প্রার্থনা–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার মহব্বত কামনা করছি!'

(মুসনাদে আহমাদ : ৩৬/৪২৩ নং ২২১০৯)

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর আপনার মহব্বতে ভরপুর করে দিন!
হে আল্লাহ! আমরা আর কতদিন এমন প্রাণহীন নামায আদায় করব?
আর কতদিন এমন বিস্বাদ সেজদা করে যাব?
মসজিদে দাঁড়াই আর মন পড়ে থাকে বাসায় বা বাজারে!
এমন লৌকিকতা কতদিন করব?
কবে আমাদের নামাযে প্রাণ আসবে?
হাদীসে যে ইহসানের স্তরের কথা পড়েছি, তা আমরা কবে লাভ করব?
রাসূল যে ইরশাদ করেছেন–

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ!'

(সহীহ বুখারী : নং ৫০, ৪৭৭৭)

এটা কি কথার কথা থেকে যাবে, না কখনো বাস্তব হবে! একে আজ বাস্তব করুন এবং আমাদেরকে আপনার প্রকৃত প্রেম দান করুন।

হে প্রভু! আপনি তো মহা দয়ালু! আপনি দুজন নবীকে ফেরআউনের কাছে পাঠিয়েছেন। যে ফেরআউন এত উদ্ধত ও নাফরমান ছিল যে, নিজেকে 'সবচেয়ে বড় রব' দাবি করত, আপনি তার ব্যাপারে দুই নবীকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন–

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

'তোমরা ফেরআউনের সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে।'

(সূরা তহা : ৪৪)

আল্লাহ! যে নিজেকে বড় খোদা দাবি করত আপনি তার সাথেও কোমল আচরণের আদেশ দিয়েছেন। আমরা তো সেজদায় বলি– 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' (কতই না মহান আমার রব!) এরপরও আপনি আমাদেরকে কী করে বঞ্চিত করবেন? মালিক! আমাদের এই 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলা কবুল করে নিন! আমাদের সেজদা ফিরিয়ে দিবেন না! মাওলা! আমরা জমিনে কপাল ঠেকাই, একে শূন্য ফিরিয়ে দিবেন না! দয়ালু রব! আপনি খোদা দাবিকারীর সঙ্গে কোমল ব্যবহারের আদেশ দেন, আর এটা তাদের মজলিস, 'যারা সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলে, আমরা আঁচল পেতে বসে আছি।

দয়াময় আল্লাহ! আমরা আপনার রহমতের ভিখারি, আপনার প্রেমিক! হে আল্লাহ! কতজন কত দূর থেকে এসেছে, এরা সবাই একই আর্জি নিয়ে এসেছে! পুরুষও এসেছে, নারীও এসেছে; ঘর ছেড়ে, গোত্র ছেড়ে, দেশ ছেড়ে শুধু আপনাকে সন্তুষ্ট করতে এসেছে এবং আপনার সাথে সম্পর্কের কারণেই এসেছে। আজ আমাদেরকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিবেন না! আজকের মাহফিলে আমাদেরকে আপনার মহব্বতের নেয়ামত দান করুন! আপনার প্রতি তীব্র ভালোবাসা ও ইশক দান করুন! আমরা আপনার প্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। আমাদের মধ্যে যোগ্যতা নেই, আমাদের সেই গুণাবলি নেই, কিন্তু আপনি চাইলে আমাদেরকে আপনার নৈকট্য দান করতে পারেন!

হে আল্লাহ! সবেমাত্র হাঁটতে শিখছে এমন শিশু যখন তার বাবার দিকে অগ্রসর হয় এবং পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তার বাবা সন্তানকে পড়ে যেতে দেন না, তাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে নেন। আমরাও তো এমন; আমরা পথ চলতে চাই, শয়তান আমাদেরকে ফেলে দিতে চায়। প্রভু! আপনি আমাদেরকে পড়ে যেতে দিবেন না! পতিত হওয়ার পূর্বেই আপনার রহমতের চাদরে ঢেকে নিবেন! আমাদের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করুন! আপনার রহমতের ফয়সালা করুন!

হে আল্লাহ, আমরা আপনার রহমতপ্রত্যাশী। এই মাহফিলে আপনার মহব্বত আমাদের অন্তরে যেন লাভ করি, আমাদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন আপনার রহমত প্রবেশ করে, আমাদের মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপনার ভালোবাসা ছড়িয়ে দিন! আমরা হাঁটতে চাইলে আপনি হাঁটতে বাধা দিবেন, আমরা পিছু হটতে চাইলে রাস্তা বন্ধ করে দিবেন।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার ইশক-মহব্বত দান করুন এবং কেয়ামতের দিন আপনার প্রেমিকদের সাথে হাশর নসিব করুন।

প্রভু হে! আমরা কিতাবে পড়েছি, কেয়ামতের দিন কিছু লোক এমন থাকবে, যারা আপনার সামনে উপস্থিত হবে, আপনাকে দেখে তারা মুচকি হাসবে, আপনিও তাদেরকে দেখে মুচকি হাসবেন। আয় আল্লাহ, আমাদেরও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা এটা যে, আমাদেরকে এমন যিন্দেগি দান করুন, যেন কেয়ামতের দিন আপনার সামনে হাজির হয়ে মুচকি হাসতে পারি, আপনিও যেন আমাদেরকে দেখে মুচকি হাসেন।

তখন যেন এ আহ্বান শুনতে পাই–

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

'হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে!
এরপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।'
(সূরা ফাজর : ২৭-৩০)
[আমীন! সুম্মা আমীন!]

﴿وَآخِرُ دَعْوٰنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (سورة ق : ١٦)

বয়ান- ২ :

# আল্লাহর নৈকট্যের স্তর

## قرب الٰہی کے مراحل

**বয়ান** : শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী হাফিযাহুল্লাহ
**তারিখ** : ৩০ নভেম্বর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।
**স্থান** : যয়নব জামে মসজিদ, মা'আদুল ফকীর আল ইসলামী, ঝাঙ্গ।
**উপলক্ষ্য** : জুমআর বয়ান।

## চয়নিকা

আদব ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে মানুষ উপকারী ইলম লাভ করে। উপকারী ইলমের মাধ্যমে সে আমলের তাওফীক লাভ করে। আমলের বরকতে মানুষের জন্য হিকমত ও প্রজ্ঞার দুয়ার খুলে যায়। হিকমতের মাধ্যমে দুনিয়া তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায় এবং আখেরাতের দিকে তার অন্তর ধাবিত হয়। এর ফলে আখেরাতের আমল করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। নফল আমল, কুরআন তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য সব কাজ সহজ হয়ে যায়। এরপর এ সকল কাজের মাধ্যমে বান্দা আপন প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করে। সুতরাং সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই, যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নৈকট্য দান করেন।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ:

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ.

وقال الله تعالى في مقام اخر :

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ.

## সবচেয়ে বড় নেয়ামত

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের উপর আল্লাহ তাআলার অগণিত নেয়ামত ও অনুগ্রহ রয়েছে। তা এত বেশি যে, কেউ গণনা করে শেষ করতে পারবে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا.

'তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করে শেষ করতে পারবে না।'

(সূরা নাহল : ১৮)

তবে এ সকল নেয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে সেরা নেয়ামত হলো- আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল হওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা। কারো প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া– এটাও অনেক বড় নেয়ামত। কাউকে ঈমান ও হেদায়াত দান করা– এটাও অনেক বড় নেয়ামত। কিন্তু

মুমিনদের মধ্য থেকে কাউকে নৈকট্যশীল বানিয়ে নেয়া– এটা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নেয়ামত ও অনুগ্রহ। কুরআন মাজীদের মাধ্যমেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়– ফেরআউন যখন মুসা আ. এর মোকাবেলা করার জন্য যাদুকরদের ডাকল, তখন তারা জানতে চাইল– আমরা এ কাজে সফল হলে কী বিনিময় পাব?

ফেরআউনের কাছে সোনা-রূপার খাজানা ছিল, দরবারের পদ ছিল, কিন্তু সে এ সবের উল্লেখ করেনি। সে বরং উত্তরে বলেছে–

إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾

'তোমরা জয়ী হলে আমার নৈকট্যবান হবে।'

(সূরা শুআরা : ৪২)

বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো তাঁর নৈকট্য লাভ। আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে তাঁর নৈকট্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, তবে সেটাই হবে তার জন্য সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ।

## আল্লাহর নৈকট্য কীভাবে অর্জিত হবে?

এটা যেহেতু আল্লাহ তাআলার অনেক বড় ইহসান ও অনুগ্রহ, তাই প্রতিটি মুমিনের অন্তরে এ আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কারণেই সালেক (আধ্যাত্মিক সাধনাকারী)-এর অন্তরে এ প্রশ্ন থাকে যে, আল্লাহর নৈকট্য কীভাবে অর্জিত হবে? আজকের মাহফিলে এ বিষয়েই আলোচনা করব যে, একজন মানুষ কীভাবে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল হতে পারে।

## আদব-শিষ্টাচার অর্জন

এক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হলো- নিজেকে শিষ্টাচারমণ্ডিত করা। কবির ভাষায়–

أدبوا النفس أيها الأصحاب
طرق العشق كلها آداب-

'ওহে বন্ধুগণ! নিজের আত্মাকে আদব শিক্ষা দাও,
কারণ ইশকের সকল পথ আদবের সাথে সংশ্লিষ্ট।'

আদব ব্যতীত মানুষ কিছুই অর্জন করতে পারে না। এজন্যই বড়রা বলেন–

با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب

'আদবওয়ালা ব্যক্তি সৌভাগ্যবান ও খোশনসিব হয়, আর আদববিহীন ব্যক্তি দুর্ভাগা ও বদনসিব হয়।'

## দীন হলো আদবের নাম

বলা হয়ে থাকে–

الدين كله أدب.

'দীনের পুরোটাই হলো আদব-শিষ্টাচার।'

আল্লাহ তাআলার আদব, রাসূল সা. এর প্রতি আদব, কুরআনের আদব, বাইতুল্লাহর আদব, আল্লাহর অলীদের আদব, পিতা-মাতা ও উসতাদদের প্রতি আদব। পুরো দীনই হলো আদব। কিছু লোক মনে হয় আদবকে অপ্রয়োজনীয় ভাবেন, একত্ববাদের পরিপন্থী মনে করেন, তারা ধোঁকায় পতিত হন। একবার আমি এক ব্যক্তিকে বাইতুল্লাহর কাছে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখলাম। ইশরাকের সময় (সকাল) ছিল, গরম ছিল না যে, পায়ে গরম লাগবে। মানুষ ভাবে, খালি পায়ে হাঁটলে কষ্ট হবে, রোদের তাপে পা জ্বলবে।

আরেক ব্যক্তিকে দেখেছি– কুরআন মাজীদ মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে আছে। সে আল্লাহর কালামকেও সাধারণ ইংরেজি বইয়ের মতো ভেবেছে। আমাদের উলামায়ে কেরাম আমাদের উপর এত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাদেরকে আদব শিক্ষা দিয়েছেন। এ কারণে আমাদের এই এলাকা– পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ও বাংলাদেশ– এর লোকেরা আদবের গুণে গুণান্বিত। তারা এমন কিছু দেখলে পেরেশান হয়ে যায়। ফলে এক বৃদ্ধ সেই কুরআন মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে থাকা ব্যক্তির মাথার নিচ থেকে কুরআন বের করে ফেলল। সে রেগে গেল। আর যে জুতা পায়ে মসজিদে যাচ্ছিল, এক যুবক তাকে বলল, 'এটা তো মসজিদ!' সে উত্তর দিল, 'এতে কোনো সমস্যা নেই!' উত্তর শুনে যুবক দ্বিধায় পড়ে গেল। আমি তাকে বললাম, 'দেখো

ভাই, কুরআন পড়া এক জিনিস, কুরআন বোঝা আরেক জিনিস! এই বেচারা কুরআন পড়লেও বুঝেনি।'

সে জানতে চাইল, 'তা কীভাবে?'

বললাম- তুমিই ভেবে দেখো। আল্লাহ তাআলা তুর পর্বতে তাঁর তাজাল্লী প্রকাশ করেন। ঐ তাজাল্লীর ব্যাপারে তিনি নবীকে বলছেন-

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

'আপনার জুতাদ্বয় খুলে ফেলুন।'

(সূরা তহা : ১৩)

তুর পর্বতে এই তাজাল্লীর সামনে আদব শেখানো হচ্ছে যে, জুতা খুলে ফেলতে হবে, আর এটা তো আল্লাহর ঘর। এখানে আল্লাহর তাজাল্লী সর্বক্ষণই হয়তো বর্ষিত হয়। ঐ লোক অনুধাবনই করতে পারছে না যে, এটা আল্লাহর ঘর, মসজিদ। তো দীন হলো আদবের নাম।

## আদব ও উপকারী ইলম

রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

أدبني ربي فأحسن تأديبي

'আমার রব আমাকে আদব শিক্ষা দিয়েছেন, আর কতই না উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন!'

(কানযুল উম্মাল : নং ৩১৮৯৫)

এরপর বলেন-

علمني ربي فأحسن تعليمي.

'আমার প্রতিপালক আমাকে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন, আর তা কতই না উত্তম ইলম!'

এখান থেকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, মানুষের মধ্যে প্রথমে হয় আদব, এরপর আসে উপকারী ইলম। তাই যার মধ্যে আদব নেই, সে উপকারী ইলম অর্জন করতে পারে না। তথ্য জানতে পারে, মেধাবী হলে অনেক বিষয় মুখস্থ রাখতেও পারে, কিন্তু উপকারী ইলম যাকে বলে- হাদীসে যার ব্যাপারে দুআ চাওয়া হয়েছে- তা নসিব হয় না। আদবের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করে উপকারী ইলম।

# হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর আদব

হযরত মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ. একবার ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বলো তো, হযরত কাশ্মীরী রহ. কীভাবে কাশ্মীরী হলেন?’

(অর্থাৎ আল্লামা আনওয়ার কাশ্মীরী রহ. এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কীভাবে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হলেন?)

যে তালিবে ইলম তাফসীর বিষয়ক অধ্যয়ন করত সে উত্তর দিল– তিনি অনেক বড় মুফাসসির ছিলেন তাই...।

কেউ কেউ বলল– তিনি অনেক বড় মুহাদ্দিস ছিলেন।

যে কবিতার প্রতি আগ্রহী ছিল সে জবাবে বলল– তাঁর কথা ও বক্তৃতা অনেক সুন্দর ছিল।

হযরত শুনতে থাকলেন। পরিশেষে এক ছাত্র বলল– হযরত, আপনিই বলে দিন।

তখন মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ. উত্তর দিলেন– এ প্রশ্ন একবার হযরত কাশ্মীরী রহ. কেই করা হয়েছিল যে, ‘আপনি কীভাবে কাশ্মীরী হলেন? আপনার স্মরণশক্তি এত বেশি যে, বিশ বছর আগে পঠিত বিষয়ও মনে থাকে। হাদীস বলা শুরু করলে একসঙ্গে হাজারো হাদীস শুনিয়ে দেন। এমন স্মৃতিশক্তি তো কেউ দেখেনি। এ নেয়ামত আপনি কীভাবে পেলেন?’

তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি দীনি কিতাবের প্রতি আদব দেখিয়েছি। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আমাকে কাশ্মীরী বানিয়ে দিয়েছেন।’

জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আদব তো সবাই করে। তাহলে?’

বললেন, ‘না, আমি এত বেশি আদব দেখাতাম যে, কখনো ইতিহাসের কিতাবকে দীনি কিতাবের উপর রাখিনি। কোনো দীনি কিতাবের নিচে হাদীসের কিতাব রাখিনি, হাদীসের মর্যাদার কারণে। কখনো হাদীসের কিতাবের নিচে কুরআন মাজীদ রাখিনি, কারণ তা আল্লাহর কালাম। এভাবে কিতাব রাখার ক্ষেত্রেও আমি মর্যাদার তারতম্যের খেয়াল করি।

আর আমি কখনোই অযু ব্যতীত হাদীসের কিতাব স্পর্শ করিনি। মানুষ তো কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযু করে, আমি হাদীসের কিতাবকেও অযুবিহীন স্পর্শ করিনি।

আর আমি যখন কিতাব অধ্যয়ন করি তখন কিতাবের অনুগত থাকি, কিতাবকে আমার অনুগত বানাই না।’

জিজ্ঞেস করা হলো, 'তা কীভাবে?'
বললেন, 'হাদীসের কিতাব অধ্যয়নের সময় দুই দিকের টীকা পাঠ করি। আমার দিকের টীকা তো সহজেই পাঠ করি, উল্টো করে লেখা টীকা পাঠ করতে আমি কিতাবকে উল্টাই না, বরং নিজেই অপর দিকে উঠে গিয়ে পাঠ করি, যাতে কিতাব আমার অনুগত না হয়, আমি কিতাবের অনুগত হই। আমি হাদীসের কিতাবের প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করি। এভাবে কিতাবের প্রতি আদব প্রদর্শনের কারণেই আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন ইলম দান করেছেন।'

## আমার মুরশিদের আদব

আমার মুরশিদ (পীর গোলাম হাবীব নকশবন্দী) রহ. কে এক লোক জিজ্ঞেস করল, 'হযরত, আপনি কীভাবে মুরশিদে আলম (পুরো পৃথিবীর পীর-মুরশিদ) হলেন?'
তিনি বললেন, 'আমি কখনো অযু ছাড়া আমার শায়খকে দেখিনি।'

আমাদের সিলসিলার এক বুযুর্গ ছিলেন খাজা সিরাজুদ্দীন রহ.। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন– 'আমি জীবনে কখনো আল্লাহর ঘরকে অযু ব্যতীত দেখিনি।'

এগুলো কী? ফরযও নয়, ওয়াজিবও নয়। তবে আদব। এ কারণেই সওয়াব লাভের উপযুক্ত। অন্তরে এ সকল আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি আদব থাকতে হবে। যে ব্যক্তি কিতাব ও উসতাদের প্রতি আদব প্রদর্শন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে উপকারী ইলম দান করবেন।

## হযরত গোলাম রাসূল রহ. এর আদব

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এর একজন শাগরেদ ছিলেন। তাঁর নাম গোলাম রাসূল। মুলতানের কাছে শুজাআবাদ নামে একটি বড় শহর আছে। এর খানিকটা আগে পুঁটা নামের এক গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। গ্রামে তিনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মেইন রোড থেকে ত্রিশ কিলোমিটার ভেতরে ছিল তাঁর মাদ্‌রাসাটি। শস্যক্ষেতের ভেতর দিয়ে ব্যাগ-বিছানা মাথায় করে যেতে হত। টাঙ্গা-রিকশা কিছুই পাওয়া যেত না। কারণ রাস্তাই ছিল না। তালিবে ইলমরা ত্রিশ কিলোমিটার পথ বিছানাপত্র মাথায় করে নিয়ে

যেত। বৃহস্পতিবার আসতে হলেও সেই ত্রিশ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে ফিরতে হত। তারপর মূল সড়ক পাওয়া যেত। এই বিরান জনপদে– যেখানে জীবনযাপনের সব উপকরণ ছিল না– তিনশ ছাত্র পড়তে আসত।

তিনি কত বড় নাহুবিদ ছিলেন তা প্রমাণ হয় নিম্নের ঘটনায়—

একবার খাইরুল মাদারিস-এ বার্ষিক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পুরো পাকিস্তানের বড় বড় বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম আগমন করেন। মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান, বড় বড় শায়খুল হাদীস, মুফাসসিরে কুরআনসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, থানবী রহ. এর খলীফা, বিখ্যাত আলেমে দীন হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ রহ. স্টেজে গোলাম রাসূল রহ. এর নাম ঘোষণা করেন এভাবে– 'শামসুন নুহাত (নাহুবিদদের সূর্য) গোলাম রাসূল দামাত বারাকাতুহুম তাশরীফ এনেছেন।' যাকে পুরো রাষ্ট্রের আলেমদের সামনে শামসুন নুহাত বলা হচ্ছে, তিনি কত বড় আলেম!

এই মহান আলেমকে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'হযরত, আল্লাহ তাআলা আপনাকে বহুবিধ সম্মানে ভূষিত করেছেন। আপনি এত ইলম কীভাবে লাভ করেছেন?'

তিনি বললেন, 'উসতাদদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের বদৌলতে।'

আবারো প্রশ্ন করা হলো, 'হযরত, সকল ছাত্রই তো উসতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।'

তিনি বললেন, 'না, পার্থক্য রয়েছে। আমি যখন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এর কাছে বুখারী শরীফ পড়ি তখন হযরত তাঁর কামরা থেকে দারুল হাদীসে হেঁটে আসতেন। আমি উসতাদের মহব্বতে রাতের বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ পথটুকু পরিষ্কার করতাম। যেহেতু তিনি আমাদের শায়খুল হাদীস, আমি তাঁর কাছ থেকে ইলম হাসিল করি। একদিন ঝাড়ু ছিল না। তাই আমি আমার পাগড়ি খুলে রাস্তা ঝাড়ু দিলাম। আল্লাহর কী মহিমা, ঘটনাক্রমে তখন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. জানালা দিয়ে তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখতে পেলেন এবং আমাকে ডেকে বললেন—. গোলাম রাসূল, কী করছ তুমি?

তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে সব কথা খুলে বললাম যে— হযরত, আমি প্রতিদিন এই পথ পরিষ্কার করি। কারণ আপনি এ পথে যাতায়াত করেন, আর আমি আপনার কাছে ইলম অর্জন করি।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. অনেক খুশি হলেন এবং আমাকে বুক ভরে দুআ দিলেন।'

কিছু সময় থাকে কবুল হওয়ার। তখন এক মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলা মানুষকে ঐ স্তরে পৌঁছে দেন, যা সে বছরের পর বছর পরিশ্রম করেও পেত না। উসতাদের এই দুআর ফলে গোলাম রাসূল রহ. কে আল্লাহ তাআলা এমন ইলম দান করেন যে, তিনি ছাত্রদেরকে বলতেন– 'শরহে জামী কিতাবটিকে যদি সারা দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়, কোথাও পাওয়া না যায়, আর কোনো তালিবে ইলম আমার কাছে এসে বলে– হযরত, শরহে জামী কিতাবটি প্রয়োজন, তবে আমি আমার স্মরণশক্তির মাধ্যমে কিতাবটি পুনরায় লিখিয়ে দিতে পারব।'

সুতরাং মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম আসে আদব আর সেই আদবের কল্যাণে তাকে আল্লাহ তাআলা উপকারী ইলম দান করেন। তথ্য-উপাত্ত তো সবাই লাভ করে, তর্ক-বিতর্ক, দলিল-প্রমাণ এ সব তো বেয়াদব লোকেরাও জানে, কিন্তু উপকারী ইলম শুধু তারাই লাভ করে যারা আদবের গুণে গুণান্বিত। বোঝা গেল, প্রথমে মানুষের মধ্যে আদব আসে, আর সেই আদবের বরকতে মানুষের ভেতর উপকারী ইলম আসে।

## উপকারী ইলমের মাধ্যমে আমল নসিব হয়

ইলমে নাফে' তথা উপকারী ইলমের পরিচয় হলো– সেই ইলমের উপর আমল নসিব হওয়া। এক ব্যক্তির অনেক ইলম আছে, কিন্তু তার সেই ইলমের উপর আমল করার তাওফীক হয় না, তাহলে এটা উপকারী ইলম নয়। এই ইলম তার বিরুদ্ধে দলিল।

একবার হযরত মুফতী শফী রহ. তালিবে ইলমদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইলম কাকে বলে?'

একেক ছাত্র একেক রকম উত্তর দিল।

হযরত বললেন, 'শোনো, ইলম এমন নূর ও আলোর নাম, যা অর্জন করার পর তার উপর আমল না করে স্বস্তি পাওয়া যায় না।'

সুতরাং যে ইলমের উপর আমল নসিব হয় সেটাই হলো উপকারী ইলম। আমাদের এক মনীষী বলেছেন–

العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر.

'আমলবিহীন ইলম ফলবিহীন বৃক্ষের মতো।'

## আমলের মাধ্যমে হিকমত নসিব হয়

আদবের মাধ্যমে উপকারী ইলম লাভ হয়, উপকারী ইলমের মাধ্যমে আমলের তাওফীক হয় আর আমলের মাধ্যমে মানুষ হিকমত ও প্রজ্ঞা লাভ করে। হিকমত হলো আল্লাহ-প্রদত্ত অশেষ কল্যাণ। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

'যাকে হিকমত দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়।'

(সূরা বাকারা : ২৬৯)

এটা এমন নেয়ামত, যার মাধ্যমে মানুষ সময় অতিক্রমের সাথে সাথে গোপন ভেদ জানতে পারে। দীনের দায়ী ও মুবাল্লিগের জন্য আবশ্যক বস্তু এই হিকমত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

'আপনি আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করুন হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।'

(সূরা নাহল : ১২৫)

এখানে হিকমত শব্দটিকে আগে আনা হয়েছে। এই হিকমত আমলের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

## হিকমত কী?

হিকমত অর্জিত হওয়ার নিদর্শন হচ্ছে- দীনের ব্যাপারে মানুষের হৃদয় নিশ্চিন্ত থাকে, দ্বিধা-সংশয় চিরকালের জন্য বিদায় নেয়। অন্যথায় সবখানেই বিরোধ নজরে পড়বে, সন্দেহ তৈরি হবে। হিকমত লাভ হলে দীনের সব বিষয়ে সে একমত হবে আর শরীয়তের অপছন্দনীয় বিষয় তার কাছে স্বভাবগতভাবেই অপছন্দনীয় হয়ে যাবে। তবিয়ত ও স্বভাব শরীয়ত মোতাবেক হয়ে যাবে। হিকমতের বরকতে আল্লাহ তাআলা গোপন ভেদ ও রহস্য বোঝার তাওফীক দেন।

আমাদের হযরতের মাদরাসায় এক উসতাদ ছিলেন, যিনি হযরত মাদানী রহ. এর শিষ্য। তিনি দাওরায়ে হাদীস পড়েছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দে হযরত মাদানী রহ. এর কাছে। তিনি অত্যন্ত বুযুর্গ ও তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন। প্রায় বিশ বছর ধরে মুসলিম শরীফের দরস দিয়েছেন। হযরতের অনেক

প্রশংসা করতেন সব সময়। আল্লাহর কী মহিমা, দুই বছর তিনি হযরতের মাদরাসায় ছিলেন, কিন্তু হযরতের কাছে বায়আত হওয়ার সাহস করেননি। ভাবতেন, হযরতের প্রতি মহব্বত আছে, হযরতের দরসে বসি, বয়ানও শুনি, কথার উপর আমলও করি, উদ্দেশ্য তো অর্জন হচ্ছে। ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির যে সম্পর্ক পীর-মুরিদের মাঝে হয়, সেটা হয়নি। হযরতের যেদিন ইন্তেকাল হলো, সেদিন তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বহু দিন পর্যন্ত রোনাজারি করতে থাকলেন। এরপর তিনি খুঁজতে লাগলেন যে, কার হাতে বায়আত হবেন। হযরতের মতো তো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি আমাকে বায়আত করে নিন।'
অধম তার সামনে হাত জোড় করে বললাম, 'আপনি হাদীসের দরস দিয়ে থাকেন, আমাদের হযরতের খাদেম, আমি তো আপনার সামনে শিশু।'
তিনি বললেন, 'জি না, আপনার সঙ্গে মেজাজের মিল রয়েছে। তাই আপনার সাথে সম্পর্ক করতে চাচ্ছি।'
আমি কয়েকবার না করলাম। তখন তাঁর চোখে অশ্রু এসে গেল। বাধ্য হয়ে কথা শুনতে হলো।

তিনি প্রায়ই অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শোনাতেন। একদিন বললেন, 'হযরত, আপনাকে একটি চাক্ষুষ ঘটনা শোনাব?'
বললাম, 'অবশ্যই।'
বললেন– আমরা তখন দারুল উলুম দেওবন্দে ছিলাম। হাদীসের দরস সমাপ্ত হওয়ার পথে। এ সময় সৌদি আরব থেকে কয়েকজন আলেমের একটি দল এল। তারা এসে বললেন, 'আমরা সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে এসেছি। আপনাদের সাথে কিছু ইলমি বিষয়ে আলোচনা করতে আমাদের আগমন। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলে খুশি হই।'
শিক্ষা সচিব বললেন, 'কী প্রশ্ন?'
তারা বললেন, 'হাদীসে আছে– "বিনা আলাল কুবুর" তথা কবরের উপর সৌধ নির্মাণ জায়েয নেই। [অর্থাৎ কবরের উপর মানুষ যে সৌধ নির্মাণ করে তার অনুমতি নেই। কবর খোলা আকাশের নিচে হতে হবে। এ কারণেই আমাদের আকাবিরদের কবরে সৌধ নির্মাণ করা হয় না। কোথাও নির্মাণ করলেও ছাদ থাকে না। যারা কবর যিয়ারত করতে আসে, কবরের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করে, তাদের জন্য নির্মাণ করা হয়।]

আমরা জান্নাতুল বাকী কবরস্থান থেকে এমন সকল গম্বুজ ও সৌধ ভেঙ্গে ফেলেছি, তুর্কিরা যা নির্মাণ করেছিল। এখন প্রশ্ন উঠেছে– রাসূল সা. এর রওযা মুবারকের উপরও তো সবুজ গম্বুজ রয়েছে। হাদীসে যেহেতু কবরের উপর সৌধ নির্মাণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাই এটাকে কেন ভেঙ্গে ফেলা হবে না? এজন্য সরকার আমাদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে গিয়ে সেখানকার আলেমদের সাথে আলোচনা করতে বলেছে। সবাই এ ব্যাপারে একমত হলে এমনটা করা হবে, অন্যথায় নয়। এ কারণেই আমরা এখানে এসেছি।'

শিক্ষা সচিব বললেন, 'আমাদেরকে তিন দিন সময় দিন। আমরা অন্যান্য আলেমদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাব।'

তিনি আলেমদের কাছে সংবাদ পাঠানোর পর এ সংবাদ দাবানলের মতো পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ল। যেদিন আসরের পর সিদ্ধান্ত জানানোর সময় নির্ধারণ হয়েছিল, তার আগের রাতে আমরা দারুল উলুম দেওবন্দে এমন অভাবিতপূর্ব দৃশ্য দেখি, যা আগে কখনো দেখিনি। প্রায় পাঁচশ বড় বড় উলামায়ে কেরামের সম্মিলন ঘটেছিল। সবাই বিদগ্ধ আলেমে দীন ও উসতাযুল আসাতিযা ছিলেন। অনেকে পরস্পরের সাথে আলোচনা করছিলেন, অনেকে হাদীস অধ্যয়ন করছিলেন, কেউ কেউ ব্যাখ্যা গ্রন্থ দেখছিলেন, আর কেউবা নফল নামায আদায় করছিলেন, আর কেউ কেউ আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন। কী সিদ্ধান্ত দিবেন, এই ভাবনায় সারা রাত উলামায়ে কেরাম কান্নাকাটি ও পেরেশানিতে কাটিয়ে দিলেন।

পরদিন আসরের পর পাঁচশ আলেমের সভা বসল। আরব প্রতিনিধি দলের একজন দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা আপনাদের কাছে একটি ইলমি সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানতে এসেছি। তা হলো- হাদীস শরীফে এসেছে এবং বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে যে, "বিনা আলাল কুবুর" (কবরের উপর সৌধ নির্মাণ) জায়েয নেই। তো সবুজ গম্বুজের ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী?'

তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই বসে গেলেন। এরপর দীর্ঘ নীরবতা। কেউ উত্তর দিতে দাঁড়াচ্ছেন না। ছাত্ররা আশপাশে ছিল। আমরা দেখলাম, অধিকাংশ আলেমের চোখে অশ্রুবিন্দু। এটা অনেক বড় যিম্মাদারি ছিল, তাই তারা নীরবে অশ্রুপাত করছিলেন।

অনেকক্ষণ পর হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খুতবা পড়ে বললেন– 'আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল ইযযত আমার

অন্তরের দ্বিধা দূর করে দিয়েছেন। উক্ত হাদীস পুরোপুরি সহীহ, এর বর্ণনাকারীগণের ব্যাপারেও কোনো আপত্তি নেই। হাদীসের মূল অংশও সহীহ। হাদীসের কোথাও দুর্বলতা নেই। সুতরাং কবরের উপর গম্বুজ বা সৌধ নির্মাণের অবকাশ নেই।'

আরবের আলেমরা দাঁড়িয়ে বললেন, 'বুখারী শরীফের হাদীসটি সহীহ হয়ে থাকলে এখন কি তবে সবুজ গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্তই নিতে হবে?'

তিনি বললেন, 'না। এই বিষয়টিই তো আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হাদীসটি সহীহ, কিন্তু সবুজ গম্বুজও ভাঙ্গা যাবে না।'

তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী বলতে চান আপনি?'

হযরত থানবী রহ. পুনরায় জবাব দিলেন, 'হাদীসটি সহীহ, কিন্তু সবুজ গম্বুজকেও ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। কারণ এটা বিনা আলাল কুবুর (কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ) নয়। এটা হযরত আয়েশা রা. এর হুজরা ছিল। ভিত্তি আগে থেকেই ছিল, রওযা পরে হয়েছে। কবরের উপর ছাদ নির্মাণ করা হয়নি, আগে থেকেই ছাদ ছিল। যেহেতু সেখানে রাসূল সা. এর রওযা বানানো হয়েছে, তাই এখন এই সবুজ গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলার সুযোগ নেই।'

উত্তর শুনে তারা এমনি নিশ্চিন্ত হলেন যে, বলতে লাগলেন- 'আপনি একদম ঠিক বলেছেন।' এরপর তারা চলে গেলেন। আজো সবুজ গম্বুজ আপন স্থানে ভাস্বর হয়ে আছে। এই ঘটনা উলামায়ে দেওবন্দের খেদমতের এক অনন্য কীর্তি।

সুতরাং আদবের মাধ্যমে মানুষ উপকারী ইলম লাভ করে, উপকারী ইলমের মাধ্যমে আমলের তাওফীক হয়, আর আমলের মাধ্যমে মানুষ হিকমত লাভ করে।

## হিকমতের ফলাফল : দুনিয়াবিমুখতা

হিকমত প্রভূত কল্যাণের নাম। হিকমত মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয় এবং অন্তরে প্রশান্তি দান করে। মানুষ যখন তা লাভ করে, তখন তার দৃষ্টিতে দুনিয়া হীন ও তুচ্ছ হয়ে যায়। কারণ প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই, যে দুনিয়ার হীনতা ও তুচ্ছতা বুঝতে পারে। ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন- কোনো ব্যক্তি যদি এ অসিয়ত করে মারা যায় যে, আমার মীরাস যেন বুদ্ধিমানদের মাঝে

বণ্টন করা হয়, তবে তার মীরাস দুনিয়াবিমুখ ও দুনিয়াত্যাগীদের মাঝে বণ্টন করতে হবে।

## দুনিয়াবিমুখতা : বাস্তবতা

দুনিয়াবিমুখতা কাকে বলে? দুনিয়ার স্বাদ-মজা বর্জন করাকে দুনিয়াবিমুখতা বলে। অনেকে এটাকে দুনিয়া-বর্জন ভেবে বসে, ফলে দুনিয়া ত্যাগ করে বন-জঙ্গলে চলে যায় বা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। এটা প্রকৃত দুনিয়াবিমুখতা নয়। আপনি মানুষের দুনিয়ায় মানুষের মাঝে বসবাস করেই আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করুন, নরম গদিতে ঘুমান, ফুলের পালঙ্কে শয্যা গ্রহণ করুন, এরপরও আপনি আল্লাহকে পেতে পারেন। শর্ত হলো, আপনার অন্তরে দুনিয়ার লোভ না থাকতে হবে। আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত যা পাবেন তাকে আল্লাহর নেয়ামত ভেবে ব্যবহার করুন। দুনিয়ার পেছনে দৌড়াবেন না। এটাই হলো দুনিয়ার স্বাদ বর্জন করা। দুনিয়ার স্বাদ বর্জন করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আপনি দুনিয়ার সুস্বাদু খাবার বর্জন করবেন। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, শরীয়তে নিষিদ্ধ যে সকল খাবার রয়েছে তা বর্জন করা। খাবারের প্রতি অতি আসক্তির কারণে হালাল-হারাম বিচার না করে খাদ্য গ্রহণ করা কিছুতেই উচিত নয়। আমরা তো ম্যাকডোনাল্ড থেকে চিকেন খাই, হালাল-হারাম কিছুই যাচাই করি না, এটা ঠিক নয়। সুতরাং দুনিয়ার সুস্বাদু বস্তু বর্জন করার মানে হলো- যে সকল সুস্বাদু বস্তু মানুষকে শরীয়তপরিপন্থী কাজ করতে আগ্রহী করে, এমন বস্তু বর্জন করা। উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আজকের পর স্ত্রীর কাছেই যাবে না।

## একটি ঘটনা

হযরত শায়খুল হাদীস রহ. এর লিখিত একটি ঘটনা রয়েছে। এক ব্যক্তির নিজ শহর থেকে দূরে আরেকটি শহরে মামলা চলছিল। দুই শহরের মাঝে একটি নদী ছিল। মকদ্দমার তারিখে সে নদীর তীরে গিয়ে দেখল, নদীতে ভরা জোয়ার এসেছে। এ অবস্থায় অপর পারে পৌঁছা সম্ভব নয়। আবার যাওয়াটাও জরুরি। তাই সে দুআ চাইতে গেল এক বুযুর্গের কাছে। তিনি সপরিবারে সেখানে বসবাস করতেন। তাঁর কাছে দুআ চাইলে তিনি বললেন, ‘ঠিক আছে, নদীর ওপারে একজন বুযুর্গ থাকেন তার জন্য হাদিয়া দিয়ে

দিচ্ছি। এটা তার কাছে পৌঁছে দিবে। আর নদীর তীরে গিয়ে নদীকে উদ্দেশ্য করে বলবে– আমাকে এমন এক আল্লাহর বান্দা পাঠিয়েছেন, যিনি কখনো স্ত্রীমিলন করেননি। (অথচ বুযুর্গের পাঁচ-ছয়টি ছেলে-মেয়ে আশপাশে খেলাধুলা করছিল!) এ কথা বললে পথ পেয়ে যাবে।'

ঐ লোক অত্যন্ত বিস্মিত হলো, কিন্তু কিছু না বলে চলে গেল। নদীর পারে গিয়ে শিখিয়ে দেয়া কথাটি বলল। আল্লাহর কী মহিমা, নদী রাস্তা করে দিল। সে অপর পারে পৌঁছে গেল। মকদ্দমার কাজ শেষে সন্ধ্যায় অপর বুযুর্গের কাছে গেল। তাঁর হাদিয়া পেশ করল এবং তাঁকে বলল, 'আমার তো ফিরে যেতে হবে। নদী এখনো অশান্ত। দুআ করে দিন।'

তিনি বললেন, 'নদীকে গিয়ে বলবে– আমাকে এমন এক আল্লাহর বান্দা পাঠিয়েছেন, যিনি কখনো খাবার গ্রহণ করেননি।'

এ কথা শুনে লোকটির পুনরায় অবাক হওয়ার পালা। তার সামনেই তো বুযুর্গ এক প্লেট খানা সাবাড় করলেন; রুটি-গোশত কিছুই বাকি রাখেননি। অথচ বলছেন, জীবনে কখনো খানা খাননি। তবে সে নদীর পারে গিয়ে শেখানো কথাটি বলতেই নদী পথ করে দিল। তার মনে দ্বিধা রয়ে গেল যে, আসল কাহিনী কী? সে প্রথম বুযুর্গের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হযরত, আপনি এ কথা বলেছেন, আর সেই বুযুর্গ এ কথা বলেছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

হযরত তাকে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিলেন– 'শোনো, ঐ বুযুর্গ জীবনে যা খেয়েছেন আল্লাহর বিধান মনে করেই খেয়েছেন, স্বাদ লাভের জন্য খাননি। কারণ আল্লাহর বিধান–

ولنفسك عليك حق.

"তোমার উপর তোমার আত্মার হক রয়েছে।"

তিনি এ আদেশ মান্য করতেই খানা খেয়েছেন। সুতরাং তার কথার উদ্দেশ্য হলো, আপন চাহিদা অনুযায়ী খানা খাননি।

আর আমার কথাটির ব্যাখ্যা হলো- আমি যখনই স্ত্রীর কাছে গিয়েছি, সব সময় আমার নিয়ত ছিল, আমার উপর তার হক রয়েছে, আমি সেই হক আদায় করছি। কখনো প্রবৃত্তি পূরণের জন্য আমি এ কাজ করিনি। সুতরাং বিষয়টি যেন এমন– আমি কখনো স্ত্রীমিলন করিনি।'

এ ঘটনার মাধ্যমে দুনিয়াবিমুখতার আসল উদ্দেশ্য বুঝে নেয়া উচিত যে, পৃথিবীর যত জায়েয কাজ রয়েছে সব করা যাবে, শর্ত হলো- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে, প্রবৃত্তি পূরণের জন্য করা যাবে না। যেমন- অনেকে সুন্দর-পরিচ্ছন্ন-দামি পোশাক পরিধান করে লোক দেখানোর জন্য, আর অনেকে পরিধান করে আল্লাহর আদেশ মান্য করতে। আল্লাহ তাআলার বিধান–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

'হে আদম-সন্তান, তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় (বা মসজিদে যাওয়ার সময়) সাজসজ্জা করে নাও।'
(সূরা আ'রাফ : ৩১)

দুটোর মধ্যে এতটুকুই পার্থক্য।

## দুনিয়াবিমুখতার মাধ্যমে আখেরাতের ভাবনা অর্জন হয়

-সর্বপ্রথম কোন নেয়ামত লাভ করে মানুষ?
-আদব।
-আদবের পর মানুষ কী লাভ করে?
-উপকারী ইলম।

উপকারী ইলম লাভ হওয়ার পর মানুষ আমলের তাওফীক অর্জন করে। আর আমলের বরকতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে হিকমত দান করেন। হিকমতের নূর মানুষের অন্তরে দুনিয়ার হাকিকত ও বাস্তবতা তুলে ধরে। তাই মানুষের হৃদয় দুনিয়াবিমুখ হয় এবং আখেরাতমুখী হয়। সুতরাং দুনিয়াবিমুখতার মাধ্যমে মানুষ এ নেয়ামত লাভ করে যে, সে الإنابة إلى الآخرة (আখেরাতমুখিতা)-এর তাওফীকপ্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বললে–

التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود

'প্রবঞ্চক দুনিয়া থেকে অন্তর বিমুখ হয় এবং চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অন্তর আকৃষ্ট হয়।'

হযরত হাসান বসরী রহ. বলতেন– 'আমরা তাসাওউফের এ নেয়ামত অযীফার মাধ্যমে লাভ করিনি, দুনিয়াবিমুখতা ও প্রবৃত্তির বিরোধিতার মাধ্যমে লাভ করেছি।'

এ নেয়ামত যেন আমরাও লাভ করতে পারি; দুনিয়ার চাকচিক্য আমাদের অন্তরে যেন প্রভাব না ফেলে!

## আখেরাতের ফিকিরের পুরস্কার : আল্লাহর নৈকট্য

যে বান্দা আখেরাতের ফিকির ও ভাবনা লাভ করে এবং আখেরাতের প্রতি তার অন্তর আকৃষ্ট হয়, সে আখেরাতের আমল করা শুরু করে। এমন বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আখেরাতমুখী হওয়ার পুরস্কার হিসেবে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করে। আখেরাতের দিকে যার অন্তর ধাবিত হয় এবং যে সর্বক্ষণ আখেরাতের ফিকিরেই থাকে, সে তার সময় নষ্ট করতে পারে না। ইবাদত-বন্দেগি, খেদমত, দীনি শিক্ষাদান ইত্যাদি কাজে সময় ব্যয় করে। এ সকল কাজের মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.

'আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার এত নৈকট্য অর্জন করে যে, আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি।'
(সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৫০২)

এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ফরয ছেড়ে দিয়ে শুধু নফল পড়বে। বরং ফরয আদায়ের পাশাপাশি নফল ইবাদতের পাবন্দিও করবে। ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন পড়বে, তাহাজ্জুদগুযার হবে, মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে, তাহিয়্যাতুল অযু পড়বে। অন্তরে ইবাদতের স্বাদ ও নেক কাজের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে। কোনো ওজর থাকলে ভিন্ন কথা। এখন তো নওজোয়ান তালিবে ইলমদেরকে দেখি, নফল পড়া তাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়। সুযোগ পেলেই নফল পড়তে হবে। আপনার কোন স্থানের সেজদা আল্লাহর পছন্দ হয়ে যাবে, কে জানে! সুতরাং মানুষ আল্লাহর নৈকট্যশীল হয় যখন সে আখেরাতমুখিতার তাওফীক লাভ করে, ইবাদত ও নফলে লিপ্ত হয় এবং অন্যদের তুলনায় আল্লাহকে রাজি-খুশি করতে অধিক সচেষ্ট হয়।

## কিছু পাওয়ার দুই পদ্ধতি

কিছু পাওয়ার দুই রকম পদ্ধতি রয়েছে। একটা হলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি, আরেকটা হলো সম্পর্কের পদ্ধতি। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির উদাহরণ

হলো- একজন শ্রমিক কারো বাসায় কাজ করতে এল। আট ঘণ্টা কাজ করে দুইশ টাকা পারিশ্রমিক পেল।

আর সম্পর্কের পদ্ধতির উদাহরণ হলো- ঐ শ্রমিককে দিয়েই যদি উদাহরণ দিই, ধরুন, সে অনেক ভালো মানুষ এবং অনেক ভালো কাজ করে। সারাদিন কাজ করে সে বিষণ্ন মনে বসে আছে। মালিক দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো, এত উদাস ভাব কেন?'

সে বলল, 'আগামীকাল আমার বোনের উঠিয়ে নেয়ার দিন। পিতা-মাতা দরিদ্র, আমিই একমাত্র উপার্জনকারী। আমার এত সামর্থ্য নেই যে, তাকে কিছু আসবাবপত্র দিয়ে দিব। অথচ বোনকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোর সময় কিছু না কিছু প্রয়োজনীয় মালসামান তো দেয়া উচিত। এ কারণেই আমি চিন্তাক্লিষ্ট।'

তার অবস্থা জেনে মালিকের মনে দয়া হলো। মালিক তাকে বিশ হাজার টাকা দিল। সুতরাং আট ঘণ্টা কাজ করে এই দিনমজুর পারিশ্রমিক পেল দুইশ টাকা আর আট মিনিটের সম্পর্কের বিনিময়ে পেল বিশ হাজার।

## সম্পর্কের মাধ্যমে নেয়া

বান্দা যখন নফল পড়ে, তেলাওয়াত করে, এর মানে হলো সে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে অনেক কিছু পাচ্ছে। এখন তো বুঝতে পারছেন, কেন হাদীসে বলা হয়েছে, ইশরাকের নফল আদায় করলে এক হজ ও এক উমরার সওয়াব পাওয়া যায়। এক হজ ও এক উমরা করতে অনেক খরচ ও অনেক কষ্ট-সাধনার প্রয়োজন। কারণ এটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে হয়। আর নফল পড়লে এই সওয়াব হয় আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে। এই সম্পর্কের কোনো হিসাব নেই। মাওলা যা চান দিয়ে দেন।

যে বান্দা আখেরাতমুখী আমল করতে আরম্ভ করে, সে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি লাভ করে। এর একটি উদাহরণ শুনুন–

এক শ্রমিক আট ঘণ্টা কাজ করল। অন্যান্য শ্রমিকরা কাজ শেষে চলে গেছে। আধ ঘণ্টা পর আপনি দেখলেন, সে এখনো কাজ করছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখনো কী করছ?'

সে জানাল, 'ছুটির সময় হলো, সবাই চলে গেল, সিমেন্টের কিছু মিশ্রণ বাইরে রয়ে গিয়েছিল। আমি আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে ভাবলাম, বৃষ্টি হলে তো সব সিমেন্ট নষ্ট হবে, তাই উঠিয়ে ভেতরে এনে রাখছি।'

ভেবে দেখুন, তার এই ছোট্ট একটি কাজ যা সে অতিরিক্ত সময়ে করেছে, এটা আপনার হৃদয়ে তার প্রতি মহব্বত সৃষ্টির কারণ হবে না? তার কাজ সামান্য ছিল, কিন্তু এর বিনিময়ে সে আপনার অন্তরে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসবে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সে সারাদিন কাজ করেছে, আপনি তাকে অন্যদের মতোই সাধারণ শ্রমিক ভেবেছেন, পাত্তা দেননি। কিন্তু সে নিজের সময় ব্যয় করে অতিরিক্ত কাজ করার মাধ্যমে আপনার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাল। এর ফলে সে আপনার অন্তরেও স্থান নিয়ে নিল।

ঠিক এমনিভাবে ফরয তো সবাই আদায় করে, আদায় করা আবশ্যক। কিন্তু যে ব্যক্তি ফরয আদায় করে অতিরিক্ত নফল পড়বে, তেলাওয়াত করবে, দুরুদ পাঠ করবে, আল্লাহর যিকির করবে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে সে অত্যন্ত প্রিয় হবে।

## ফেরেশতাদেরকে দেখাতে...

উপরোক্ত আলোচনার প্রমাণ হাদীসে রয়েছে। হাদীসের বর্ণনায় এসেছে- একটি সৈন্যদল কোথাও যাচ্ছিল। রাতে সফর করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। প্রবল নিদ্রা চেপে ধরল সবাইকে। তাই তারা এক স্থানে যাত্রাবিরতি করে সকলে ঘুমিয়ে গেল। একজন ঘুমাল না। সে অযু করে তাহাজ্জুদ আদায় করতে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদেরকে গর্ব করে বলেন- 'আমার এই বান্দাকে দেখো, সেও ক্লান্ত ছিল, প্রবল নিদ্রায় চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল, কিন্তু সে ঘুমায়নি। আমার মহব্বত তাকে জায়নামাযে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।'

এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা আল্লাহকে এত মহব্বত করে। এমন মহব্বতকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে দেখান।

## সারকথা

আজকের আলোচনার সারকথা হলো, আদব ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে মানুষ উপকারী ইলম লাভ করে। উপকারী ইলমের মাধ্যমে সে আমলের তাওফীক

লাভ করে। আমলের বরকতে মানুষের জন্য হিকমত ও প্রজ্ঞার দুয়ার খুলে যায়। হিকমতের মাধ্যমে দুনিয়া তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায় এবং আখেরাতের দিকে তার অন্তর ধাবিত হয়। এর ফলে আখেরাতের আমল করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। নফল আমল, কুরআন তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য সব কাজ সহজ হয়ে যায়। এরপর এ সকল কাজের মাধ্যমে বান্দা আপন প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করে। সুতরাং সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই, যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নৈকট্য দান করেন।

## দুতরফা ভালোবাসা

মজার ব্যাপার হলো- যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যশীল হওয়ার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাকে নৈকট্যশীল বানিয়ে নেন। দুনিয়ার নিয়ম হলো- দুই পক্ষ থেকেই ভালোবাসা সৃষ্টি হলে তার রূপ অতি বিস্ময়কর হয়। দুজনের বুকেই সমানভাবে ভালোবাসার আগুন জ্বলে। এটা হলো দুনিয়ার মহব্বত। আল্লাহর মহব্বত ভিন্ন রকম। বান্দা আল্লাহকে যতটা ভালোবাসে, আল্লাহ সেই বান্দাকে তারচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এক হাদীসে কুদসীতে এ কথাই বলা হয়েছে–

ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي وإنا إلى لقائهم لأشد شوقا.

'জেনে রাখো, আমার সাক্ষাতের প্রতি নেককারদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে, আর নিশ্চয় তাদের সাক্ষাতের প্রতি আমি এরচেয়ে বেশি আগ্রহী!'

(জামিউল আহাদীস : নং ১১৬০)

হে আল্লাহ, আপনি কতই না মেহেরবান! আপনার রহমত কতই না প্রশস্ত! বান্দা আপনাকে যতটা ভালোবাসে, আপনি বান্দাকে তারচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়–

وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

'যে বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে প্রসারিত বাহুদ্বয় পরিমাণ অগ্রসর হই।

বান্দা যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমার রহমত তার দিকে ছুটে যায়!'
(বুখারী : নং ৭৪০৫)

আল্লাহ তাআলা এত দয়ালু যে, তিনি এমন বান্দাদেরকে আপন নৈকট্য দান করেন। এ কারণে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নেক আমল করতে হবে। চুলা যেমন আগুন জ্বেলে তৃপ্ত হয় না, সন্তানকে ভালোবেসে মায়ের মন যেমন ভরে না, তেমনি আল্লাহর আশেকদেরও আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাধনায় মন ভরে না। সে আরো বেশি চেষ্টা করে, মেহনত করে, সাধনা করে। একে তো আমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করব, দ্বিতীয়ত আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব। কারণ আমরা যেমন অসম্পূর্ণ, আমাদের আমলও অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ আমল তো আল্লাহর দরবারে পেশ করার যোগ্য নয়।

## ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এর দুআ

আরেকটি বিষয় রয়ে গেছে। তাহাজ্জুদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহাজ্জুদের সময় আপন প্রতিপালকের সামনে আঁচল পেতে দুআ করতে হবে। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহ. লেখেন– ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. জীবনে একশবার আল্লাহর দীদার (দর্শন) লাভ করেছেন। শততমবার যখন স্বপ্নে আল্লাহর দীদার লাভ করেন, তখন তিনি আরয করেন– 'হে আল্লাহ, এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যার মাধ্যমে (আপনার নৈকট্য লাভ করা যাবে এবং) কেয়ামতের দিন আপনার আযাব থেকে বাঁচা যাবে।'

[কারণ আল্লাহর নৈকট্য হলো সবচেয়ে বড় নেয়ামত ও পুরস্কার, যা আমরা এ বয়ানে আলোচনা করেছি।]

আল্লাহ তাআলা বললেন– যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল নিম্নের দুআ পাঠ করবে, সে আমার আযাব থেকে মুক্তি পাবে :

سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ

سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ

سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدِ

سُبْحَانَ رَافِعِ السَّمَاءِ بِلَا عَمَدْ

سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَمَدْ
سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَأَحْصَاهُمْ عَدَدْ
سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ أَحَدْ
سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدْ
سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ.

'পবিত্র সেই সত্তা, যিনি অবিনশ্বর।
পবিত্র সেই সত্তা, যিনি একক।
পবিত্র সেই সত্তা, যিনি একক ও অমুখাপেক্ষী।
পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আসমানকে খুঁটি ছাড়া সুউচ্চ করেছেন।
পবিত্র সেই সত্তা, যিনি জমিনকে পানির উপর বিছিয়েছেন।
পবিত্র সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টিজীবকে সৃজন করেছেন এবং তাদেরকে গণনা করেছেন।
পবিত্র সেই সত্তা, যিনি রিযিক বণ্টন করেছেন এবং কাউকে ভুলে যাননি।
পবিত্র সেই সত্তা, যাঁর কোনো স্ত্রী-সন্তান নেই।
পবিত্র সেই সত্তা, যিনি কাউকে জন্ম দেননি, যাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি, যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'
(রদ্দুল মুহতার : ১/১২৫)

আমরা নেক আমলও করব, তাহাজ্জুদে এ দুআও পাঠ করব। এরপর আঁচল পেতে আপন প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করব– হে আল্লাহ, দুনিয়ার বাদশাহরা তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু আপনার দরজা এখনো খোলা। আপনার সামনে আঁচল পেতে দিয়েছি।

تیرے در پے میں ہوں بیٹھا لئے کاسۂ گدائی
اس انتظار میں ہوں اور صبح ہونے آئی

'তব দরবারে বসে আছি ভিখারির ঝোলা নিয়ে,
অপেক্ষায় আছি ক্ষমার, প্রভাত যে এল ঘনিয়ে।'

আয় আল্লাহ, তাহাজ্জুদের পর থেকে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, কান্নাকাটি করছি, আপনার কাছেই আপনাকে চাচ্ছি, এখন তো আযানের সময় হয়ে গেছে।

رب کریم میری منت کی لاج رکھ لے
اپنے مقربوں میں شامل مجھے بھی کر لے

'দয়াময়, আমার প্রার্থনার লাজ রাখুন,
আমাকেও আপনার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন।'

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর নৈকট্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমীন।

﴿وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

وَتُوبُوٓا اِلَى اللهِ جَمِيعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(سورة النور : ٣١)

বয়ান- ৩ :

# তাওবার দর্শন

## توبہ کا فلسفہ

বয়ান : শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী হাফিযাহুল্লাহ
তারিখ : ২ নভেম্বর, ২০০৬ খ্রি.; ১৮ শাবান, ১৪২৭ হি.
স্থান : যয়নব জামে মসজিদ, মা'আদুল ফকীর আল ইসলামী, ঝাঙ্গ।
উপলক্ষ্য : দ্বাদশ বার্ষিক তরবিয়তি নকশবন্দী ইজতেমা।

## চয়নিকা

একটি হলো গুনাহ, আরেকটি হলো অবাধ্যতা বা নাফরমানি। দুটির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। গুনাহ হলো- প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কোনো অপরাধ করে ফেলা, কিন্তু নিজেকে অপরাধী ও পাপী ভাবা। আর অবাধ্যতা হলো গুনাহকে গুনাহই মনে না করা। নাফরমানি মানুষকে কুফরি পর্যন্তও পৌঁছে দিতে পারে। উদাহরণত, একটি হলো নোট ছিঁড়ে যাওয়া, আরেকটি হলো নোট ছিঁড়ে ফেলা। আপনার কাছে ছিঁড়ে যাওয়া নোট থাকলে ব্যাংকে নিয়ে যান, তারা আপনাকে এর পরিবর্তে নতুন নোট দিয়ে দিবে। কিন্তু আপনি যদি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সামনে নোটের প্রতি ক্ষোভ দেখিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলেন, তাহলে কি আপনাকে এর বদলে নতুন নোট দেয়া হবে? কখনো নয়। বরং আপনাকে দেশদ্রোহী গণ্য করা হবে।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ:

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ.

## গুনাহ কাকে বলে?

যে সৃষ্টিজীব কল্যাণের আকর, তার নাম ফেরেশতা। যে সৃষ্টিজীব মন্দের আকর, তার নাম শয়তান। আর যে মাখলুক ভালো-মন্দের সমষ্টি, তার নাম মানুষ। মানুষ প্রায় সময় পরিবেশের কারণে প্রভাবিত হয়ে বা স্বভাবের কাছে অপারগ হয়ে আল্লাহ তাআলার বিধানের নাফরমানি করে ফেলে। একে বলে গুনাহ, অবাধ্যতা, নাফরমানি। গুনাহের সংজ্ঞা হলো- 'আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ অমান্য করা বা রাসূল সা. এর সুন্নাতের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করা।'

গুনাহের কারণে মানুষ মহান আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। আর নেক কাজ করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়।

গুনাহের কারণে মানুষের জীবনে বরকতহীনতা আসে, আর নেক কাজের কারণে মানুষের জীবনে বরকত আসে।

গুনাহের কারণে মানুষ অপমানিত হয় আর নেক কাজের কারণে সম্মান লাভ করে।

## তাওবা কী?

যে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয় বা হয়েছে, সে কীভাবে তা থেকে দূরে সরবে? গুনাহমুক্ত জীবন কীভাবে আরম্ভ করবে? তাওবার মাধ্যমে করবে। তাওবা বলা হয়–

هى رجوع العبد إلى الله.

'আল্লাহর কাছে বান্দার প্রত্যাবর্তন।'

رجوع শব্দের অর্থ হলো- ফিরে আসা, মনোযোগী হওয়া, গুনাহ ছেড়ে দেয়া এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্যময় জীবনযাপন করা। একেই তাওবা বলে।

## তাওবার গুরুত্ব

তাওবা করা প্রতিটি মানুষের জন্য জরুরি।
যে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় সে তা থেকে তাওবা করবে।
যে সগীরা গুনাহে লিপ্ত হয় সে তা থেকে তাওবা করবে।
যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, কিন্তু উদাসীনতায় ডুবে থাকে, সে তার গাফলতিতে কেটে যাওয়া সময়ের তাওবা করবে।
যে বান্দার অন্তরে কুপ্রবৃত্তির চিন্তা ও শয়তানি ভাবনা আসে, সে তা থেকে তাওবা করবে।

সুতরাং তাওবার আমলটি প্রাথমিক অবস্থায় থাকা ব্যক্তি ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া ব্যক্তি, উভয়ের জন্য আবশ্যক। যে আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করেছে এবং যে আধ্যাত্মিক সাধনার শেষ পর্যায়ে আছে উভয়ের জন্য তাওবা জরুরি। ছাত্র-উসতাদ সবার জন্য তাওবা জরুরি।

## তাওবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

তাওবা সার্বক্ষণিক একটি বিষয়। এটা আজকেরও আলোচ্য বিষয়, সব সময়েরও আলোচ্য বিষয়। তাওবার মূলকথা হলো- 'কীভাবে আমি আল্লাহমুখী হব?'

মানুষের অন্তর এমন একটি নেয়ামত, যা তাকে আল্লাহমুখী করে, তাকে অনুতাপের অনুভূতি দান করে। তাই বান্দা গুনাহ করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। তার অন্তরে এ অনুভূতি সৃষ্টি হয় যে, আমার এমনটি করা উচিত হয়নি। যার অন্তরে এ অনুতাপ সৃষ্টি হয়েছে সে কীভাবে তাওবা করবে? এটি পৃথক একটি বিষয়বস্তু, অনুধাবন করার বিষয় ও জীবনের একটি অধ্যায়।

## আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার দশটি প্রতিবন্ধক

তাওবা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটি কথা জেনে রাখা উচিত যে, গুনাহের কারণে আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মাঝে কিছু প্রতিবন্ধক তৈরি হয়, যাকে 'হিজাব' বলে। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন–

الحجب العشر بين العبد وبين الله.

'বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মাঝে দশটি প্রতিবন্ধক থাকে।'

এই দশটি প্রতিবন্ধক দূর না করা পর্যন্ত আমরা আল্লাহ তাআলার দীদার-দর্শন লাভে ধন্য হব না। প্রতিবন্ধক দশটি কী কী? একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

## প্রথম প্রতিবন্ধক : আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অজ্ঞতা

সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধক হলো- الجهل بالله তথা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অজ্ঞতা। অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সত্তা সম্পর্কে বান্দার সঠিক জ্ঞান না থাকা, তার ভেতর অজ্ঞতা থাকা। আল্লাহ তাআলা যে 'তাওয়াব' তথা তাওবা কবুলকারী, এ ব্যাপারটা তার জানা না থাকা। মানুষ যত বড় গুনাহই করুক না কেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য তাওবার দরজা খোলা থাকে। সে তাওবা করলে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিবেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

> 'ওহে আমার বান্দা, আসমান-জমিনের মধ্যকার শূন্যস্থান পরিমাণ গুনাহ নিয়েও যদি তুমি আসো, আমি তোমার এত বেশি গুনাহও মাফ করে দিব। আমি এর পরোয়া করি না।'

সুতরাং মানুষ যত বেশি গুনাহই করুক না কেন, আল্লাহর রহমত বান্দার গুনাহের চেয়ে বহু গুণ বেশি। তাই আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে যত বেশি জ্ঞান অর্জিত হবে, তাঁর রহমত ও করুণার ব্যাপারে, তাঁর সহনশীলতার ব্যাপারে, তাঁর অন্যান্য গুণাবলির ব্যাপারে, মানুষ তত বেশি তাঁর সাথে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করবে। অন্যথায় একটা গুনাহ করেই ভাববে– আমি এখন মারা গেলে আমার আযাব হবে। যেমন কিছু লোক দুনিয়াতেই নিজেকে জাহান্নামি বলা আরম্ভ করে। এ অজ্ঞতার মাধ্যমে শয়তান ফায়দা লুটে। সে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়– তুমি তো জাহান্নামে যাবেই. সুতরাং বাকি জীবন সব ধরনের গুনাহ

করে নাও। এভাবে গুনাহের দুয়ার খুলে যায়। অথচ তাওবার মাধ্যমে গুনাহের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

তো বান্দার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হলো- আল্লাহ তাআলার গুণাবলি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। যেমন- এটা না জানা যে, আল্লাহ তাআলা 'সাত্তার' তথা বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপনকারী। ভেবে দেখুন, আমরা জীবনে কত গুনাহই তো করেছি, কিন্তু আমাদের পরওয়ারদেগার সে সকল গুনাহ এমন আবরণ দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন যে, কোনো মানুষ তা জানতেই পারেনি। এ কারণে আমাদের প্রতিপালক বান্দার দোষ গোপনকারী।

## সর্বজ্ঞানী ও সহনশীল সত্তা

আল্লাহ তাআলার দুটি গুণ বেশ মজার। সে দুটি গুণের উল্লেখ করেছেন তিনি একসঙ্গে-

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا

'আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞানী ও সহনশীল।'
(সূরা আহযাব : ৫১)

আলীম শব্দের উদ্দেশ্য হলো- তিনি সব জানেন, এমনকি মানুষ হৃদয়ের অভ্যন্তরে গুনাহের যে পরিকল্পনা করে তাও তিনি জানেন। এত কিছু জানার পরও তিনি এত বেশি ধৈর্যধারণ করেন যে, বান্দা গুনাহ করলেও তিনি তাকে শাস্তি না দিয়ে সুযোগ দেন। এ দুটো গুণ একত্র হওয়া অত্যন্ত বিস্ময়কর। এটা শুধু আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য। অন্যথায় মানুষের ক্ষেত্রে এটি প্রায় অকল্পনীয়। যেমন বাবা যদি জানতে পারেন যে, সন্তান তার বিরুদ্ধে কথা বলে, তাহলে এতটুকুই যথেষ্ট, তাকে ঘর থেকেই বের করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে গুনাহের পরিকল্পনা করতে দেখেন, কিন্তু বান্দার খাতা থেকে তার নাম কেটে দেন না। বান্দা গুনাহ করে, এরপরও তিনি তাকে বাদ দেন না। এভাবে সে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে বাদ দেন না। মৃত্যুর পূর্বে মুমূর্ষু অবস্থায়ও তাওবা করে নিলে আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করে নেন। আল্লাহ তাআলার এত জ্ঞান, তবুও এত সহনশীলতা। এটা শুধু তাঁরই শান, তাঁরই মাহাত্ম্য।

## হান্নান ও মান্নান-এর গুণ

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা হান্নান ও মান্নান। মান্নান বলা হয় অনুগ্রহকারীকে আর হান্নান বলা হয়- যে কোনো ব্যক্তিকে তার কাছ থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে বা রাগ করে চলে যেতে দেয় না। অনেক মানুষের স্বভাব এমন হয় যে, কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাকে মানিয়ে নেয়ার আগ পর্যন্ত তার স্বস্তি অনুভব হয় না। এটা আল্লাহ তাআলার গুণ যে, কোনো বান্দা আল্লাহর দরবার হতে পিঠ ফিরিয়ে চলে গেলে তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন না। দেখুন, শাহি মেজাজের দাবি তো এটাই যে, বান্দা আল্লাহর দরবার হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার পিঠে লাথি মেরে বলা হবে- দূর হয়ে যাও! আজকের পর এ ঘরের দরজা তোমার জন্য রুদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ অতি দয়ালু, অতি মেহেরবান। তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী বান্দার জন্য দরজা বন্ধ করেন না। তাকে পেছন থেকে লাথি দেয়ার নির্দেশ দেন না। বরং সেই বান্দাকে আদর করে ডেকে বলেন-

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾

'হে মানুষ, কোন বস্তু তোমাকে তোমার দয়াময় প্রতিপালকের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করেছে?'

(সূরা ইনফিতার : ৬)

তুমি আপন প্রতিপালকের প্রতি রুষ্ট? তবে তুমি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ।

## অজ্ঞতা দূরত্ব সৃষ্টি করে

তো সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধক হলো- আপন প্রতিপালকের গুণাবলি সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা। এ কারণে সে ভেবে বসে- আমি তো এখন বিতাড়িত। এ বিষয়টি মানুষ ও আল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। কথায় আছে-

الناس أعداء لما جهلوا.

'মানুষ যে বিষয়ে অজ্ঞ সে ব্যাপারে শত্রুতা পোষণ করে।'

কারো ব্যাপারে অজ্ঞতা তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তাঁর থেকে দূরে সরে যায়। মানুষমাত্রই ভুল করে। শুধু নবীগণ নিষ্পাপ আর আল্লাহর পরিপূর্ণ অলীরা গুনাহ থেকে নিরাপদ

থাকেন। বাকি সবাই, আমরা সবাই ভুল করি, গুনাহ করি। পার্থক্য শুধু কম-বেশির। কেউ বেশি করে, কেউ কম করে। ভুল যেহেতু হয়েই যায়, তাই আমাদের উচিত, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাওয়া। যে ব্যক্তি এটা বুঝতে পারে যে, কীভাবে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা আদায় করা যাবে, কীভাবে আল্লাহকে সরি বলতে হবে, সে আপন প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে সফলকাম হয়ে যায়। সুতরাং তাওবার মর্মার্থ হলো- বান্দা কোনো গুনাহ করে ফেললে সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

## পরিচয় ভালোবাসা সৃষ্টি করে

যে আল্লাহর পরিচয় লাভ করে, সে আল্লাহর নৈকট্যবান হয়। কথায় আছে–

من عرف الله يحبه.

'যে আল্লাহর পরিচয় লাভ করে, সে তাঁকে ভালোবাসে।'

যে ব্যক্তি আল্লাহর মারেফাত ও পরিচয় লাভ করবে, সে তাঁকে ভালো না বেসে পারবে না আর যে দুনিয়ার হাকিকত ও বাস্তবতা জানতে পারবে, সে দুনিয়াবিমুখ না হয়ে পারবে না। এটা সুস্পষ্ট কথা। আল্লাহ তাআলা তো এমন সত্তা, যে তাঁকে চিনবে, সে তাঁর নৈকট্যশীল হবে। মজার ব্যাপার হলো- কেউ যদি সৃষ্টিজীবকে ভয় করে তবে সে তার থেকে দূরে থাকে। যেমন- কেউ বাঘকে ভয় করলে দূরে থাকে, সাপকে ভয় পেলে দূরে থাকে, চোর-ডাকাতকে ভয় পেলে দূরে থাকে। আর আল্লাহর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যে যত বেশি ভয় করে সে তত বেশি নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ হলেন এমন সত্তা। তাই বান্দার করণীয় হলো :

أن يعرف عزته في قضائه

'আল্লাহ তাআলার ফয়সালাকে মর্যাদাজনক মনে করা।'

অর্থাৎ মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যে তাকদীর ও যে ফয়সালা করেন, সেটাকে নিজের জন্য সম্মানজনক মনে করতে হবে।

وبره في ستره

'আল্লাহ তাআলার গোপন করাকে নিজের জন্য কল্যাণজনক মনে করা।'

وكرمه في قبول العذر

‘নিজের ওজর-অজুহাত কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ বুঝতে শিখবে।’

وفضله في مغفرته.

‘আর আল্লাহ তাআলার মাগফিরাত ও ক্ষমা করাকে তাঁর দয়া মনে করবে।’

সুতরাং সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধক হলো আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অজ্ঞতা।

## দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক : বিদআত

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দ্বিতীয় বস্তু হলো বিদআতে লিপ্ত হওয়া। অনেক সময় মানুষ কোনো কাজকে দীনের অংশ ভেবে করে থাকে এবং বিদআতে লিপ্ত হয়। অথচ সেই কাজ তাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই আমাদের নকশবন্দী তরিকায় সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি বিদআত থেকে দূরে থাকার তাকিদও দেয়া হয়।

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.– যিনি আমাদের নকশবন্দী সিলসিলার ইমাম– তাঁর মাকতুবাতে বিদআতকে এত জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, মানুষ পড়লে বিস্মিত হয়ে যায়। কী আশ্চর্যজনক কথাই না বলেছেন তিনি! তিনি বলেন–

‘যে জাতি কোনো বিদআতে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তাআলা তার বিপরীতে ঐ জাতি থেকে একটি সুন্নাতকে সব সময়ের জন্য উঠিয়ে নেন।’

সেই জাতি চিরদিনের জন্য ঐ সুন্নাত থেকে মাহরুম হয়।

হাদীস শরীফে আছে :

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ

‘যে ব্যক্তি কোনো বিদআতীকে সম্মান করল, সে ইসলাম ধর্ম ধ্বংস করতে সাহায্য করল।’

(শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী : নং ৯০১৮)

সুতরাং বিদআত থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। আরেক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে—

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ

'যে আমাদের দীনের মধ্যে এমন কোনো নতুন বস্তু সংযোজন (উদ্ভাবন) করবে, যা তার মাঝে ছিল না, তবে তা পরিত্যাজ্য।' (সহীহ বুখারী : নং ২৬৯৭)

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছার সকল পথ বন্ধ হয়ে গেছে, একটি ছাড়া– রাসূল সা. যে পথে চলে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। একমাত্র এ পথে চলেই মানুষ আল্লাহকে পেতে পারে। এছাড়া সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাই মানুষকে বিদআত থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

শয়তান এত বদমাশ যে, সে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়– 'সমস্যা কী?' যেমন- মানুষ কোনো নতুন কাজ করল। তাকে বাধা দেয়া হলে সে বলে– সমস্যা কী? এটি অত্যন্ত মারাত্মক বাক্য। সমস্যা হলো- যে কাজ রাসূল সা. করেননি, সাহাবায়ে কেরাম করেননি, বুযুর্গরা করেননি, আজ যদি আমরা তাকে দীন মনে করে করি, তাহলে আমরা যেন দাবি করছি– সেই মহান ব্যক্তিবর্গ এই নেক কাজ থেকে বঞ্চিত থেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কত মারাত্মক ব্যাপার!

## বিদআত কীভাবে শুরু হয়?

বিদআত শুরুতে সামান্য থাকে, ধীরে ধীরে বড় হয়। এরপর কাজটি তার আসল রূপ পরিবর্তন করে ভিন্ন রূপ ধারণ করে । যে এ কাজ করে সে ভাবে, এটা তো অনেক সওয়াবের কাজ। কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন তারা বিদআতকে চিনতে পারেন এবং মানুষকে তা থেকে বাধা দেন।

এবার বিদআতের একটি উদাহরণ শুনুন। জাহেলি যুগে দুজন নারী-পুরুষ ছিল। পুরুষটির নাম মাসা ও মহিলার নাম নায়েলা। দুজনের মধ্যে অবৈধ প্রণয় ছিল। একদিন দুজন তাওয়াফ করতে এসে আল্লাহর ঘরের ভেতরে যৌন মিলনে লিপ্ত হলো। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে পাথর বানিয়ে দিলেন। মক্কাবাসী তাদের দুজনকে এ অবস্থায় দেখে কাহিনী বুঝতে পারল এবং তারাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। কারণ একে তো আল্লাহর নাফরমানি, তার উপর বাইতুল্লাহর ভেতর। তাই তারা পরামর্শ করতে বসল যে, এ দুজনকে কী শাস্তি দেয়া যায়। সবাই একমত হলো যে, দৃষ্টান্তমূলক

শাস্তি দিতে হবে। বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম শাস্তির কথা বলল। একজন পরামর্শ দিল, 'হজের আমল তো কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আমরা এ দুজনের একজনকে সাফায় রেখে দিব, আরেকজনকে মারওয়ায় রেখে দিব। হজ পালনকারীরা সাঈ করার সময় দুজনকে জুতা মারবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত তারা লাঞ্ছিত-অপদস্থ হতে থাকবে।'

দেখুন, তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অনেক ভালো একটি শাস্তির উপায় বের করেছিল, কিন্তু একটি কথা ভুলে গিয়েছিল যে, তারা শরীয়তের একটি বিধানে নতুন বিষয় সংযোজন করছে। এটা তো সাঈর অংশ ছিল না, তারা সংযোজন করে নিয়েছিল। ফলাফল এই হলো যে, পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম এভাবে দুজনকে জুতা মারল। যাদের পায়ে জুতা থাকত না, তারা দুজনকে থাপ্পড় দিত। এদের সন্তানেরা পরস্পর বলাবলি করল– আসল আমল হলো, দুজনের গায়ে হাতের স্পর্শ করা। তারা এ দুজনের গায়ে করস্পর্শ না করা পর্যন্ত সাফা-মারওয়ার সাঈকে পরিপূর্ণ মনে করত না। পরবর্তী প্রজন্ম ধারণা করল– এরা নিশ্চয় বুযুর্গ ছিল, সবাই বরকতের জন্য এখানে স্পর্শ করে। তাই তারা বরকত লাভের আশায় দুজনের গায়ে হাত লাগাত। দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী কিছু লোক এক ধাপ এগিয়ে তাদের গায়ে চুমু খাওয়া আরম্ভ করল। অনেকে সেখানে দুআও করত। এমনকি রাসূল সা. এর শুভাগমনের সময় মক্কার মুশরিকরা সাফা-মারওয়ায় তাদেরকে সেজদা করত। ভেবে দেখুন, এ বিদআত কোথা থেকে শুরু হয়েছে এবং তার পরিণতি কী ভয়ানক হয়েছে!

এটাই চিরায়ত নিয়ম যে, বিদআত এভাবে শুরু হয়। যেমন কেউ বলল– 'আযানের আগে দুরুদ শরীফ পাঠ করতে হয়।' আপনি দুরুদ শরীফ পাঠ করতে চাইলে করুন না, একশবার করুন, মনে মনে করুন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আযানের পূর্বে দুরুদ শরীফ পাঠ করাকে আবশ্যক মনে করা বা এত উচ্চ স্বরে পাঠ করা যে, আশপাশের সবাই সচকিত হয়ে ওঠে অথবা এমন নিয়ম বানানো যে, কারেন্ট থাকলে দুরুদ পাঠ করা, কারেন্ট না থাকলে শুধু আযান দেয়া, এ সব তো আযানের মধ্যে নতুন সংযোজন হয়ে গেল। আজ হয়তো আমরা এ সব দেখছি না বা আমরা ভাবছি না, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম ঠিকই একে আযানের অংশ মনে করবে। বিদআত দীনের নামে

হওয়ায় তা থেকে দ্রুত তাওবা করার তাওফীক হয় না। এটা অনেক বড় প্রতিবন্ধক।

আমাদের কর্তব্য– আমরা আমাদের প্রতিটি আমল রাসূল সা. এর সুন্নাত মোতাবেক করব। বিন্দু পরিমাণও এদিক-সেদিক করব না। বেশিও করব না, কমও করব না। আমরা মহানবী সা. এর অনুসারী। তাই যেভাবে তিনি আমল করে গেছেন, ঠিক সেভাবেই আমরা আমল করব।

## আমল কবুল হওয়ার দুটি শর্ত

আল্লাহ তাআলার কাছে আমল কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে–
ক. ইখলাস
খ. সুন্নাত মোতাবেক হওয়া।

প্রথম শর্ত হলো- কোনো সৎ কাজ করলে ইখলাস ও একনিষ্ঠতার সাথে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা। তাতে রিয়া ও লৌকিকতা না থাকা, কারো কাছে বাহবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না থাকা। যে কোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য ইখলাস থাকা অত্যন্ত জরুরি।

দ্বিতীয় শর্ত- যে কাজ করবে তা সুন্নাত মোতাবেক হওয়া। ইখলাসের সাথে বিদআত করলেও তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আমাদের উচিত– নেক আমল করে আপন প্রতিপালকের নৈকট্যভাজন হব। তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করব। ইরশাদ হচ্ছে :

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

‘পবিত্র কথা তাঁর দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁর কাছে উঁচু করা হয়।’
(সূরা ফাতির : ১০)

বিদআত যেহেতু সৎকর্ম নয়, বরং মন্দ কর্ম, তাই তা না উপরে উঠানো হয়, আর না আল্লাহর কাছে কবুল হয়। সুতরাং বিদআত থেকে মানুষের বেঁচে থাকতে হবে।

## সুন্নাত ও বিদআতের মাঝে পার্থক্য

সুন্নাত ও বিদআতের মাঝে একটি পার্থক্য হলো- সুন্নাত সার্বজনীন হয়ে থাকে। ইংরেজিতে যাকে ইউনিভার্সাল (Universal) বলে। দুনিয়ার

যেখানেই যান না কেন, সুন্নাত পাবেন। এর বিপরীতে বিদআত এলাকাকেন্দ্রীক হয়। একেক এলাকার একেক রকম বিদআত হয়। এ পার্থক্যের মাধ্যমে মানুষ সহজেই সুন্নাত ও বিদআতের মাঝে তফাত করতে পারবে।

## তৃতীয় প্রতিবন্ধক : অভ্যন্তরীণ রোগ

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে তৃতীয় প্রতিবন্ধক হলো الكبائر الباطنة। তথা এমন কবীরা (বড়) গুনাহ, যা বাতেনী ও অভ্যন্তরীণ। যেমন- হিংসা, অহঙ্কার, রিয়া- লৌকিকতা, অহমিকা। এ সবই বাতেনী রোগ। এগুলো মানুষের অভ্যন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তাআলার খুবই অপছন্দ। অহঙ্কার এত মারাত্মক যে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

'জান্নাতে ঐ বান্দা প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে।'

(সহীহ মুসলিম : হাদীস ১৪৭)

কী ভয়ঙ্কর কথা! বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার থাকলেও জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। বরং অনেকের মতে–

أعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة.

'ব্যভিচার, মদপান ও চুরি থেকেও বড় গুনাহ হলো অহঙ্কার।'

অথচ আমরা প্রায়ই অহঙ্কারে লিপ্ত হই। অহঙ্কারমূলক কথাবার্তা বলে ফেলি। সব সময় মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের যে পথ রয়েছে, তা কদমের মাধ্যমে অতিক্রম করা যায় না, অন্তরের মাধ্যমে অতিক্রম করতে হয়। মানুষের হৃদয় এ পথ অতিক্রম করে। অন্তরেই যদি ব্যাধি থাকে, তবে তার ব্রেক ফেল করে, আর চলতে পারে না, অগ্রসর হতে পারে না। যেমনিভাবে পেট্রোলে আবর্জনা পড়লে গাড়ি থেমে যায়, তেমনি যে বান্দার অন্তরে অহঙ্কারের আবর্জনা তৈরি হবে তার গাড়িও থেমে যাবে, আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারবে না। তাই এ সকল বাতেনী গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

## চতুর্থ প্রতিবন্ধক : কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে চতুর্থ প্রতিবন্ধক হলো-

حجاب أهل الكبائر الظاهرة

তথা বাহ্যিকভাবে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া। যেমন- চুরি করা, মদপান করা, সুদ খাওয়া, ব্যভিচার করা, গীবত করা ইত্যাদি হলো প্রকাশ্য কবীরা গুনাহ।

একটি হলো গুনাহ, আরেকটি হলো নাফরমানি বা অবাধ্যতা । দুটির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। গুনাহ হলো- প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কোনো অপরাধ করে ফেলা, কিন্তু নিজেকে অপরাধী ও পাপী ভাবা। আর নাফরমানি হলো গুনাহকে গুনাহই মনে না করা। নাফরমানি মানুষকে কুফরি পর্যন্তও পৌঁছে দিতে পারে। উদাহরণত, একটি হলো নোট ছিঁড়ে যাওয়া, আরেকটি হলো নোট ছিঁড়ে ফেলা। আপনার কাছে ছিঁড়ে যাওয়া নোট থাকলে ব্যাংকে নিয়ে যান, তারা আপনাকে এর পরিবর্তে নতুন নোট দিয়ে দিবে। কিন্তু আপনি যদি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সামনে নোটের প্রতি ক্ষোভ দেখিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলেন, তাহলে কি আপনাকে এর বদলে নতুন নোট দেয়া হবে? কখনো নয়। বরং আপনাকে রাষ্ট্রদ্রোহী গণ্য করা হবে। সুতরাং গুনাহগারের জন্য ফিরে আসার পথ সহজ, কিন্তু নাফরমানের জন্য ফিরে আসার রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়। তাই বান্দা যদি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কোনো গুনাহ করে ফেলে, তবে মনে মনে অনুতপ্ত হবে এবং আল্লাহকে বলবে– আমি ভুল করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিন!

## পঞ্চম প্রতিবন্ধক : সগীরা গুনাহ

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে পঞ্চম প্রতিবন্ধক হলো-

حجاب أهل الصغائر

তথা সগীরা (ছোট) গুনাহ করা। তালিবে ইলমরা এ কথা ভেবে হয়তো অবাক হবে যে, সগীরা গুনাহ তো প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কিন্তু আমাদের বুযুর্গরা একেও প্রতিবন্ধক আখ্যা দিয়ে বলেছেন, কয়েকটি বিষয়ের কারণে সগীরা গুনাহও কবীরা হয়ে যায়।

# সগীরা গুনাহ্ কীভাবে কবীরা হয়?

ছয়টি বিষয় এমন রয়েছে, যার কারণে সগীরা গুনাহ কবীরা গুনাহে পরিণত হয় :

## ১. বারবার একই গুনাহ করা

প্রথম বিষয় হলো– لا صغيرة بالإصرار

অর্থাৎ যখন একটা সগীরা গুনাহকে বারবার করা হয়, তখন তা আর সগীরা থাকে না, কবীরা হয়ে যায়।

## ২. গুনাহকে ক্ষুদ্র মনে করা

দ্বিতীয় বিষয় হলো– استصغار الذنب

তথা কোনো গুনাহকে সামান্য মনে করা, ছোট মনে করা। গুনাহকে ছোট মনে করলে তা আর ছোট থাকে না, বড় হয়ে যায়। তাই কোনো গুনাহকেই ছোট বা সামান্য মনে করা যাবে না।

لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصاء.

'তুমি সগীরা গুনাহকে ক্ষুদ্র মনে কোরো না। কারণ বড় বড় পাহাড় ছোট ছোট পাথর দিয়েই তৈরি হয়।'

বনী ইসরাঈলের এক বুযুর্গের একটি ঘটনা আছে। তিনি একবার নিজ গ্রাম থেকে বের হয়ে একটু দূরে গেলেন। অনতিদূরে একটা পাহাড়সারি তার নজরে পড়ল। সেখানে সবুজের কোনো চিহ্নও ছিল না। তখন তার মনে ভাবনা এল– হে আল্লাহ, এখানে যদি সবুজ-শ্যামল গাছপালা থাকত, ঝরনা-জলপ্রপাত থাকত, বসন্তের ছাপ থাকত, তাহলে কতই না ভালো হত!
(মনে রাখতে হবে, যারা বড় ও নৈকট্যশীল, তাদেরকে ছোট ছোট কথা ও বিষয়ের কারণেও পাকড়াও করা হয়)

তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অন্তরে ইলহাম (বার্তা) হলো– 'ওহে আমার বান্দা, তুমি ইবাদত ছেড়ে দিয়ে আমার উপদেষ্টা হয়ে গেছ! আমাকে পরামর্শ দিচ্ছ! আমার সৃষ্টিতে তুমি দোষ-ত্রুটি দেখছ!'

এ বার্তা পেয়ে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। প্রতিকার হিসেবে তিনি নিজেকে শাস্তি দেয়ার নিয়ত

করলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, 'যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে মাফ করে দেয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জানতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত খানা খাব না।'

নিজের আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য মানুষ এভাবে কোনো কিছুকে আবশ্যক করে নিতে পারে। আল্লাহর কী মহিমা, ঐ বুযুর্গ এক গ্রামে গেলেন। সেখানে একটা অনুষ্ঠান ছিল। খানা রান্না করা হয়েছিল। তারা বুযুর্গকে খানা খেতে বলল। তিনি বললেন,

-না, খাব না।

-কেন খাবেন না?

-আমি এমন একটা ভুল করে ফেলেছি তাই।

-এ আবার কেমন কথা! ঠিক আছে, এই ভুলের সাজা আমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিব। আপনি খানা খেয়ে নিন।

গ্রামবাসী এ কথা বলার পরেই আল্লাহ তাআলা বুযুর্গের অন্তরে বার্তা প্রেরণ করলেন যে, 'তুমি এখনি এই গ্রাম থেকে বের হয়ে যাও। আমি এই জনপদকে আযাব দিব। কারণ তারা আমার আযাবকে তুচ্ছ মনে করে বলেছে— এই ভুলের সাজা আমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিব।'

এ কথার কারণে গ্রামবাসীরা আযাবের সম্মুখীন হলো। তাদেরকে জমিনের নিচে ধসিয়ে দেয়া হলো। কারণ ছিল- আল্লাহর আযাবকে তুচ্ছ মনে করা। এর ফলে আল্লাহ রাগান্বিত হয়েছিলেন।

তো গুনাহকে ক্ষুদ্র মনে করা যে, এটা কোনো ব্যাপারই না, অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যেমন অনেকে মিথ্যা বলে আবার নির্লজ্জের মতো বলে- 'মিথ্যা না বললে তো কাজ চলে না।'

এরা গুনাহকে মামুলি মনে করে। এমন আরো কিছু গুনাহ রয়েছে। অনেকে নজরের হেফাযত করছে না, অনেকে জবানের হেফাযত করছে না। ধূমপায়ীকে যদি বলা হয়, 'ভাই, ধূমপান ভালো নয়।' তখন সে বলে, 'আরে ভাই, আমি সিগারেট খাচ্ছি, হেরোইন তো খাচ্ছি না!'

সে ধূমপানকে ছোট মনে করছে। এভাবে গুনাহকে সামান্য মনে করলে গুনাহ বড় হয়ে যায়।

### ৩. পাপকে উপভোগ করা

তৃতীয় যে বিষয়ের কারণে সগীরা গুনাহ কবীরা হয়ে যায় তা হলো-

السرور بالذنب গুনাহের কাজকে উপভোগ করা। গুনাহ করার পর বলা– গুনাহ করে অনেক মজা পেলাম! এমন কথা বললে যে গুনাহই হোক না কেন, তা আর ছোট থাকবে না, আল্লাহ তাআলার কাছে বড় হয়ে যাবে।

## ৪. গুনাহ গোপন রাখার কারণে স্পর্ধা দেখানো

চতুর্থ বিষয় হলো– أن يتهاون بستر الله
অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তো বান্দার গুনাহ গোপন রাখেন, এর ফলে বান্দা আরো বেশি গুনাহ করার স্পর্ধা দেখায়। সে ভাবে– আমি কী করি তা তো কেউ জানতেই পারে না, সুতরাং...! এই যে তার ভেতর স্পর্ধার মনোভাব তৈরি হলো, এটাই গুনাহকে বড় বানিয়ে দেয়।

## ৫. প্রকাশ্যে গুনাহ করা

পঞ্চম বিষয় হলো- المجاهرة তথা প্রকাশ্যে গুনাহ করা, অথবা গুনাহ করে লোকদের সামনে তা আলোচনা করা। বর্তমান যুগে যুবকরা একে অপরকে নিজেদের গুনাহের ফিরিস্তি শোনায় যে, আমি অমুক গুনাহ এভাবে করেছি, এভাবে কু-দৃষ্টি করেছি, এভাবে চুরি করেছি...। রাসূল সা. কী বলেছেন দেখুন–

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ

'আমার সকল উম্মতকে মাফ করে দেয়া হবে, তবে যারা প্রকাশ্যে গুনাহ করে তাদেরকে মাফ করা হবে না।'
(সহীহ বুখারী : নং ৬০৬৯)

তাই এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

## ৬. অনুসরণীয়দের গুনাহ

সর্বশেষ বিষয় হলো-

أن يكون رأس يقتدا به كان عليه مثلها ومضر من عمل بها

অর্থাৎ যারা অনুসরণীয়, মানুষ যাদেরকে অনুসরণ করে, যেমন- ইমাম, খতীব, উসতাদ, কারী, সুফী, বুযুর্গ. তিনি যদি গুনাহ করেন এবং গুনাহকে

মামুলি মনে করেন তবে তার উপর নিজের গুনাহের বোঝাও হবে এবং তাকে দেখে যারা এ কাজ করবে তাদের গুনাহের বোঝাও তার উপর হবে।

বাবা যদি ঘরে টিভি আনেন, তবে স্ত্রী-সন্তান টিভি দেখলে তারা তো জাহান্নামের পথে যাবেই, তাদের সবার গুনাহের বোঝা বাবার মাথায় চাপানো হবে। এখন বাবা যদি মসজিদে নামায পড়েন, ওদিকে স্ত্রী-সন্তান ঘরে টিভি দেখছে, তবে তার ঘাড়েও গুনাহের বোঝা এসে পড়বে। কারণ টিভি ঘরে এনেছেন তিনি।

## ষষ্ঠ প্রতিবন্ধক : শিরক

আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মাঝে বড় একটি প্রতিবন্ধক হলো-

حجاب الشرك শিরকের প্রতিবন্ধক। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বলেন, 'শিরক দুই ধরনের হয়ে থাকে। শিরকে জালী ও শিরকে খফী। শিরকে জালী হলো- মূর্তিপূজা করা, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা। আর শিরকে খফী হলো- কারো প্রতি এমন প্রবৃত্তিমূলক শয়তানি মহব্বত থাকা, যার ফলে আল্লাহর বিধান অমান্য করে তার অনুসরণ করা হয়। কুরআনে এ বিষয়টির অবতারণা হয়েছে এভাবে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ

'অনেক মানুষ রয়েছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদেরকে তেমনি ভালোবাসে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে।'
(সূরা বাকারা : ১৬৫)

এই যে মানুষ অনেককে বলে থাকে- 'প্রিয়, তুমি আমার দীন-ঈমান সব!' এটা স্পষ্ট শিরক। যে অন্তর আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালোবাসার জন্য দান করেছেন, তাকে সৃষ্টিজীবের শয়তানি মহব্বতে ভরপুর করা কতই না নিকৃষ্ট! মানুষ যতক্ষণ না শিরকে জালী ও শিরকে খফী থেকে প্রকৃত তাওবা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহকে পাবে না।

মানুষ অনেক সময় নিজের আত্মাকেই নিজের উপাস্য বানিয়ে নেয়। যেমন কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰىهُ

'আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে আপন কু-প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে?'

(সূরা জাসিয়া : ২৩)

সুতরাং অন্তরপূজা, প্রবৃত্তিপূজা, সম্পদপূজা, নারীপূজা এ সবই মূর্তিপূজার প্রকারভেদ। আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য মানা ভিন্ন জিনিস।

## সপ্তম প্রতিবন্ধক : সম্পদশালীদের বিলাসিতা

সপ্তম প্রতিবন্ধক হলো-

حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات

অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক ধন-সম্পদ দিয়েছেন, বহু রিযিক দিয়েছেন, তারা যদি বিলাসিতা করে ও উপভোগ করে, তবে এটাও একটা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। যেমন- ধনীরা সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীকে নিয়ে গাড়িতে বসে। এরপর শপিং করতে শপিং মলে যায় এবং খানা খায় কোনো কর্নার বা ফাস্ট ফুডে। এখন রাতের খানা বাসার বাইরে গাড়িতে বা হোটেলে খেতে ভালো লাগে তাদের। এই বিলাসিতাও বান্দা ও আল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তারা এভাবে বাসার বাইরে বিলাসিতা করে রাত কাটিয়ে দেয়। আমি শুনেছি, এমন লোকেরা রমযানুল মুবারকের রাতও পথে কাটিয়ে দেয়। আপনারাই বলুন, তাদের বিলাসিতা প্রতিবন্ধক হলো কি না?

ভাইয়েরা, ঘরের বাইরের কোনো হালাল খাবার আপনার খেতে ইচ্ছে করলে তা অর্ডার দিয়ে এনে ঘরে বসে খান। শহুরে লোকদের এই যে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে– রাতের খানা বাইরে গিয়ে খায়, এটা খুবই বাজে অভ্যাস। রাসূল সা. এর জীবনে কোথাও পাওয়া যায়নি যে, তিনি সম্মানিতা স্ত্রীদেরকে বলেছেন– 'চলো, আজ আমরা মদীনার বাইরে গিয়ে খানা খাব।' এটা কাফেরদের রীতি। বর্তমানে সম্পদের জোরে কাফেরদের অনুসারীদেরও এই অভ্যাস হয়ে গেছে। কিছু লোক তো এমন আছে, যারা বছরের পর বছর ঘরের বাইরে ডিনার করে। ব্রিগেডিয়ার তনয় এক যুবকের সাথে আমার

সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে বলেছিল– 'আমার মনে পড়ে না, গত পাঁচ বছর আমি রাতের খাবার ঘরে খেয়েছি কি না!'
এভাবে বিলাসিতা, শৌখিনতা ও অপচয়ের মাঝে জীবনযাপন করা, বান্দা ও আল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

## অষ্টম প্রতিবন্ধক : উদাসীনতা

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে অষ্টম প্রতিবন্ধক হলো–

حجاب أهل الغفلة عن الله তথা আল্লাহর প্রতি উদাসীনতা।

উদাসীন ও গাফেল ব্যক্তিরা উদাসীনতায় বুঁদ হয়ে থাকে। খোদার কথা তাদের মনেই পড়ে না। দুনিয়াবি কাজে ও টাকা-পয়সা উপার্জনে ব্যস্ত থাকে। আল্লাহকে স্মরণ করার ও ইবাদত করার সময়-সুযোগ থাকে না তাদের কাছে। আপনি যদি তাদেরকে বলেন, 'ভাই, রায়বেন্ডের ইজতিমা হবে। তিন দিনের জন্য চলুন না!'
উত্তর দিবে, 'না ভাই, আমার এত এত কাজ রয়েছে, একদম সুযোগ নেই!'
কয়েক দিন পর এই লোকই এসে বলবে, 'হযরত, একটু দুআ করুন। নতুন একটা কারখানা করব তো...! আল্লাহ তাআলা যেন সহজে সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেন।'
আরেকটি কারখানা করার সময় কোথা থেকে হলো? বোঝা গেল, দুনিয়ার জন্য সময়ের অভাব নেই, অথচ দীনের জন্য এক মুহূর্ত সময় নেই। এরাই হলো উদাসীন ও গাফেল।

## নবম প্রতিবন্ধক : রসম-রেওয়াজ

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে নবম প্রতিবন্ধক হলো–

حجاب العادات والرسوم তথা বিভিন্ন ধরনের রসম-রেওয়াজ ও রীতি-নীতি।

সমাজে কত ধরনের রসম প্রচলিত থাকে, এ সবও প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। বিয়ে-শাদিতে তো মহিলারা মুফতীয়ে আযম হয়ে যায়। নতুন নতুন রীতি-নীতি উদ্ভাবন করে। এ সব বস্তু মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। বিয়েতে সবাইকে সন্তুষ্ট রাখা হয়, শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. কে অসন্তুষ্ট

করা হয়। ভেবে দেখুন, এটা কত বড় প্রতিবন্ধক! মানুষ দুনিয়াবি রসম-রেওয়াজে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়।

## দশম প্রতিবন্ধক : স্বনির্ভরতা

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে দশম প্রতিবন্ধক হলো–

حجاب اعتماد بالنفس তথা নিজের প্রতি নির্ভরতা। এর মর্মার্থ হলো- নিজের নফসের প্রতি এত বেশি নির্ভরতা হওয়া যে, সে ভাবে– 'আমি যা পড়ব ও বুঝব তার উপরই আমল করব।' সে কাউকে নিজের চেয়ে বড় মনে করে না, কাউকে অনুসরণ করা পছন্দ করে না। তাকলীদ ও মাযহাব মানাকে সে খারাপ চোখে দেখে। সে বলে– 'শুধু কুরআন-হাদীস পড়ো এবং তার অনুসরণ করো।'

আমাদের অভিজ্ঞতা হলো- দুনিয়ার প্রতিটি মানুষই তাকলীদ করে। কেউ চার ইমামের অনুসরণ করে, কেউ বা মসজিদের ইমাম সাহেবের অনুসরণ করে। যারা বলে আমরা তাকলীদ করি না, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন তো, 'আপনি কার কাছে পড়েছেন? এ মাসআলা কার কাছে শুনেছেন?'
সে বলবে, 'অমুক আলেমের কাছে।'

তো এই আলেমের তাকলীদ জায়েয হলে চার ইমামের তাকলীদ কেন জায়েয হবে না? অথচ তারা এমন ব্যক্তি ছিলেন, যাঁদের তাকওয়া ও ইলমি যোগ্যতার ব্যাপারে পুরো উম্মতের আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। এটা সামান্য ব্যাপার নয়। বর্তমান যুগে মাযহাব অস্বীকারের জীবাণু অনেক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেক মানুষের অন্তর চায়, সে তার মনমতো কাজ করবে। সে সবার কথা শোনে এবং নিজেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। ভাবখানা এমন যে, সবাই শায়খ আর সে শায়খুল মাশায়েখ। কলেজ-ইউনিভার্সিটি পড়ুয়াদের মন-মেজাজ এমন হয়ে যাচ্ছে, বরং এমন বানানো হচ্ছে। এটা অনেক বড় প্রতিবন্ধক। এ বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিত বলব, যাতে এর ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়।

## যে কাউকে মানে না

অধম একবার নিউ ইয়র্কে বয়ান করি। বয়ানে স্থানীয় এক ব্যক্তি ছিল। সে এসে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। সে আমাকে বলল, 'আমার একটি নতুন নাম রেখে দিন।'

আমি তাকে কয়েকজন নবী ও সাহাবীর নাম বললাম, তার কোনোটা পছন্দ হচ্ছিল না। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল,

-আপনার ছেলে আছে?

-হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ আমার দুই ছেলে আছে।

-তাদের নাম কী?

-হাবীবুল্লাহ ও সাইফুল্লাহ।

-হাবীবুল্লাহর অর্থ কী?

-আল্লাহর বন্ধু (ফ্রেন্ড অফ আল্লাহ)

- এই নাম আমার পছন্দ হয়েছে।

তার হৃদয়ে ঈমানের নূর ছিল। তার নাম হাবীবুল্লাহ রাখা হলো। এরপর আমি তাকে ইসলামের চার রুকন সম্পর্কে বললাম যে, 'ভাই, এগুলো হলো দীনের বুনিয়াদ ও স্তম্ভ।' তারপর বললাম, 'ভাই, এখন তো অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনি আগামীকাল এশার সময় আমার কাছে আসবেন। তখন আমি দীনের জরুরি বিষয়গুলোর ব্যাপারে মৌলিক কিছু আলোচনা করব। পবিত্রতা, অযু, নামায প্রভৃতি দীনের যে সকল বুনিয়াদি বিষয় রয়েছে তা বলব।'

পরদিন সে এল। সে কিছু একটা বগলদাবা করে রেখেছে। বসে বসে কথা শুনছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হাবীবুল্লাহ, এটা কী?'

সে বলল, 'বুখারী, বুখারী।'

আমি প্রথমে বুঝিনি। তাই সে দেখাল। ওটা বুখারী শরীফের ইংরেজি অনুবাদ ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা তোমার হাতে কী করে এল?'

বলল, 'গতকাল যখন মজলিস সমাপ্ত হলো তখন আমাদের এক আরব ভাই (যিনি মসজিদে ছিলেন) আমার কাছে এসে বললেন– আপনাকে মুবারকবাদ যে, আপনি মুসলমান হয়েছেন। আপনাকে একটা কথা বলি। কাউকে অনুসরণের প্রয়োজন নেই। এই কিতাবটি পড়ে তার উপর আমল করবেন। এভাবে আপনি দীনের উপর সঠিকভাবে চলতে পারবেন।'

ভেবে দেখুন, যে ব্যক্তি আজই মাত্র কালিমা পড়েছে, যে দীনের কিছুই জানে না, সে কি বুখারী শরীফ পড়ে বুঝে তার উপর আমল করার যোগ্যতা রাখে? যে বুখারী শরীফ পড়ে বোঝার জন্য আমাদের মাদরাসাসমূহে সাত-আট বছর (কোথাও আরো বেশি) বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদান করা হয়, এরপর

বুখারী শরীফ পড়ানো হয়। বুখারী শরীফ পড়তে ও বুঝতেও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। একাধিক বিরোধপূর্ণ হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন ও প্রশ্ন-আপত্তির উত্তর বের করতে হয় ইত্যাদি। এমন একটি কিতাবকে একদম নওমুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির হাতে দিয়ে যদি বলে, এই কিতাব অনুযায়ী আমল করলেই যথেষ্ট, তবে সে পথভ্রষ্ট হবে না তো কী হবে?

## ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শ্রেষ্ঠত্ব

এ সকল লোক ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এর নাম শুনে খেপে যায়। আজিব ব্যাপার হলো- ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর নাম শুনলে এত খেপে না, অথচ তারাও ইমাম। আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু হানীফা রহ. কে এত উঁচু মাকাম দান করেছেন যে, তিন ইমামই তাঁর শাগরেদ, হয় সরাসরি, নয়তো কারো মাধ্যমে। কারণ ইমাম মালেক রহ. উসুলে ফিক্‌হ যেটা গ্রহণ করেছেন, তা মূলত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর। অন্য ইমামরা তাঁর শাগরেদের শাগরেদ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দীনের যে জ্ঞান দান করেছিলেন, তা আজ কারো মাঝে পাওয়া যাওয়া সম্ভবই নয়। আল্লাহ তাঁকে এত বেশি দীনি ইলম দান করেছিলেন।

## ফিকহ বোর্ড

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কাছে প্রায় চল্লিশজন বড় বড় আলেম ও ফকীহ ছিলেন; যারা তাঁর শিষ্য। কেউ আরবি ভাষায় বিজ্ঞ ছিলেন, কেউ কুরআনের, কেউ হাদীসের, কেউ বা যিকির ও সুলুকের পণ্ডিত ছিলেন, কেউ কেউ কিয়াসের বাদশাহ ছিলেন। তারা সবাই মিলে একেকটি মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। এটা ছিল ফিকহ/মুফতী বোর্ড। এত উলামায়ে কেরাম পরামর্শ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন, সেটাই গৃহীত হত। এরপর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সামনে মাসআলা পেশ করা হত। তিনি তাঁর দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। তারপর যে কথার উপর সবাই একমত হতেন, তা গৃহীত হত এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. তা লিখে রাখতেন। সুতরাং প্রতিটি মাসআলা এমন, যার ব্যাপারে সে সময়ের উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য ছিল হানাফী মাযহাব হলো এমন,

সুবহানাল্লাহ! ঐ মজলিসে বিভিন্ন মাসআলা আলোচিত হত। এভাবে লাখো মাসায়েলের জবাব লেখা হয়।

## ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মেধা

একটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল– এক ব্যক্তি চার রাকাত ফরয নামায পড়ছে। দুই রাকাত পড়ে তার বৈঠক করতে হবে এবং তাশাহহুদ পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতে হবে। এখন কেউ যদি ভুলে তাশাহহুদ শেষ করে দুরুদ শরীফ পড়তে শুরু করে, তাহলে তার সাহু সেজদা করতে হবে কি না?

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সমাধান দিলেন– যদি اللهم صل على। পর্যন্ত পড়ে তাহলে সেজদায়ে সাহু করতে হবে না, আর محمد পর্যন্ত পড়ে ফেললে সেজদা করতে হবে। এ ফতওয়া দেয়ার পর রাতে তিনি স্বপ্নে রাসূল সা. এর দর্শন লাভ করলেন। রাসূল সা. বললেন, 'নুমান, তুমি আমার নাম পাঠকারীকে সেজদা করার হুকুম দিয়েছ!'

তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে ব্যক্তি উদাসীন অবস্থায় আপনার নাম নেয়, আমি তার জন্য সেজদার হুকুম দিয়েছি।'

রাসূল সা. উত্তর শুনে মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ!'

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন মেধা দিয়েছিলেন।

যাই হোক, স্বনির্ভরতাও একটা প্রতিবন্ধক। আত্মনির্ভর ব্যক্তিকে শয়তান খুব সহজে কুমন্ত্রণা দিতে পারে। কারণ সে তো নিজের উপর নির্ভর করে। একজন লিখেছেন– 'তুমি তোমার অন্তরের ইউসুফকে তোমার কু-প্রবৃত্তির কুয়ায় নিক্ষেপ করেছ এবং তাওবার জামায় মিথ্যা রক্ত মেখে ওজর পেশ করতে এসেছ!'

মানুষ আসলে এমনি করে। তার অন্তরই তাকে গোমরাহ করে।

মানুষ যখন উক্ত দশটি প্রতিবন্ধক থেকে বাঁচতে পারবে, তখন তার তাওবা পরিপূর্ণ হবে এবং সে আল্লাহকে পাবে।

## তাওবার নিয়ত

যে তাওবা করতে চায় তার নিয়ত কী হতে হবে? এটি একটি মৌলিক বিষয়। উলামায়ে কেরাম কয়েক রকম নিয়তের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—

## প্রথম নিয়ত

তাওবাকারী নিয়ত করবে– اعود إلى الصراط المستقيم

অর্থাৎ 'আমি পথভ্রষ্ট হয়ে জীবন-যাপন করছিলাম। এখন আমি সরল পথে এসে জীবনযাপন করতে চাই।' কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾ وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۔ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

'ওহে বনী আদম, আমি কি তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি নিইনি যে, শয়তানের আনুগত্য করবে না? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এবং আমার ইবাদত করো। এটাই হলো সরল পথ।'

(সূরা ইয়াসীন : ৬০-৬১)

তো প্রথম নিয়ত হলো- اعود إلى الصراط المستقيم অর্থাৎ আমি তাওবার মাধ্যমে সহজ-সরল-সঠিক পথে চলব।

## দ্বিতীয় নিয়ত

তাওবাকারী এ নিয়ত করবে– আমি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করছি। কারণ তিনি কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন–

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।'

(সূরা নূর : ৩১)

এখানে تُوْبُوْٓا শব্দটি আদেশসূচক ক্রিয়া। আল্লাহ তাআলার আদেশ এটা। তাই এ আয়াতকে সামনে রেখে তাওবা করবে যে, আমি আল্লাহ তাআলার হুকুম তামিল করতে তাওবা করছি।

## তৃতীয় নিয়ত

তাওবাকারী নিয়ত করবে– فرار من الظلم إلى الفلاح

অর্থাৎ 'আমি জুলুম থেকে পালিয়ে সফলতার দিকে আসছি।' কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেছেন–

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾

'আর যারা তাওবা করবে না তারা তো জালেম।'
(সূরা হুজুরাত : ১১)
বোঝা গেল, তাওবা না করা জুলুম। তাই উক্ত নিয়ত করবে।

## চতুর্থ নিয়ত

তাওবাকারী নিয়ত করবে– الفرار من عذاب الله

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাওবা করবে। কেননা কুরআন মাজীদে এসেছে–

فَفِرُّوْٓا إِلَى اللهِ

'তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।'
(সূরা যারিয়াত : ৫০)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কু-প্রবৃত্তি ও গুনাহ-অপরাধ থেকে পলায়ন করে আল্লাহর দিকে আসো। সুতরাং বান্দা নিয়ত করবে– আমার এ তাওবা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য।

## পঞ্চম নিয়ত

তাওবাকারী নিয়ত করবে– إني مهاجر إلى ربي

'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করছি।'

রাসূল সা. ইরশাদ করেন–

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ

'প্রকৃত মুহাজির হলো- যে গুনাহ ও ভুল-ভ্রান্তি পরিত্যাগ করে।'
(সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৩৯৩৪)

এভাবে বান্দা যেন তার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করে। তখন সে আপন মনে বলতে পারবে– إني مهاجر إلى ربي

'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করছি।'

মানুষ তাওবা করার সময় তার মনে এ সকল নিয়ত রাখলে তাওবা পরিপূর্ণ হবে।

## তাওবার রুকন

তাওবার রুকন তথা তাওবার মৌলিক বিষয় তিনটি। যথা :

### প্রথম রুকন : ইখলাস

তাওবার প্রথম রুকন ও মূল অংশ হলো الإخلاص –ইখলাস ও একনিষ্ঠতা। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গুনাহ থেকে তাওবা করা। মনে করুন, কেউ জুয়া খেলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে বলল– 'আমি তাওবা করছি যে, আর জুয়া খেলব না' তবে এটা তাওবা হবে না। সে তো লোকসানে পড়ে ভবিষ্যতে জুয়া না খেলার প্রতিজ্ঞা করেছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেনি। তাওবা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করা অতি জরুরি। আবার কেউ যদি চুরি করে ধরা পড়ে এবং অপমানিত হয় ও শাস্তি ভোগ করে, এরপর সে বলে– 'চুরি করলে অনেক শাস্তি পেতে হয়, অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়। তাই আমি চুরি থেকে তাওবা করছি।' একেও তাওবা বলা যাবে না। সে তো শাস্তি ও অপমান থেকে বাঁচতে তাওবা করেছে, আল্লাহর নাফরমানি মনে করে পরিত্যাগ করেনি।

সুতরাং তাওবার প্রথম রুকন হলো ইখলাস। ইখলাসের মর্মার্থ হলো–

أن تتوب بخوف من الله وتعظيما وإجلالا له وخشية لسقوط المنزل عنده.

'আল্লাহর ভয়, তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাওবা করা এবং এ ভয়ে করা যে, আল্লাহর দৃষ্টি থেকে সে পড়ে যায় কি না!'

### দ্বিতীয় রুকন : গুনাহ থেকে বিরত হওয়া

তাওবার দ্বিতীয় রুকন হলো- الإقلاع – গুনাহ থেকে বিরত হওয়া। তাওবার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মুখে তাওবা তাওবা জপে গুনাহ করে যাবে। বরং গুনাহের কাজকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিতে হবে। গুনাহ ছেড়ে দিতে যত বেশি কষ্ট হবে, তত বেশি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। আমাদের বুযুর্গরা বলেছেন–

على قدر المعونة تأتي المؤونة

'মানুষের কষ্ট পরিমাণ আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা আসে।'

### তৃতীয় রুকন : লজ্জা-অনুতাপ

তাওবার তৃতীয় রুকন হলো الندم। তথা লজ্জিত-অনুতপ্ত হওয়া। হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ

'অনুতাপই হলো তাওবা।'

(সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪২৫২)

অর্থাৎ মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে, অনুতাপের অনলে দগ্ধ হবে এবং ভাববে– 'আমি আল্লাহর বিধানের অমর্যাদা করেছি।'
বাস্তবেই মানুষ কদর কম করে থাকে। এত বেশি যে, আল্লাহ তাআলার বলতে হয়েছে–

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

'তারা আল্লাহ তাআলার যথাযথ কদর করেনি।'

(সূরা হজ : ৭৪)

আরেক স্থানে বলেছেন–

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾

'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছ না! (বা ভয় করছ না!)'

(সূরা নূহ : ১৩)

অনুতাপের জন্য বেশি বেশি ইসতেগফার করতে হবে। যেমন- কথিত আছে, আবে হায়াত পান করলে নবজীবন লাভ করা যায়। তেমনি ইসতেগফার হলো জীবনের ইঞ্জেকশন। যে ইসতেগফারের ইঞ্জেকশন ব্যবহার করবে সে রূহানিভাবে নবজীবন লাভ করবে।

## তাওবা কীভাবে করবে?

তাওবার নিয়ত কেমন হবে এবং তাওবার রুকন কী কী সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন তাওবা কীভাবে করতে হবে তা আলোচনা করব। উলামায়ে কেরাম এর কিছু পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। যথা—

## ১. তাওবার সূচনা

তাওবার সূচনা হয় الوعظ والتذكير (নিজেকে নসিহত করা ও স্মরণ করিয়ে দেয়া)- এর মাধ্যমে।

বর্তমানে মানুষ শুধু অন্যকে নসিহত করে, উপদেশ বিতরণ করে, নিজেকে কেউ উপদেশ দেয় না। অথচ রাসূল সা. বলেছেন–

أوصي نفسي أولا وإياك بعده.

'আমি প্রথমে নিজেকে নসিহত করছি, এরপর তোমাকে করছি।'

তাই মানুষ নিজেকে উপদেশ দিবে এবং আপন আত্মাকে বোঝাবে–

يا نفسي! توبي قبل أن تموتي

'ওহে আমার আত্মা, তোমার মৃত্যু আসার পূর্বেই তাওবা করে নাও।'

তাই আপন মনে ভাববে এবং নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করবে। মানুষ বলে না, 'আমি নিজেকে অনেক বুঝিয়েছি', তেমনি নিজেকে বোঝাতে হবে– 'থামো, অনেক হয়েছে, এবার গুনাহ থেকে বিরত হও! আল্লাহর নাফরমানি ছেড়ে দাও! সংযত হও!' একেই তাওবার সূচনা বলে।

## ২. গুনাহের স্থল বর্জন

দ্বিতীয় আমল হলো– عدم النفس عن مواقع المعصية

অর্থাৎ গুনাহের যে সকল স্থান ও স্থল রয়েছে, মানুষ নিজেকে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। যেখানে আল্লাহর নাফরমানি হয় সে স্থান বর্জন করবে। আগে যেখানে বসে গীবত করত সেখানে আর যাবে না। যে সব পানশালায় মদপান করত, সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দিবে। যেখানে ছবি দেখত এবং খেলাধুলার আড্ডা জমাত, সে সব স্থানে যাবে না।

আজ আমরা যাদেরকে বন্ধু ভাবছি, কাল কেয়ামতের দিন এরাই বড় শত্রু হবে। কুরআনে আছে–

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

'বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে খোদাভীরুরা নয়।' (সূরা যুখরুফ : ৬৭)

তাই আমাদের উচিত খারাপ বন্ধু থেকে দূরে থাকা। কেয়ামতের দিন মানুষ বলবে–

يَٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِي لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلٗا ﴿٢٨﴾

'হায় আফসোস, আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম!'
(সূরা ফুরকান : ২৮)

বর্তমানে তো মানুষের মাঝে সম্পর্ক হয় ফোন, মেসেজ বা সাক্ষাতের মাধ্যমে। আর এতে মানুষ এতটাই অন্ধ হয়ে যায় যে, অবৈধ সম্পর্কের জন্য দুআও করে। এক যুবক আমাকে বলেছিল– 'আমি প্রতিদিন দুই রাকাত নফল নামায পড়তাম, যাতে আমার কাজিন আমার সাথে গুনাহের কাজ করতে রাজি হয়ে যায়।'
এভাবে মানুষের উপর উদাসীনতা ছেয়ে যায়।
কারো সাথে এমন নাজায়েয সম্পর্ক থাকলে তা ছিন্ন করে ফেলা এবং এমন স্থানসমূহে যাওয়া মানুষের জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।

### ৩. রোযার আধিক্য

আপন নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৃতীয় যে আমল করতে হবে–

علاج النفس بالصوم ومنع الحدود

অর্থাৎ মানুষ রোযা রেখে আপন আত্মার চিকিৎসা করবে এবং নিজেকে সুস্বাদু বস্তু থেকে বিরত রাখবে। কারণ যত বেশি সুস্বাদু খাবার খাবে তত বেশি প্রবৃত্তি বাড়বে আর যত বেশি খাবে তত বেশি প্রবৃত্তি প্রবল হবে। তাই রাসূল সা. বলেছেন–

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

'হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। আর যে বিয়ে করতে সক্ষম নয় সে যেন রোযা রাখে, কেননা রোযা তার প্রবৃত্তি দমন করবে।'
(সহীহ বুখারী : হাদীস ৫০৬৫)

সুতরাং অবিবাহিত যুবক-যুবতী ও বিপত্নীক-বিধবাদের বেশি বেশি রোযা রাখা উচিত। যেমন- প্রতি মাসের আইয়ামে বীয তথা চান্দ্রমাসের তেরো-

চৌদ্দ-পনেরো তারিখ রোযা রাখা। সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা। অথবা যার যার সুবিধামতো যে কোনো দিন নির্ধারণ করে নিবে। (কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে) সবচেয়ে উত্তম আমল হলো- একদিন রোযা রাখা, একদিন না রাখা। এই নিয়মে চলতে পারলে অতি সহজে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। অনেকে মাঝে মাঝে রোযা রেখে বলে- 'রোযা রেখে তো কোনো ফায়দা হলো না!'

আরে ভাই, আমরা সাহরী-ইফতার মিলিয়ে দুই দিনের খানা খাই, সারাদিন তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলি, তো রোযা রেখে ফায়দা হবে কীভাবে?

রোযা রাখার একটা উদ্দেশ্য আছে। আত্মাকে কষ্ট দিলে এ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। আমাদের সবার যেন সেই উদ্দেশ্য অর্জন হয়!

## ৪. আখেরাতের ভাবনা

চতুর্থ বিষয় হলো- ارفعنا بفكر أعلام الآخرة

অর্থাৎ আখেরাতের ব্যাপারে আমাদের ভাবনা বাড়াতে হবে। দোযখের আযাব ও জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে আপন মনে চিন্তা করতে হবে। এ সব ভাবনা যত বেশি করা হবে তত বেশি অন্তর গুনাহ থেকে বিমুখ হবে এবং নেক কাজ করতে আগ্রহী হবে। মানুষের স্বভাব হলো- তাকে একটু আমলের জন্য উৎসাহ দিলেই সে তা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

আমি একবার আমার ছোট ছেলে সাইফুল্লাহর কাছে জান্নাতের আলোচনা শুরু করলাম। (যখন সে অনেক ছোট ছিল) সে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। আমি তাকে বলছিলাম, জান্নাতে এমন এমন বাড়ি-ঘর থাকবে, বাগান থাকবে, সবুজ-শ্যামল প্রান্তর থাকবে, কত ধরনের মজা থাকবে, আল্লাহর দীদার লাভ হবে, মজার মজার মাহফিল হবে ইত্যাদি। আধ ঘণ্টার মতো তাকে এ সব কথা শোনালাম। সব শুনে সে বলে উঠল- 'তাহলে আব্বু চলুন না সেখানে!'

তো মানুষের স্বভাবটাই এমন যে, তাকে কোনো ব্যাপারে উৎসাহ দিলে তার অন্তর আগ্রহী ও প্রস্তুত হয়। তাই আমরা আমাদের আত্মাকে নেক কাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলব, তাহলে আত্মা আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হবে।

## ৫. সব ধরনের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা

শেষ বিষয় হলো- تحطيم الأصنام
তথা নিজের মধ্যে যে সকল মূর্তি রয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলা। মূর্তি পাথরের হোক বা মনের, সব ভেঙ্গে ফেলতে হবে। যতদিন মূর্তিকে না ভাঙ্গবে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সত্তা সম্পর্কে অবগত হবে না। কোথাও কোনো ধরনের সম্পর্ক থাকলে তা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে বলতে হবে–

تركتُ اللات والعزى جميعاً

كذلك يفْعَلُ الرجلُ البصيرُ

'(হে আল্লাহ,) সব লাত-উযযা আমি বর্জন করেছি,
বিবেকসম্পন্ন লোকেরা এমনি করে থাকে।'

সুতরাং আমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সকল প্রবৃত্তিপূজার মূর্তি ভেঙ্গে ফেলব।

## গুনাহ বর্জনের উপায়

আত্মশুদ্ধির সাধনাকারীরা প্রায়ই যে প্রশ্ন করে থাকে তা হলো- 'নিয়তও করলাম, তাওবার রুকনগুলোও জানা হলো, কীভাবে তাওবা করতে হবে তাও জানলাম, এরপরও অভ্যাস ছাড়তে পারি না। আমরা আমাদের মন্দ অভ্যাস কীভাবে বর্জন করব?'

উত্তর হলো- এর জন্য সাতটি করণীয় রয়েছে। যা নিম্নরূপ :

## প্রথম করণীয় : গুনাহের মন্দ পরিণতির প্রতি দৃষ্টিপাত

এ উপায়টা হলো- আমরা গুনাহের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করব। যে ব্যক্তি জানতে পারবে গুনাহ কত খারাপ ও নিকৃষ্ট কাজ, সে সর্বদা গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। কারণ যে গুনাহ করবে, গুনাহের মন্দ প্রভাব তো তার উপর পড়বেই। গুনাহের কিছু মন্দ পরিণতির কথা এখানে উল্লেখ করা হলো :

### ১. অপদস্থতা

গুনাহের প্রথম প্রভাব হলো, মানুষ গুনাহের কারণে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়। হাদীস শরীফে রাসূল সা. ইরশাদ করেন–

إن الله جعل العزة والوقار لمن تابع أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري.

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইজ্জত-সম্মান নির্ধারণ করেছেন ঐ বান্দার জন্য, যে আমার আদেশের অনুসরণ করে।
আর অপদস্থতা ও হীনতা নির্ধারণ করেছেন তার জন্য, যে আমার আদেশের অবাধ্যতা করে।'

সুতরাং আমরা শরীয়তের উপর পথ চললে সম্মানিত হব, আর গুনাহে লিপ্ত হলে লাঞ্ছনা পাব।

## ২. চেহারার মলিনতা

গুনাহের আরেকটি প্রভাব হলো- এর কারণে মানুষের চেহারা কালো হয়ে যায়। কালো হওয়ার অর্থ হলো- চেহারা মলিন ও অনুজ্জ্বল হয়ে যায়। চেহারার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যায়। গুনাহকারীর চেহারাই যেন তার চোগলখুরি করে। তার চেহারায় যেন শুষ্ক হেমন্ত মৌসুম খেলা করে। চেহারায় অশুভ ভাব ফুটে উঠে। বান্দার আমলের সাইনবোর্ড হয়ে যায় এই চেহারা। গোপনে লুকিয়ে মানুষ যে গুনাহ করে, আল্লাহ তাআলা গুনাহের অন্ধকার তার চেহারায় মেখে দেন।

আল্লাহওয়ালাদের চেহারা দেখুন, কী সুন্দর, কী নূরানী, কী তরতাজা! তাঁদের চেহারায় থাকে ঔজ্জ্বল্যের বিভা, তাদের চেহারা থেকে যেন নূরের শিশির ঝরে পড়ে! খেয়াল করলে দেখবেন, যারা নামায পড়ে না, তারা অন্য গুনাহ না করলেও তাদের চেহারায় ঔজ্জ্বল্য থাকে না। এমনিভাবে বেপর্দা নারীরা যত মেকাপই করুক না কেন, তাদের চেহারায় নূর থাকে না। পর্দা না করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের চেহারার উজ্জ্বলতা বিদূরীত করে দেন। এরপর যতই ফেয়ার এন্ড লাভলি ক্রিম মাখুক, কোনো লাভ নেই!

## ৩. আত্মার কলুষতা

গুনাহগারদের চেহারাই শুধু মলিন হয় না, সাথে সাথে গুনাহের কারণে তাদের অন্তরও কলুষতায় ছেয়ে যায়। তাদের অন্তরে বিষণ্নতা ও সংকীর্ণতা তৈরি হয়।

## ৪. দুশমনের মোকাবেলায় দুর্বলতা

নিজের দুশমনদের মোকাবেলায় গুনাহগার ব্যক্তির অন্তর দুর্বল ও অলস হয়ে পড়ে। যে আল্লাহর সাহায্য লাভ করে না, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়। সে সম্মানিত হলেও আল্লাহ তাআলা তাকে অসম্মানিত করেন।

## ৫. পরিবারের কাছে ভালোবাসা লোপ পাওয়া

গুনাহের আরেকটি মারাত্মক প্রভাব হলো- গুনাহগার ব্যক্তি ও তার পরিবারের লোকদের মাঝে ভালোবাসা দূর করে দেয়া হয়, ঘৃণার দেয়াল তুলে দেয়া হয়। ফলে স্বামী বলে- স্ত্রীকে আমার ভালো লাগে না। স্ত্রী বলে- স্বামীর সাথে আমার মেজাজ-স্বভাব মিলে না। এটা হলো গুনাহের পরিণতি। যুবক ছেলেরা এসে বলে, তারা ঘরের বাইরে বের হলে কুদৃষ্টি করে থাকে। অথচ তাদের ঘরে নেক, ভালো ও সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতি আকর্ষণই নেই। এই যে ভালোবাসাকে ঘৃণায় বদলে দেয়া হলো, এটা গুনাহের কারণে হয়ে থাকে। এজন্য অধিকহারে ইসতেগফার করতে হবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর প্রতি মহব্বত তৈরি করে দিবেন।

## ৬. নিজের প্রতি ঘৃণা

গুনাহগার ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে পূর্বের ভালোবাসা ঘৃণায় পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, এরচেয়ে করুণ পরিণতি হলো- পাপী ব্যক্তি ও তার হৃদয়ের মাঝে ঘৃণা তৈরি হয়। নিজের কাছেই নিজেকে ভালো লাগে না। মরে যেতে ইচ্ছা করে। আত্মহত্যা করতে চায়। নিজেই নিজের প্রতি বিরূপ হয়ে যায়। আপনারা অনেক লোককে দেখেছেন হয়তো, তারা সবাইকে গালিগালাজ করতে থাকে। এমনকি নিজেকেও। নিজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির কারণ কী? কারণ হলো গুনাহ করার পরিণতি হিসেবে তার নিজের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেয়া হয়।

## ৭. বান্দা ও আল্লাহর মাঝে ঘৃণার দেয়াল

গুনাহের করুণ পরিণতি এখানেই শেষ নয়, এরপর পাপী ব্যক্তি ও আল্লাহর মাঝে ঘৃণার সম্পর্ক হয়ে যায়। গুনাহগার ব্যক্তির কাছে আল্লাহ তাআলার আলোচনা ভালোই লাগে না। তখন সে বলে- 'কী করব, আল্লাহ

তাআলা তো শুধু দাড়িওয়ালাদের কথাই শোনেন, তাদের দুআই কবুল করেন!'

একটা মূলনীতি আছে– 'কারো কুফরি কথা উল্লেখ করা কুফরি নয়'। এই মূলনীতি মেনে একজনের কথা বলছি। এক লোক আমাকে বলল, 'আল্লাহ তাআলার মাঝে তো ফেবারিটইজম রয়েছে!'

আমি বললাম, 'কেন ভাই?'

বলল, 'কারণ তিনি শুধু দাড়িওয়ালাদের দুআ শোনেন! আমাদের কথা শোনেনেই না!'

এটা হলো গুনাহের পরিণতি। দেখুন, গুনাহের কারণে প্রথমে বান্দা ও তার পরিবারের মাঝে ভালোবাসা ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর বান্দা ও তার নিজের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়। তারপর বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মধ্যকার সম্পর্ক খতম করে দেয়া হয়।

## ৮. নিরন্তর অনুতাপ

বান্দার মাঝে গুনাহের কারণে অষ্টম যে প্রভাবটি পড়ে তা হলো–

وقوع العبد في بئر الحسرات

অর্থাৎ বান্দা অনুতাপের কুয়ায় পড়ে যায়। শুধু অনুতাপ আর অনুতাপ। 'হায়, যদি আমার কাছে এমন গাড়ি থাকত! এমন বাড়ি থাকত! এমন স্ত্রী হত!' রোজ রোজ নতুন নতুন আফসোস তৈরি হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে অনুতাপের কুয়ায় ফেলে দেন। এর ফলে তার আফসোস কখনোই শেষ হয় না। বেপর্দা নারীদের মনে সব সময় এ আফসোস থাকে যে, 'হায়, আমার স্বামী যদি এমন হত! আমার ঘরে যদি সম্পদ এত বেশি হত!'

মোটকথা, অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয় না।

## ৯. রিযিকের স্বল্পতা

গুনাহের আরেকটি ভয়ঙ্কর পরিণতি হলো- গুনাহের কারণে গুনাহগার ব্যক্তির রিযিক কমিয়ে দেয়া হয়। হাদীস শরীফে আছে–

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

'বান্দা যে রিযিক পাওয়ার যোগ্য ছিল, গুনাহের কারণে সে তা থেকে বঞ্চিত হয়।'
(সহীহ ইবনে হিব্বান : হাদীস নং ৮৭২)

লোকেরা এসে বলে– 'হযরত, কিছু দুআ শিখিয়ে দিন। মনে হচ্ছে, কেউ আমার ব্যবসার ক্ষতি করছে!'

মনে রাখবেন, কেউ কারো ব্যবসা বন্ধ করতে পারে না। রিযিকের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর জিম্মায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

'আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে।'
(সূরা যুখরুফ : ৩২)

আল্লাহ তাআলা দান করলে কেউ বাধা দিতে পারবে না আর তিনি যদি নিয়ে যান তাহলে কেউ দিতে পারবে না। এটা অনর্থক কথা যে, কেউ ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। কাউকে ছোট খোদা মনে করা যাবে না। যেমন অনেকে বলে থাকে, মহাজন আমার রিযিক কমিয়ে দিয়েছেন, অমুক ব্যক্তি আমার রিযিক হ্রাস করে দিয়েছে। আল্লাহর বান্দা, কেউ রিযিক হ্রাস করেনি। বিশ্বজগতের পালনকর্তাই আমাদের গুনাহের কারণে রিযিক কমিয়ে দেন। অনেকে বলে– 'বিক্রি হয় না... সারা দিন বসে থেকে চলে আসি... বিক্রি হতে গিয়েও হয় না... ছেলে-মেয়ের বিয়ের সম্পর্ক ও প্রস্তাব আসে ঠিকই, কিন্তু ফাইনাল হয় না।'

ভালো ও উপযুক্ত সম্পর্ক পাওয়াও তো রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। কোনো না কোনো গুনাহের কারণে এ সব হয়ে থাকে। আমরা গুনাহ থেকে প্রকৃত তাওবা করে নিলে আল্লাহ তাআলা আমাদের রিযিককে এ সকল অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত করে প্রশান্তিময় রিযিক দান করবেন।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, অনেক মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ব্যক্তির কাছে বহু ধন-সম্পদ থাকে। এটা কী করে হয়?

এর উত্তর হলো- তাদের সম্পদ হালাল নয়। নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারেন, এমন লোকদের কাছে যা সম্পদ থাকে তার সবই হারাম ও সন্দেহযুক্ত সম্পদ। হালাল রিযিক এমন হয় না যে, বান্দা আল্লাহর নাফরমানিও করবে, আবার সে অনেক হালাল রিযিক লাভ করবে।

## খরচের খাত দেখে আয়ের উৎস নির্ণয়

ইমাম মালেক রহ. বলতেন, 'আমরা মানুষের সম্পদ ব্যয়ের খাত দেখেই আয়ের উৎস অনুমান করে নিতাম যে, তা হালাল না হারাম। কারণ হালাল সম্পদ হলে তা নেক কাজে ব্যবহৃত হবে আর হারাম সম্পদ হলে গুনাহের কাজে ব্যবহৃত হবে।'

একবার ইমাম মালেক রহ. এর কাছে এক লোক এল। সে জানতে চাইল– 'আচ্ছা, আপনি যে বলেন, মানুষের সম্পদের ব্যয়ের খাত দেখেই আয়ের উৎস বুঝতে পারেন, এর মানে কী?'

তিনি বললেন, 'এক কাজ করো। এই টাকাগুলো নিয়ে শহরে যাও। যাকে তোমার শহরের শীর্ষ ধনী মনে হবে, যে কারো মুখাপেক্ষী নয়, কারো কাছে হাত পাতে না, তাকে টাকাগুলো দিবে। এরপর দেখো সে কোথায় এ টাকা খরচ করে।'

ঐ ব্যক্তি টাকা নিয়ে শহরে গিয়ে একজনকে খুঁজে পেল। তার পোশাক অনেক দামি ও সুন্দর। সম্ভ্রান্ত চেহারা। হাতে থলে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। এই লোককেই তার পছন্দসই মনে হলো। তাকে টাকা দিয়ে দিল। এরপর চুপিচুপি তার অনুসরণ করল। সে বিস্মিত হয়ে দেখল, লোকটি আরেক গলিতে চলে গেল এবং হাতের থলে ফেলে দিল। এরপর এক দোকানে গিয়ে কিছু খাবারদাবার কিনে তার ঘরে চলে গেল।

সে প্রকৃত কাহিনী জানতে ঐ ব্যক্তির ঘরে করাঘাত করল। দরজা খোলার পর বলল, 'দয়া করে যদি আপনার অবস্থা বলতেন।'

সে জানাল, 'আমি এ এলাকার গণ্যমান্য লোকদের একজন। আমার ঘরে তিনদিন ধরে সবাই উপবাস করছে। শিশুরা ক্ষুধায় মরার উপক্রম হয়েছে। আমি অসুস্থতার কারণে কোনো কাজ করতে পারছি না। আমি কারো কাছে চাইতেও পারি না, কিছু নিতেও পারি না। আজ সন্তানদেরকে ক্ষুধার জ্বালায় তড়পাতে দেখে বাইরে বের হলাম। একখানে মৃত বকরি দেখে ভাবলাম, একেবারে নিরুপায় ও অপারগ অবস্থায় তো মৃত প্রাণী খাওয়া হালাল হয়। তাই এখান থেকে কিছু গোশত নিয়ে যাই। আমি ঐ বকরির রান কেটে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনি আমাকে টাকা দিলেন। টাকা পাওয়ার পর মৃত বকরির গোশত খাওয়া আমাদের জন্য হারাম হয়ে গেছে বিধায় তা ফেলে দিলাম। এরপর দোকানে গিয়ে খাবার কিনে বাসায় নিয়ে এলাম।'

ঐ লোক কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেল। হযরতকে গিয়ে জানাল। হযরত বললেন, 'এখন তোমার টাকা বের করো এবং শহরে গিয়ে যাকে তোমার সবচেয়ে দরিদ্র মনে হয় তাকে টাকা দিয়ে দেখো সে কোথায় ব্যয় করে।'

সে টাকা নিয়ে শহরে গেল। বাজারে পঙ্গু এক লোক ভিক্ষা করছিল। সে ভাবল, এই লোক প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র। একেই টাকা দিই। তাই সে তাকে টাকা দিল। এরপর তার অনুসরণ করতে লাগল। সে সোজা এক মদের দোকানে গিয়ে কিছু নেশাদ্রব্য কিনল। তারপর পঙ্গু লোকটি এক বেশ্যার ঘরে গিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো।

সে সব কাহিনী দেখে হযরতের কাছে ফিরে এসে বলল, 'হযরত, আপনি সত্য বলেছেন। আমার এ টাকা সন্দেহযুক্ত ছিল। তাই আমি টাকাটা আমার ধারণা মোতাবেক উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করলেও সে তা গুনাহের কাজে ব্যয় করেছে। অপর দিকে আপনার টাকা হালাল ছিল। তাই আমি আমার দৃষ্টিতে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে টাকাটা দান করলেও আল্লাহ তাআলা উপযুক্ত ক্ষেত্রেই তা ব্যয় করার ব্যবস্থা করেছেন।'

তো ইমাম মালেক রহ. বলতেন, 'আমরা মানুষের সম্পদ ব্যয়ের খাত দেখেই আয়ের উৎস অনুমান করে নিতাম যে, তা হালাল না হারাম।' সুতরাং আপনারা যদি দেখেন, কোনো ফাসেক-গুনাহগার ব্যক্তি খুবই সম্পদশালী, কিন্তু সে টাকা অপচয় করে বেড়ায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরে নিবেন যে, হালাল টাকা এভাবে কেউ পেতে পারে না। কোনো না কোনো সমস্যা অবশ্যই আছে।

## ১০. প্রভাব লোপ পাওয়া

গুনাহের মন্দ পরিণামের মধ্যে একটি হলো- زوال المهابة অর্থাৎ মানুষের মাঝে স্বাভাবিকভাবে যে প্রভাব থাকে, তা বিদূরীত হয়ে যায়। মানুষের অন্তরে তার প্রতি তুচ্ছ মনোভাব তৈরি হয়। এর উদাহরণ হলো- কারো সামনে কোনো অফিসার এলে সে তাকে স্যালুট করে। কিন্তু অফিসার ফিরে যাওয়ামাত্রই সে তার মা-বাপ তুলে গালি দেয়। মানুষ এমন লোকদেরকে বাহ্যিকভাবে সম্মান করে, অন্তর থেকে সম্মান কেউ করে না। হৃদয় থেকে সম্মান করে একমাত্র তাকে, যিনি সৎ কাজ ও খোদাভীরুতার মাঝে জীবনযাপন করেন।

## ১১. শয়তানের প্রাধান্য বিস্তার

একাদশতম বিষয় হলো–

يكون الشيطان مولاه من دون الله

অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তান তার বন্ধু ও অভিভাবক হয়ে যায়। শয়তান এমন বান্দার অন্তরে স্থান করে নেয়। কুরআনের বাণী–

وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

'যার সঙ্গী হয় শয়তান; সে তো নিকৃষ্ট সঙ্গী!'
(সূরা নিসা : ৩৮)

## ১২. হৃদয়ের মরিচা

গুনাহের আরেকটা মন্দ্ পরিণতি হলো– رين القلوب তথা অন্তরে জং ধরা। কুরআনে আছে–

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾

'কখনো না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।'
(সূরা মুতাফফিফীন : ১৪)

মানুষের অন্তরে যখন জং ধরে তখন কল্যাণের কথা তার অন্তরে রেখাপাত করে না। তাকে যতই নসিহত করা হোক না কেন, সে ফিরেও তাকায় না। এটা হলো বান্দার গুনাহের করুণ পরিণতি।

## ১৩. নেক কাজের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া

গুনাহের আরেকটি মন্দ পরিণতি হলো-

حرمان من حلاوة الطاعة

অর্থাৎ নেক কাজের যে স্বাদ রয়েছে তা থেকে গুনাহগার ব্যক্তিকে মাহরুম করে দেয়া হয়। নামাযে মজা নেই, তেলাওয়াতে মজা নেই, তাসবীহ পড়তে ইচ্ছা করে না। নেক কাজ করতে মন আগ্রহী হয় না। আমরা যে নজর নিয়ন্ত্রণে রাখি না, গায়রে মাহরাম নারীদের দিকে তাকাই, হতে পারে এর

পরিণতিতে আল্লাহ তাআলা আমাদের মুরাকাবা-ধ্যান ও ফিকিরে স্বাদ ও মজা দেন না।

## ১৪. আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হওয়া

চতুর্দশ বিষয়টি খুবই করুণ। গুনাহের এরচেয়ে বড় ক্ষতি আর নেই। তা হলো– خروج من حصن الله الحصين

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পাপী ব্যক্তিকে তাঁর নিরাপত্তার কেল্লা থেকে বের করে দেন। এমন ব্যক্তি কতই না হতভাগা! এটা হলো গুনাহের পরিণতি।

## ১৫. ইলম থেকে মাহরুমি

গুনাহের আরেকটি করুণ পরিণতি হলো- গুনাহগার ব্যক্তি ইলম থেকে মাহরুম হয়। অনেক ছাত্র এসে বলে– 'হযরত, আমরা সবক মুখস্থ করি, কিন্তু ভুলে যাই।' মনে রাখতে হবে, গুনাহ করলে স্মরণশক্তি কমে যাবে, পড়া মনে থাকবে না। ছাত্রদের মাথায় রাখতে হবে– বদ নজরের কারণে, গীবতের কারণে, কুধারণার কারণে, বেয়াদবির কারণে, বা কারো মনে কষ্ট দেয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা ইলম মনে থাকার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

## ১৬. বয়স কমে যাওয়া

গুনাহের কারণে মানুষের বয়স হ্রাস হয়। হাদীসে এসেছে–

'যে ব্যক্তি কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তাআলা তার বয়স হ্রাস করে দেন।'

উলামায়ে কেরাম বয়স কমে যাওয়ার দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একটি হলো- আসল বয়সই কমিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা তার বয়স একশর পরিবর্তে সত্তর করে দেন, অর্থাৎ দশ-বিশ বছর হ্রাস করে দেন।

আরেকটি হলো- বয়সের কার্যকারিতা হ্রাস করে দেয়া। যুবক বয়সেই বার্ধক্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যৌবনের কর্মচাঞ্চল্য হ্রাস করে শরীরকে রোগ-ব্যাধির ডিপো করে দেয়া হয়। দেখা যায়, পঁচিশ বছরের তরুণ বসা থেকে উঠলে চোখে অন্ধকার দেখে, মাথা ঘুরায়। বর্তমানে তো আরো করুণ

অবস্থা। সেদিন ষোলো বছরের এক ছেলে এসে বলল, 'হযরত, আমার কোমর ব্যথা। ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারি না। একটু দুআ করে দিন।' ষোলো বছর বয়স, তার আবার বাতের ব্যথা! হলো কিছু! মনে হয় যেন শৈশবের পরেই বার্ধক্য চলে এসেছে, যৌবন কাকে বলে জানেই না! এ সবই হলো গুনাহের পরিণতি।

## ১৭. ইসলামের শত্রুদের সাথে সাদৃশ্য

গুনাহের আরেকটি পরিণতি হলো- গুনাহকারী ব্যক্তি ইসলামের শত্রুদের সাথে সাদৃশ্য লাভ করে। আল্লাহর দুশমনদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া কতই না মন্দ! হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, পাপী ব্যক্তিকে সৃষ্টিজীব অভিসম্পাত করে, ফেরেশতারা তার জন্য বদ দুআ করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর শয়তানকে চাপিয়ে দেন।

যার অন্তরে এ কথা দৃঢ়মূল হবে যে, গুনাহের পরিণতি এত করুণ ও মারাত্মক হয়, সে গুনাহের কাছে যেতেও ভয় পাবে এবং নিজের স্বভাব পরিবর্তন করবে।

## দ্বিতীয় করণীয় : আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ

গুনাহ বর্জনের জন্য দ্বিতীয় করণীয় হলো, মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাবোধ করবে এ সব ভেবে যে, আমার আল্লাহ না চাইতেই আমাকে কত না নেয়ামত দান করেছেন; আমি কত নির্লজ্জ যে, এমন প্রতিপালকের আদেশ-নিষেধ পালনে ত্রুটি করছি।

কারো আশপাশে যদি ছোট্ট শিশু থাকে, তবুও সে তার সামনে গুনাহ করার সাহস পায় না, অথচ বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর সামনে তার জমিনে বসে তারই নাফরমানি করা কতই না স্পর্ধার ব্যাপার!

এরপর সে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতরাজি সম্পর্কে ভাববে যে, আমার প্রতিপালক আমাকে না চাইতেই এত এত নেয়ামত দিয়েছেন, এরপরও আমি কী করে তার নাফরমানি করছি!

## তৃতীয় করণীয় : আল্লাহর ভয়

তৃতীয় কর্তব্য হলো- আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করতে হবে। অনেক সময় মানুষের এমন কিছু গুনাহ আল্লাহর নজরে পড়ে, যার কারণে তিনি পাকড়াও করেন। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

'অনন্তর তারা যখন আমাকে রুষ্ট করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম।'
(সূরা যুখরুফ : ৫৫)

আল্লাহ তাআলা যেন কোনো কারণে আমাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা না করেন। তাঁর পাকড়াও বড় কঠিন। তাই আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও নারাজির ভয় অন্তরে সৃষ্টি হলে গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হবে।

## চতুর্থ করণীয় : মৃত্যুর স্মরণ

গুনাহ বর্জনের চতুর্থ উপায় হলো–

قصر الأمل وكثرة ذكر الموت

'সীমাবদ্ধ আকাঙ্ক্ষা ও অধিকহারে মৃত্যুর স্মরণ।'

এটাও গুনাহ বর্জনের সহজ উপায়। মানুষের মনে যখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, আমি অচিরেই এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিব আর আমার চিরদিনের ঠিকানা হবে আখেরাতে, তখন সে শুভ পরিণামের আশায় গুনাহ থেকে বিরত থাকবে।

## পঞ্চম করণীয় : আত্মশুদ্ধি

আরেকটি পদ্ধতি হলো- আপন আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি, লোভ, হিংসা ও মন্দ অভ্যাস থেকে পবিত্র করতে আত্মশুদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে জরুরি কর্তব্য হলো– مجانبة الفضول في الطعام والشراب

'পানাহারের ক্ষেত্রে অপচয় থেকে বিরত থাকা।'

কম খাওয়া ও কম কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

## ষষ্ঠ করণীয় : আত্মজিজ্ঞাসা

আরেকটি কাজ হলো- محاسبة النفس তথা আত্মজিজ্ঞাসা। সকাল-সন্ধ্যা মুরাকাবা ও ধ্যান করার নামই আত্মজিজ্ঞাসা। হযরত উমর রা. বলতেন–

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا

'তোমরা জিজ্ঞাসিত হওয়ার পূর্বেই নিজেদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাও।'

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ : নং ৩৪৪৫৯)

সুতরাং যে ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে সকাল-সন্ধ্যা মুরাকাবা ও আত্মজিজ্ঞাসা করবে, তার জন্য গুনাহের অভ্যাস ছেড়ে দেয়া সহজতর হয়ে যাবে।

## সপ্তম করণীয় : বুযুর্গদের সাহচর্য গ্রহণ

সর্বশেষ কর্তব্য হলো– বুযুর্গ ও নেককার লোকদের সোহবত গ্রহণ করা। নিজে নিজে এ সকল অভ্যাস বর্জন করা কঠিন। তাই বুযুর্গদের মজলিসে আসা-যাওয়া করলে তাদের সাহচর্যের বরকতে গুনাহের অভ্যাস বিদূরীত হবে। এ কারণেই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করো।'

(সূরা তাওবা : ১১৯)

আমরা যখন বর্ণিত সাতটি বিষয় মাথায় রাখব এবং তার উপর আমল করব, তখন গুনাহ ও মন্দ অভ্যাস বর্জন করা সহজ হয়ে যাবে।

## তাওবা কবুল হওয়ার লক্ষণ

সর্বশেষ আলোচনা হলো- কোনো ব্যক্তি তাওবা করল, মন্দ অভ্যাস বর্জন করল, অসৎকর্ম ছেড়ে দিল, কিন্তু তার তাওবা কবুল হয়েছে কি না তা কীভাবে বোঝা যাবে? তাওবা কবুল হওয়ারও কিছু আলামত ও লক্ষণ রয়েছে, যার মাধ্যমে জানা যায় আল্লাহর দরবারে তাওবা কবুল হয়েছে কি না। সেগুলো হলো-

## ১. পরবর্তী জীবন আগের চেয়ে উত্তম হওয়া

প্রথম লক্ষণ হলো-

أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها.

অর্থাৎ তাওবা কবুল হওয়ার একটি নিদর্শন এই যে- তাওবা করার পর মানুষের জীবন পূর্ববর্তী জীবনের চেয়ে ভালো হয়ে যায়। আগে নামায কাযা হত, এখন পাবন্দির সাথে নামায আদায় করে। আগে একাকী নামায পড়ত, এখন জামাতের সাথে পড়ে। অথবা আগে জামাতের সাথে পড়ত, এখন তাকবীরে উলার প্রতি লক্ষ রাখে। আগে শুধু ফরয নামায পড়ত, এখন তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফলও আদায় করে। মানুষের জীবনের এই মোড় পরিবর্তনই বলে দেয় যে, তার তাওবা আল্লাহ কবুল করেছেন।

## ২. পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকা

দ্বিতীয় লক্ষণ হলো-

أن لا يزال الخوف من العودة الى الذنب مصاحبا له.

অর্থাৎ তাওবা কবুল হওয়ার আরেকটি লক্ষণ এই যে- ঐ বান্দার মনে সব সময় এ ভয় থাকে যে, পুনরায় সে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় কি না! সে কখনো নিজ আত্মার উপর ভরসা করে না যে, আমি তো এখন তাওবা করে ফেলেছি, আর ভয় কিসের! বরং সে সর্বদা আশঙ্কায় থাকে যে, পুনরায় গুনাহের পথে চলে যায় কি না! এমন ব্যক্তি আপন সত্তার উপর নির্ভর করে না।

## ৩. গুনাহের কামনা মুক্ত হওয়া

তৃতীয় লক্ষণ-

انخلاع القلب وتقطعه ندما وخوفا من العقوبة العاجلة والآجلة.

অর্থাৎ মানুষের হৃদয় গুনাহের কামনা থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। অন্তর থেকে গুনাহের কাজ না করার আক্ষেপ চলে যাওয়া। যেমন- মনে মনে এ কথা ভাবা– 'আমার আল্লাহ নিষেধ করেছেন, তাই আমি কুদৃষ্টি করব না। আমার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী অপরিচিতা নারীটি কে ও কেমন, এ সব আমি মনেই আনব না।'

অন্তর থেকে গুনাহের কামনা-বাসনা দূর করাই সবচেয়ে কঠিন।

বর্তমান যুগের যুবকেরা কেন কুদৃষ্টি করে? কারণ হৃদয়ে কুদৃষ্টির বাসনা জাগে এবং তা কুদৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ যুগের তরুণদের প্রায় সবাই দ্বিতীয় বিয়ে করতে একপায়ে খাড়া! তারা এর জন্য দুআ করতে থাকে। অনেকে তো আমার কাছে চিঠি লেখে যে, 'হযরত, দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি চাই'। আমি উত্তরে লিখি, 'স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করো।'
সুতরাং অন্তরের এ বাসনা দূর করতে হবে।

## একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার দেশের বাইরে এক এলাকায় সফরে গেলাম। এক স্থানে কয়েকজন তালিবে ইলম বসে ছিল। তারা সবাই ছিল বিবাহিত। তাদের আলোচনার বিষয় ছিল দ্বিতীয় বিয়ে ও তার ফযিলত। আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বললাম, 'তোমরা যদি দ্বিতীয় বিয়ের চক্করে পড়ো, তবে তোমাদেরকে দিয়ে আর ইলমি কাজ হবে না। এরপর আর ইলম তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। বর্তমান যুগ এমন নয় যে, দুই বিয়েও করবে, আবার ইলমি কাজও চালিয়ে যাবে। ইলমের প্রচার ও দীনের খেদমতে নিয়োজিত থাকতে চাইলে আল্লাহ তাআলা যে এক স্ত্রী দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। তোমার স্ত্রী যদি ভালো, নেককার ও সুস্থ হয় এবং সব কাজ করতে পারে, সেবা করতে পারে ও প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তবে একাধিক বিয়ের কথা ভাবার কী প্রয়োজন? কারণ ইলমি কাজে ব্যস্ত থাকায় তোমরা একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতাবিধান করতে পারবে না। অথচ কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে– "একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতাবিধান ও ইনসাফ করতে না পারলে এক বিয়েই যথেষ্ট।" যারা দীনের কাজ করতে চায় তারা যেন এ চিন্তায় নিপতিত না হয়। এ কথা অন্তরে গেঁথে নিতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা এক স্ত্রী দিয়েছেন, তার সঙ্গেই জীবন কাটাতে হবে।'
তারা বলল, 'অন্তর থেকে কামনা-বাসনা দূর হয় না। এ কারণে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কুনজর হয়ে যায়।'
আমি তাদেরকে বোঝালাম, 'ভাইয়েরা, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ইলমের জন্য কবুল করেছেন, তাই তোমরা ইলমের পথেই অগ্রসর হও। তোমাদের ঘরে স্ত্রী দিয়েছেন, তাদের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা প্রকাশ করো। এভাবে জীবনযাপন করে দেখো।'

সবাই ওয়াদা করল, 'আজ থেকে আমরা কুদৃষ্টি করব না এবং অন্তর থেকে কামনা-বাসনা দূর করার চেষ্টা করব।'

কিছুদিন পর তাদের একজন আমার কাছে এসে জানাল, 'যেদিন আমি আপনার সাথে ওয়াদা করলাম, সেদিন থেকে জানি না কী হলো, স্ত্রীকে অনেক ভালো লাগছে।'

আসলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মানুষ যখন বাইরের বস্তু থেকে কামনাহীন হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা তার ঘরে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা দান করেন।

### ৪. বিনয়

চতুর্থ লক্ষণ হলো- যার তাওবা কবুল হয় তার ভেতর বিনয়ের অবতারণা হয়। সে কথা বললে মনে হয় যে, এ লোক নিজেকে গুনাহগার মনে করে তাওবা করেছে এবং এখন অন্যদের সাথে খুব বিনয়ের আচরণ করে। এমন লোকের মধ্যে অহঙ্কার ও দম্ভ থাকে না, থাকে শুধু বিনয়।

এই হলো তাওবা কবুল হওয়ার চারটি লক্ষণ।

## রিযিকে বরকত হওয়ার আমল

এখানে আমি আরেকটি বিষয় বলে রাখি, তাবিজের প্রতি কিছু মানুষের খুব আগ্রহ থাকে। কথায় কথায় তাবিজ...। অধিকাংশ তাবিজই রিযিকের সংকীর্ণতার জন্য চেয়ে থাকে। হাদীসে কিছু আমলের কথা বলা হয়েছে, যার কারণে আল্লাহ তাআলা রিযিকে বরকত দান করেন। আপনারা এ সব আমল করুন, কোনো তাবিজের প্রয়োজন হবে না। সংক্ষেপে আমলগুলো উল্লেখ করছি :

* ইসতেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন।
* অধিক ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন।
* হজ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রিযিকে বরকত দান করেন।
* অধিক উমরা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রিযিকে বরকত দান করেন।
* সদকা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন।
* দুর্বলদের প্রতি সদয় আচরণ ও অনুগ্রহ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন।

* তাকওয়া ও খোদাভীরুতার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন।
* সততার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন।
* হিজরত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন।

এ সকল আমলের কথা হাদীসে এসেছে। আপনি এর উপর আমল করুন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ধনী ও অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দিবেন।

## তাওবা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ

তাওবাকারী আল্লাহ তাআলার বন্ধু হয়ে যায়। তাওবাকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন। কত বড় পুরস্কার এটা! এ কারণেই তিনি কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।'
(সূরা বাকারা : ২২২)

আরেকটি হাদীসে আছে, 'যে বান্দা প্রকৃত তাওবা করে এবং ইয়া রব (হে প্রভু) বলে আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ তাআলা এতে অত্যন্ত খুশি হন এবং তার আহ্বানের উত্তরে লাব্বাইকা ইয়া আবদী (ওহে আমার বান্দা, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছি!) বলেন।'

আরেক হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, এক মুসাফির উটনীর পিঠে চড়ে মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছিল। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে এক স্থানে ঘুমিয়ে গেল। ঘুম থেকে জেগে দেখতে পেল, মালসামানসহ উটনীটি গায়েব হয়ে গেছে। অনেক খুঁজেও সে উটনীর খোঁজ পেল না। সে নিশ্চিত হয়ে গেল যে, ক্ষুৎ-পিপাসায় ছটফট করতে করতে এখানেই তার মৃত্যু হবে। নিতান্ত পেরেশান ও বিষণ্ন মনে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। চোখ খুলে দেখতে পেল, সামানসহ উটনী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে এত খুশি হলো যে, বলতে চাইল– 'হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রতিপালক আর আমি আপনার বান্দা', কিন্তু অত্যধিক খুশিতে উল্টো বলে ফেলল– 'হে আল্লাহ, আপনি আমার বান্দা আর আমি আপনার প্রতিপালক'।

এ ব্যক্তি উট ফিরে পেয়ে যত খুশি হয়েছিল, তাওবাকারী ব্যক্তির উপর আল্লাহ তাআলা এরচেয়ে বেশি খুশি হন। আল্লাহু আকবার!

তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা এত খুশি হন, তাই আমাদের কর্তব্য হলো, আজকের এই মজলিসেই আমরা আমাদের গুনাহের জন্য খাঁটি তাওবা করব।

## তাওবার নিয়ত করে নিন

হযরত শুয়াইব আ. তাঁর গোত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন–

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿۹۰﴾

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, এরপর তাওবা করো। নিশ্চয় আমার রব মহাদয়ালু ও অতি স্নেহময়।' (সূরা হুদ : ৯০)

সুতরাং আমরা তাওবা করলেও আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন। আমাদেরকেও তিনি মহব্বত করবেন। ভাইয়েরা, নিজেদের গুনাহের ব্যাপারে খাঁটি তাওবা করে ভবিষ্যতে গুনাহমুক্ত জীবনযাপনের নিয়ত করে নিই। এ তো আল্লাহর মহা অনুগ্রহ। পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা গুনাহ করলে তাদের ঘরের দরজায় লিখে দেয়া হত যে, এ ব্যক্তি পাপিষ্ঠ! আমাদের রাসূল সা. বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ হওয়ায় দরজায় লিখে দেয়ার শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছি আমরা। তবে চেহারায় লিখে দেয়ার শাস্তি এখনো বহাল আছে। কোনো ব্যক্তি পাপ করলে আল্লাহ তাআলা তার চেহারায় তা লিখে দেন। যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তারা এ লেখা পড়তে পারেন। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকেও এমন দৃষ্টি দান করেন, যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের চেহারায় গুনাহের অশুভ ছাপ দেখতে পাব!

## নবীগণের ক্ষেত্রে আল্লাহর পরাক্রমশালিতা

আমাদের কর্তব্য হলো- আমরা আল্লাহ তাআলার পরাক্রমশালিতার কথা মাথায় রেখে চিন্তা করব, আমরা কোন সত্তার নাফরমানি করছি? আমরা কত বড় ভুল করে ফেলেছি! কত মারাত্মক অপরাধ করে ফেলেছি! মহান আল্লাহ তো এমন সত্তা, যার সামনে নবীগণের বুকও কাঁপত। নবীগণ গুনাহ থেকে পবিত্র হন, অথচ তাদের ব্যাপারেই কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا

خٰشِعِيْنَ ﴿۹۰﴾

'নিশ্চয় তারা সৎকর্মে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতেন, আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতেন এবং তারা ছিলেন আমার কাছে বিনয়াবনত।'
(সূরা আম্বিয়া : ৯০)

এমন নবীগণের কাহিনী দেখুন, আল্লাহ তাআলা তাঁদের সাথেও কীভাবে আপন অমুখাপেক্ষিতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মনোযোগ সহকারে লক্ষ করুন–

* হযরত আদম আ. এর ছোট্ট একটি ভুলের কারণে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে জমিনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর তিনি মহান প্রতিপালকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এভাবে–

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۲۳﴾

'হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'
(সূরা আ'রাফ : ২৩)

* আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আ. কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর পরিবারকে তুফানের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবেন। এরপর হযরত নূহ আ. এর পুত্র তাঁর সামনেই পানিতে ডুবে যেতে লাগল। কুরআনের বর্ণনা–

وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿۴۳﴾

'এমন সময় তাদের দুজনের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল। ফলে সে নিমজ্জিত হলো।' (সূরা হূদ : ৪৩)

এরপর হযরত নূহ আ. আবেদন জানালেন–

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۴۵﴾

'আর নূহ আ. তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বললেন– হে আমার প্রতিপালক, আমার ছেলে তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত; আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনি সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।'
(সূরা হূদ : ৪৫)

মহান আল্লাহ উত্তরে বললেন–

يٰنُوۡحُ اِنَّهٗ لَيۡسَ مِنۡ اَهۡلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيۡرُ صَالِحٍ ٭ۖ فَلَا تَسۡـَٔلۡنِ مَا لَـيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ اِنِّىۡۤ اَعِظُكَ اَنۡ تَكُوۡنَ مِنَ الۡجٰهِلِيۡنَ ﴿۴۶﴾

'হে নূহ, নিশ্চয় সে আপনার পরিজনভুক্ত নয়। সে তো দুরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন আবেদন করবেন না, যার ব্যাপারে আপনার জ্ঞান নেই। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না।'

(সূরা হুদ : ৪৬)

হযরত নূহ আ. সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বললেন–

رَبِّ اِنِّىۡۤ اَعُوۡذُ بِكَ اَنۡ اَسۡـَٔلَكَ مَا لَـيۡسَ لِىۡ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ وَاِلَّا تَغۡفِرۡ لِىۡ وَتَرۡحَمۡنِىۡۤ اَكُنۡ مِّنَ الۡخٰسِرِيۡنَ ﴿۴۷﴾

'হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে, যার ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং অনুগ্রহ না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

(সূরা হুদ : ৪৭)

নবীগণের স্তর এত উর্ধ্বে যে, তাঁরা আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাক্রম সম্পর্কে অবগত এবং তাঁর অমুখাপেক্ষিতার ব্যাপারে জানেন। এ কারণে সব সময় ভয় পেতেন যে, কখনো প্রতিপালকের সুদৃষ্টি সরে গেলে না জানি কী পরিণাম হয়! কয়েকটি কাহিনী দেখুন :

* হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর গোত্রকে শুধু এতটুকু বলেছিলেন যে, 'আমি অসুস্থ, তোমাদের সাথে যেতে পারব না'। এর কারণে তিনি ভীত ছিলেন। কেয়ামতের দিন তিনি আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে অস্বীকার করে বলবেন, 'না না, আমি আল্লাহর সামনে যেতে পারব না। আমাকে না আবার জিজ্ঞেস করে বসেন!'

* হযরত মুসা আ. একজনকে চড় দেয়ায় সে মরে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমাও করে দিয়েছেন। তবুও তিনি কেয়ামতের দিন বলবেন, 'আমি আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে পারব না। তাঁর পরাক্রমকে আমি ভয় করি।'

* হযরত ইয়াকুব আ. এর বিরহ-বেদনার কাহিনী দেখুন। তাঁর ফুলের মতো সুন্দর ছেলে হযরত ইউসুফ আ. কে আল্লাহ তাআলা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। বিরহে কাঁদতে কাঁদতে হযরত ইয়াকুব আ. এর চোখ সাদা হয়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি হারান তিনি। হযরত ইউসুফ আ. কে আল্লাহ তাআলা ছোট থাকতে কুয়ায় নিক্ষেপ করেন। বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ আ. কে তাঁর ভাইয়েরা সন্ধ্যার সময় কুয়ায় নিক্ষেপ করেছিল। এর একটু পরেই চারদিকে রাতের আঁধার ছেয়ে যায়। এ কারণেই তাঁর ভাইয়েরা বাবার কাছে যখন ফিরে আসে তখন এশার সময় ছিল। কুরআনের বিবরণ–

وَجَآءُوٓا۟ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

'তারা তাদের পিতার কাছে এশার সময় কাঁদতে কাঁদতে এল।'

(সূরা ইউসুফ : ১৬)

হযরত ইউসুফ আ. ছোট ছিলেন, শিশু ছিলেন, একদম একাকী ছিলেন। আঁধারের কারণে ভয় পাচ্ছিলেন। সাহরীর সময় অল্প অল্প আলো নজরে এলে হযরত ইউসুফ আ. আশান্বিত হলেন যে, আঁধার রাত শেষে ভোরের আলো ফুটে উঠলে কুয়া থেকে মুক্তির উপায় হতে পারে। তখন তিনি দুআ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমার মুসিবত দূর করে দিন এবং যত মানুষ যত মুসিবতে আক্রান্ত, সবার সমস্যা দূর করে দিন!'

আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আ. এর দুআ এমন কবুল করেছেন যে, তাহাজ্জুদের সময় অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থতার প্রকোপ কমে যায়; পেরেশান ব্যক্তির পেরেশানি কমে যায়। সুবহে সাদিকের সময় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বান্দার দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-পেরেশানি-দুশ্চিন্তা দূরীভূত করে তার অন্তরে প্রশান্তি দান করেন।

আল্লাহর কী মহিমা!

* হযরত যাকারিয়া আ. আল্লাহর নবী ছিলেন। শয়তান লোকেরা তার মাথায় করাত চালিয়ে তাঁকে শহীদ করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর পরাক্রম এভাবে দেখান যে, নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মাথায় করাত চালানো হয় এবং তাঁর পবিত্র শরীরকে দুই টুকরো করে দেয়া হয়।

* হযরত ইয়াহইয়া আ. কে গলা কেটে শহীদ করা হয়।

* হযরত ইউনুস আ. কে ১৮ দিন মাছের পেটে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

এই হলো আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষিতা! নবীগণের মতো নিষ্পাপ ব্যক্তিদের সাথেও যদি আল্লাহ এমন কঠোর ব্যবহার করতে পারেন, তবে আমরা কোন ছার! আমরা তো বড় বড় গুনাহ করি এবং বারংবার করি! তিনি যদি আমাদের দিকেও পরাক্রমপূর্ণ কঠোর দৃষ্টি দেন, তবে আমাদের কী হাল হবে? (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন!)

তাই প্রকৃত তাওবা করার এখনি সময়। আল্লাহ তাআলা এত অমুখাপেক্ষী যে, বনী ইসরাইলের এক ইবাদতকারীর ঘটনা আছে, তার নাম ছিল বালআম বাউরা। তিনি পাঁচশ বছর আল্লাহর ইবাদত করেছিলেন। তার দুআ কবুল হত। একটিমাত্র ভুল হওয়ামাত্রই আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন–

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

'অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদশনের বদৌলতে। কিন্তু সে অধঃপতিত হলো এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো; যদি তাকে তাড়া করো তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে।'

(সূরা আ'রাফ : ১৭৬)

ভাবছি, যত কিছুই হোক, তিনি তো পাঁচশ বছর ইবাদত করেছিলেন, সেজদা করেছিলেন। এত ইবাদতের পরও তার ব্যাপারে বলা হয়েছে– তার উদাহরণ হলো কুকুরের মতো। আমাদের এই ইবাদতও নেই, সেজদাও নেই, আমাদের অবস্থা কী হবে?

## এখনি তাওবা করে নিন!

এখনি সময়! আমরা আজই আমাদের গুনাহ থেকে প্রকৃত তাওবা করে নিব এবং আমাদের পালনকর্তাকে সন্তুষ্ট করব।

প্রিয় বন্ধুগণ!

আমরা আমাদের প্রতিপালকের দরবারে হাত পেতে রোনাজারি করে ক্ষমাপ্রার্থনা করব যে, 'হে আল্লাহ, আমরা যা গুনাহ করেছি সব মাফ করে

দিন! হয়তো স্বেচ্ছায় করেছি, হয়তো ভুলে করেছি, কিন্তু আপনি তো মহাদয়ালু! আমাদের উপরও দয়া করুন!

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي

ورحمتك أرجى عندي من عملي.

'হে আল্লাহ, আপনার মাগফেরাত ও ক্ষমা আমার গুনাহ থেকে অনেক প্রশস্ত এবং আমার আমলের চেয়ে বেশি আশা রাখি আপনার রহমতের ব্যাপারে।'

হে আল্লাহ, আমাদের আমলের উপর আমাদের ভরসা নেই, আপনার রহমতের প্রতি ভরসা বেশি! আপনি আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন!
আয় আল্লাহ, আপনার বান্দাদেরকে মাফ করে দিন!
দয়ালু আল্লাহ, আমরা আজ আপনার দরবারে মাথা ঝুঁকাচ্ছি। স্বীকার করছি, আমরা অনেক গুনাহ করেছি, কিন্তু আপনি দয়া করে তাওবা কবুল করে নিন!'

এক বুযুর্গের কাছে এক বৃদ্ধ তাওবা করতে এল। বুযুর্গ তাকে বললেন, 'তুমি আসতে অনেক দেরি করে ফেলেছ!'
বৃদ্ধ উত্তরে বলল– আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, এরপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে।"
(সূরা নিসা : ১৭)

কুপ্রবৃত্তি প্রবল হলে মানুষের আকল-বুদ্ধির উপর আবরণ পড়ে যায়। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন– মানুষ রাগান্বিত হলে তার বিবেক-বুদ্ধির উপর পর্দা পড়ে যায়। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিও মূর্খ হয়ে যায়।

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, উক্ত আয়াতে 'অনতিবিলম্বে'-এর অর্থ হলো- এমন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বেই তাওবা করে নেয়।

তো ঐ বৃদ্ধ এ আয়াত তেলাওয়াত করে বলল, 'আমার প্রতিপালক বলেছেন, মৃত্যুর আগে তাওবা করা মানে অনতিবিলম্বে তাওবা করা, দেরিতে করা নয়। তো আমার আসতে দেরি হলো কোথায়?'
বুড়ো অতি সত্য কথাই বলেছে।

হে আল্লাহ, আজকের এই মাহফিলে আমরা সুস্থ চিত্তে আপনার সাথে সন্ধি করছি, আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনার নেক বান্দাদের এই মাহফিল থেকে আমাদেরকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিবেন না!

দয়ালু প্রতিপালক! এখানে আমরা অনেক মানুষ মিলে মুনাজাত করছি; নেককারদের উসিলায় আমাদের মতো গুনাহগারদের তাওবাও কবুল করে নিন! মাওলা আমার! আমরা তো ফেরআউনের যাদুকরদের চেয়ে বেশি পাপিষ্ঠ নই, তারা যাদুকর ছিল, আমরা যাদু শিখিওনি; আপনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন, আমাদের প্রতিও অনুগ্রহ করুন।

হে আল্লাহ! আসহাবে কাহ্ফের কুকুরের চেয়ে মন্দ পরিণতি যেন না হয় আমাদের! ঐ কুকুরকে তো জান্নাত দেয়ার ওয়াদা করেছেন, আমাদেরকে জান্নাত থেকে মাহরুম করবেন না!

আমার মাওলা! তুর পর্বতের এক গাছে আপনার তাজাল্লী পড়েছিল, তখন সেই গাছ থেকে আপনার তাজাল্লীর উদ্ভাস ঘটেছিল। হে আল্লাহ, আমাদেরকে অন্তত সেই পাথরের মতো বানিয়ে দিন এবং আমাদের অন্তরের পাথরের প্রতিও আপনি দৃষ্টিপাত করুন।

হে আল্লাহ, যে খেজুর কাণ্ড রাসূল সা. এর মহব্বতে কেঁদেছিল, আমাদেরকে তারচেয়ে অনুভূতিহীন বানাবেন না। আমরা যেন প্রিয় নবীজির প্রতি ভালোবাসাশূন্য জীবন না কাটাই। আমাদের উপর রহমত নাযিল করুন। আজ এখনি আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিন!

হে আল্লাহ, আমাদের গুনাহ মাফ করে আমাদের তাওবা কবুল করে নিন।

হে আল্লাহ, আমরা খাঁটি তাওবা করছি, তাওবা কবুল করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। মাওলা আমার! আমরা শুধু আপনার দুয়ার চিনি, এছাড়া তো কোনো দুয়ার নেই!

হে আল্লাহ, এক বৃদ্ধ ও অন্ধ ভিক্ষুক একবার লোকদের দরজায় দরজায় হাত পেতে মসজিদের দরজায় পৌঁছে গেল। বারবার করাঘাত করা সত্ত্বেও কেউ জবাব দিল না। সে বলে উঠল, 'কোন কৃপণের বাড়ি এটা, উত্তর দেয় না?'

লোকেরা তাকে বলল, 'এটা মসজিদ, আল্লাহর ঘর।'

এ কথা শুনে অন্ধ লোকটি তার পাত্র ভেঙ্গে ফেলল এবং বলল, ‘আমি এখন আমার প্রতিপালকের দুয়ারে এসে গেছি। এখন আর অন্য কারো কাছে চাওয়ার প্রয়োজন নেই।’

হে আল্লাহ, আজ আমরাও আপনার দুয়ারে এসে গেছি। আমরা আর কারো প্রতি চোখ তুলেও তাকাব না। শুধু আপনার বড়ত্বই দেখব। আমরা আমাদের গুনাহের কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

হে আল্লাহ, মেহেরবানি করে আমাদের দুআ ও তাওবা কবুল করে নিন এবং আজ আমাদেরকে এক নতুন জীবন দান করুন।

﴿وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً.

(سورة النحل : ٩٧)

বয়ান- ৪ :

# ফিকহ ও তাসাওউফের ভিত্তি

## فقہ اور تصوف کی بنیاد

বয়ান : শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী হাফিযাহুল্লাহ
তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।
স্থান : যয়নব জামে মসজিদ, মা'আদুল ফকীর আল ইসলামী, ঝাঙ্গ।
উপলক্ষ্য : একাদশ বার্ষিক তরবিয়তি নকশবন্দী ইজতেমা।

## চয়নিকা

তাসাওউফ কোনো অনারবি বস্তু নয়, খাঁটি আরবের বস্তু। কুরআন মাজীদে একে তাযকিয়া ও ইহসান নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যুগের আবর্তনে উলামায়ে কেরাম ইসলাম ধর্মের প্রতিটি শাস্ত্রকে সুবিন্যস্ত করেছেন। তখন এর নাম তাসাওউফ হয়ে গেছে। এর উদাহরণ হলো ফিকহ শাস্ত্র। রাসূল সা. এর ইন্তেকালের পর ফুকাহায়ে কেরাম কুরআন-হাদীস থেকে ফিকহ শাস্ত্র সংকলন করেছেন। ফিকহ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হলো- আমরা দৈনন্দিন যা করে থাকি বা করার প্রয়োজন হতে পারে। সাগর সেঁচে মুক্তা বের করার মতো ফুকাহায়ে কেরাম কুরআন-হাদীস থেকে ফিকহের মাসায়েল (যা হীরে-মোতি-পান্নার চেয়েও দামি) উদ্ভাবন করেছেন। সুতরাং ফকীহগণ কোনো নতুন বস্তু আবিষ্কার করেননি, বরং তাঁরা শরীয়তের কথাই বলেছেন।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ:

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً .

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ.

## তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধির মেহনত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً.

'যে সৎকর্ম করে এবং সে মুমিন, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম (ও পবিত্র) জীবন দান করব।'

(সূরা নাহল : ৯৭)

প্রত্যেক মানুষের আকাঙ্ক্ষা হলো- সে সুন্দর, পবিত্র ও উত্তম জীবন লাভ করবে। আল্লাহর বাণী অনুযায়ী এমন জীবন লাভ করতে হলে নেক কাজ ও সৎকর্ম করতে হবে। নেক কাজ করার জন্য মানুষের অন্তরে এর প্রতি এত বেশি আগ্রহ তৈরি হতে হবে যে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেভাবে পানির খোঁজে ছুটতে থাকে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেভাবে খাবারের খোঁজে থাকে, তেমনি সে নেক কাজের উপায় খুঁজতে থাকবে। নেক কাজের প্রতি এমন আগ্রহ তৈরি করতে মেহনত ও সাধনা প্রয়োজন। এই সাধনার নামই তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি।

## বায়আতের উদ্দেশ্য

পীর সাহেব যে বায়আত করেন তার উদ্দেশ্যও এমন থাকে যে, মুরীদ মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করে– 'আমি শায়খের কথা মেনে চলব তাঁর সব কথার

পরিপূর্ণ অনুসরণ করব।' আর পীর সাহেব এ প্রতিজ্ঞা করেন– 'আমি নিষ্ঠার সাথে মুরীদের নেগরানি করব এবং তাকে সঠিক পরামর্শ দিব।'
বায়আত মূলত শায়খ ও মুরীদের মাঝে এক ধরনের প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার। এরপর শায়খের দায়িত্ব হয়– তিনি মুরীদের জন্য নির্ধারণ করে দিবেন যে, কোন কোন আমলের মাধ্যমে তার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হবে।

## ভাবনার বিষয়

একটি কথা বুঝতে হবে। শায়খরা যে সকল আমলের কথা বলে থাকেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মুরাকাবা ও ধ্যান, দুরুদ শরীফ, ইসতেগফার, কুরআন তেলাওয়াত ও শায়খের সোহবত। এতে নামাযের উল্লেখই নেই। সাধারণ মানুষ এ কথা জেনে বিস্মিত হয় যে, এত নসিহত করা হয়, এত আমলের কথা বলা হয়, কিন্তু নামাযের কথা বলাই হয় না। তাই এ বিষয়টি বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানো যাক। কেউ অসুস্থ হলে ডাক্তাররা ওষুধ খেতে দেন। ওষুধের উদ্দেশ্য তার খাবারের চাহিদা মেটানো নয়। ওষুধ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো- তাকে সুস্থ করে তোলা। কারণ সুস্থ হলে তার খিদে পাবে, এরপর সে নিজে নিজেই খাবে। তো পীর সাহেবদের দেয়া এ সকল আমলও এমন। আমলগুলো পালন করলে মানুষের অভ্যন্তরীণ রোগ দূর হয়ে সে রূহানিভাবে সুস্থতা লাভ করে। এরপর সে নিজে নিজেই নেক কাজ করতে আগ্রহী হয়। শুধু নামাযই নয়, বরং দীনের প্রতিটি বিষয়ের উপর আমল করতে সে প্রস্তুত হয়ে যায়।

## শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত

এক্ষেত্রে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয় : শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত।
*** শরীয়ত :** এমন কাজ-কর্মকে বলা হয়, মুমিনরা যা করতে আদিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ একজন মানুষের জন্য পালনীয় বিধি-বিধানের সমষ্টিকে শরীয়ত বলা হয়। আমাদের মাশায়েখ একে معرفة النفس ما لها وما عليها বলেন।
*** তরীকত :** অভ্যন্তরীণ আমলের উপর দৃঢ়তা অর্জনের পদ্ধতিকে তরীকত বলে।

*** হাকীকত :** যখন মানুষের হৃদয় পরিচ্ছন্ন হয়, তার প্রতি আল্লাহর রহমত ও নূর বর্ষিত হয়, সে দূরদর্শিতা লাভ করে এবং ঈমানের নূরের স্বাদ লাভ করে, তখন আত্মার পরিশুদ্ধতার কারণে তার কাছে যে সকল অবস্থা প্রকাশিত হয়, তাকেই হাকীকত বলে।

## তাসাওউফ শাস্ত্র কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ভাবিত

তাসাওউফ কোনো অনারবি বস্তু নয়, খাঁটি আরবের বস্তু। কুরআন মাজীদে একে তাযকিয়া ও ইহসান নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যুগের আবর্তনে উলামায়ে কেরাম ইসলাম ধর্মের প্রতিটি শাস্ত্রকে সুবিন্যস্ত করেছেন। তখন এর নাম তাসাওউফ হয়ে গেছে। এর উদাহরণ হলো ফিকহ শাস্ত্র। রাসূল সা. এর ইন্তেকালের পর ফুকাহায়ে কেরাম কুরআন-হাদীস থেকে ফিকহ শাস্ত্র সংকলন করেছেন। ফিকহ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হলো- আমরা দৈনন্দিন যা করে থাকি বা করার প্রয়োজন হতে পারে। সাগর সেঁচে মুক্তা বের করার মতো ফুকাহায়ে কেরাম কুরআন-হাদীস থেকে ফিকহের মাসায়েল (যা হীরে-মোতি-পান্নার চেয়েও দামি) উদ্ভাবন করেছেন। সুতরাং ফকীহগণ কোনো নতুন বস্তু আবিষ্কার করেননি, বরং তাঁরা শরীয়তের কথাই বলেছেন। কোনো কিছু বানানো ও কোনো কিছু বর্ণনা করার মধ্যে বিস্তর তফাত রয়েছে। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছুই বানাননি। যে সব হীরে-মোতি শরীয়তে বিদ্যমান ছিল এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে যার স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব ছিল না, তারা সে সব বিষয়কে পরবর্তী লোকদের জন্য একত্র করে গেছেন। এর ফলে চার মাযহাব তৈরি হয়। ফিকহ শাস্ত্র ও হাদীস শাস্ত্র সংকলিত ও বিন্যস্ত হতে সময় লেগেছে, এক সময় তা যেন রান্নাকৃত বস্তুর মতো সুপ্রস্তুত হয়ে গেল; পরবর্তী যুগের লোকদের কাজ ছিল তা আহরণ করা। তাসাওউফের বিষয়টিও এমন। সে যুগের শায়খগণ তাসাওউফের পরিভাষা ও মূলনীতিসমূহকে কুরআন-হাদীসের আলোকে সংগ্রহ করে সুবিন্যস্ত আকার দিয়েছেন। এভাবে তাসাওউফের চারটি সিলসিলা তৈরি হয়েছে।

## ফিকহ্ শাস্ত্রের উদ্ভাবন

আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী। এ মাযহাবের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর হাতে। তাই এ মাযহাবকে তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত করে হানাফী বলা হয়।

## হযরত ইবনে মাসউদ রা. হলেন বীজ বপনকারী

দুররে মুখতার ও তহাবী শরীফসহ আকাবিরদের বিভিন্ন গ্রন্থে একটা কথা আছে :

قَدْ قَالُوا : اَلْفِقْهُ زَرَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﷺ

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ফিকহ শাস্ত্রের বীজ বপন করেছেন।'

বীজ বপন করার অর্থ হলো–

أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِاسْتِنْبَاطِ فُرُوعِهِ

অর্থাৎ শরীয়তের যে সকল মূলনীতি বিদ্যমান ছিল, তা থেকে শাখাগত মাসায়েল ও বিধি-বিধান উদ্ভাবন করা।

**উদাহরণ :** কুরআন মাজীদে অযুসংক্রান্ত একটি আয়াত রয়েছে। এ আয়াতের তরজমা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়। ফুকাহায়ে কেরাম এ আয়াত থেকে একশর বেশি মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।

মদীনার এক ছোট বালক। উমাইর তার নাম। সে একটি পাখি পালত। পাখিটি একদিন মরে গেল। এতে উমাইর খুব কষ্ট পেল। সে রাসূল সা. এর দরবারে এলে তিনি স্নেহভরে তাকে ডাকতেন। তাঁর প্রতি রাসূল সা. এর সম্ভাষণ ছিল এমন–

يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟

'হে আবু উমাইর, তোমার পাখিটির কী হয়েছে?'

(সহীহ বুখারী : নং ৬১২৯)

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, 'রাসূল সা. এর উক্ত বাক্য থেকে আমি চল্লিশটি মাসআলা উদ্ভাবন করেছি। যেমন- শিশুদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের নিয়ম, তাদেরকে কেমন উপনামে ডাকা যাবে ইত্যাদি।'

এই একটিমাত্র ছোট্ট বাক্য থেকে তিনি চল্লিশটি মাসআলার সমাধান বের করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

মূলত মুজতাহিদ ইমামগণ এমন মানুষ ছিলেন, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা দীনের ব্যাপারে উন্মুক্ত ও বিকশিত করে দিয়েছিলেন এবং অন্তর্দৃষ্টির নূর দান করেছিলেন। ফলে তাঁরা শরীয়তকে সুবিন্যস্ত করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। একে 'তাদবীন' বলা হয়। যার অর্থ- কোনো কিছু উদ্ভাবন করা, সুবিন্যস্ত করা ও সংকলন করা।

## হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর ইলমি অবস্থান

রাসূল সা. এর সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ইলমের বিবেচনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন ষষ্ঠতম মুসলমান। রাসূল সা. এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। তাঁর পায়ের গোড়ালি সরু ছিল। দেখতে অনেকটা কৃশকায় ছিলেন। ইলমের বিবেচনায় বিশাল বড় হলেও শরীর-স্বাস্থ্যের বিবেচনায় তেমন ছিলেন না (তিনি بسطة في العلم হলেও بسطة في الجسم ছিলেন না!) বর্তমান যুগের আলেম ও তালিবে ইলমরা ইলমের বিবেচনায় যেমনই হন না কেন, স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে বিরাট হন। কেউ দেখলে ভাবে- নিশ্চয় বড় কোনো আলেম তিনি। তো হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর সরু গোড়ালি দেখে সাহাবীরা অনেক সময় মুচকি হাসতেন। বিষয়টি একদিন রাসূল সা. এর চোখে পড়ল। তিনি বললেন, 'ইবনে মাসউদের সরু গোড়ালি দেখে হেসো না! কেয়ামতের দিন তার গোড়ালি দাঁড়িপাল্লায় উহুদ পাহাড়ের চেয়েও ভারী হবে।'

তিনি সেই সাহাবী, যিনি আবু জাহলের গলা দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। দুই কিশোর আবু জাহলকে ভূপাতিত করেছিল, কিন্তু তাদের গায়ে এত জোর ছিল না যে, তার মাথা কাটতে পারবে। এ ফযিলত আল্লাহ তাআলা হযরত ইবনে মাসউদ রা. কে দান করেছিলেন।

তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন।

ইবনুল কাইয়িম রহ. লেখেন-

সাহাবায়ে কেরামের মোট সংখ্যা এক লাখ চব্বিশ হাজার। তাঁদের মধ্যে উনপঞ্চাশজন ছিলেন ফকীহ ও ফিকহ শাস্ত্রে পারদর্শী। কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন হলে অন্য সাহাবীরা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতেন। মোটকথা, তাঁরা অন্যদের তুলনায় বড় আলেম ছিলেন। এ একশ উনপঞ্চাশজনের মধ্যে

চৌদ্দজন ছিলেন তাঁদের ভেতর সেরা আলেম। এ চৌদ্দজনের কারো বক্তব্য সামনে এলে অন্যরা নিজেদের মত থেকে ফিরে আসতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা রা.ও ছিলেন। উক্ত চৌদ্দজনের মধ্যে ছয়জন ছিলেন অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। সেই ছয়জন হলেন–

হযরত উমর রা., হযরত আলী রা., হযরত উবাই বিন কা'ব রা., হযরত যায়দ বিন সাবেত রা., হযরত আবু দারদা রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.।

কিছু ফকীহ লিখেছেন, এ ছয়জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম হলেন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত আলী রা.।

রাসূল সা. এর সকল ইলম সাহাবায়ে কেরাম অর্জন করেছেন আর সাহাবীদের মধ্যে এ দুজনকে আল্লাহ তাআলা বিশেষত্ব দান করেছেন।

তো ফিকহে হানাফীর বীজ বপনকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এত বড় আলেম ছিলেন।

## পানি সিঞ্চন করেছেন আলকামা রহ.

আকাবিরদের গ্রন্থে এরপর আছে– وَسَقَاهُ عَلْقَمَةُ

অর্থাৎ আলকামা রহ. তাতে পানি সিঞ্চন করেছেন।

হযরত আলকামা রহ. একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী। তবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন মহানবী সা. এর জীবদ্দশায়। ছোট থাকায় সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। তিনি আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. এর কাছ থেকে অনেক ইলম শিক্ষা করেছেন।

পানি সিঞ্চনের উদ্দেশ্য হলো- أَيَّدَهُ وَوَضَّحَهُ

'তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর কর্মকে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট করেছেন।'

## ফসল কর্তন করেছেন ইবরাহীম নাখায়ী রহ.

এরপর বলেন–

وَحَصَدَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ

'ইবরাহীম নাখায়ী রহ. সেই ফসল কর্তন করেছেন।'

ফসল তো এমনি হয় যে, একজন বীজ বপন করে, এরপর পানি সিঞ্চন করা হয়। ফসল পাকার পর কেউ তা কর্তন করে। তো ইবরাহীম নাখায়ী রহ. ফিকহের ফসল কর্তন করেছেন।

তিনি আলকামা রহ. এর ভাগ্নে। তিনি যেন তাঁর মামার সব ইলম অর্জন করেছিলেন।

حصده শব্দের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম লিখেছেন–

جَمَعَ مَا تَفَرَّقَ مِنْ فَوَائِدِهِ وَنَوَادِرِهِ

'আলকামা রহ. যা কিছু করেছেন, সেই বিচ্ছিন্ন কর্মকে তিনি একত্র করেছেন।'

ফলে তিনি যেন অনেকটা ফসল কর্তন করেছেন।

## ফসল মাড়াই করেছেন হাম্মাদ রহ.

এরপর আছে–

وَدَاسَهُ حَمَّادٌ

'হাম্মাদ রহ. সেই ফসলকে মাড়াই করেছেন। মাড়ানো বলা হয়- শস্যকে ভুসি থেকে পৃথক করা। যেমন- গমকে মেশিনের মাধ্যমে মাড়াই করা হলে গমের দানা ও ভুসি পৃথক হয়ে যায়।

তো ফিকহের ফসল কর্তনের পর মাড়াইয়ের কাজ করেছেন হাম্মাদ রহ.।

মাড়াইয়ের অর্থ হলো-

اجْتَهَدَ فِي تَنْقِيحِهِ وَتَوْضِيحِهِ

'একে সুস্পষ্টকরণ ও পরিমার্জনে তিনি ইজতিহাদ ও পরিশ্রম করেছেন।'

হাম্মাদ বিন মুসলিম রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর উসতাদ ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন– তিনি আমাকে এত মহব্বত করতেন যে, বলার মতো নয়। একটা কাহিনী বললে মহব্বতের পরিমাণ স্পষ্ট হবে। একবার তিনি সফর থেকে ফিরে এলে তাঁর ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'আব্বাজান, আপনার কি সফরে কারো কথা মনে পড়েছে?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, নুমান (আবু হানীফা রহ.)-এর কথা মনে পড়েছে।'

আপন পুত্রের চেয়ে সুযোগ্য শাগরেদ তাঁর কাছে বেশি প্রিয় ছিলেন। কারণ একজন হলো ঔরসজাত সন্তান, অপরজন রূহানি সন্তান। রূহানি সন্তানরা ঔরসজাত সন্তানের চেয়ে কম প্রিয় হয় না।

অবশ্য উসতাদের এমন সুদৃষ্টি ও মহব্বত লাভের জন্যও তেমন শিষ্য হতে হয়। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন-

مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً إِلَّا اسْتَغْفَرْتُ لَهُ مَعَ وَالِدَيَّ

'আমি প্রতিবার নামায আদায়ের সময় পিতা-মাতার সাথে আমার এ উসতাদের জন্যও ক্ষমাপ্রার্থনা করেছি।'

তাঁরা কেমন প্রকৃত শিষ্য ছিলেন যে, এমন কোনো মুনাজাত করেননি, যাতে উসতাদের জন্য দুআ করতে ভুলে গেছেন।

## পিষেছেন ইমাম আবু হানীফা রহ.

এরপর আছে–

وَطَحَنَهُ أَبُو حَنِيفَةَ

'আবু হানীফা রহ. তা পিষেছেন।'

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মূল নাম নুমান। তাঁর দাদা ইসমাঈল নিজ ছেলে সাবেতকে নিয়ে হযরত আলী রা. এর কাছে দুআ নিতে যান। হযরত আলী রা. তাকে দুআ দেন। এ দুআর বরকতে আল্লাহ তাআলা তাকে একটি পুত্রসন্তান দান করেন। সেই পুত্রই হলেন ইমাম আবু হানীফা রহ.।

طحنه শব্দের অর্থ হলো- তিনি পিষেছেন। পেষণ করা মোটেও সহজ কাজ নয়। আলেমরা এর উদ্দেশ্য লিখেছেন–

أَكْثَرَ أُصُولَهُ وَفَرَّعَ فُرُوعَهُ وَأَوْضَحَ سُبُلَهُ

'তিনি ফিকহের মূলনীতি বর্ধিত করেছেন (ও তাকে একত্র করেছেন), শাখাগত মাসআলায় বৃদ্ধি করেছেন এবং এ পথকে সুস্পষ্ট করেছেন।'

তাঁর ব্যাপারে বলা হয়–

فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ وَرَتَّبَهُ أَبْوَابًا وَكُتُبًا عَلَى نَحْوِ مَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ

'তিনিই সর্বপ্রথম ফিকহ শাস্ত্র উদ্ভাবনকারী। তিনি ফিকহ শাস্ত্রকে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন; বর্তমানে যেভাবে আছে।'

যেমন কিতাবুল ইলম, কিতাবুল ঈমান, কিতাবুত তাহারাহ ইত্যাদি। তাঁর বিন্যাস এত চমৎকার ছিল যে, আজ পর্যন্ত তা বহাল আছে।

## ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ইলমি অবস্থান

আল্লাহ তাআলা তাঁকে বর্ণনাতীত ইলম দান করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন–

مَنْ أَرَادَ الْفِقْهَ فَلْيَلْزَمْ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ

'যে ব্যক্তি ফিকহের ইলম অর্জন করতে চায়, সে যেন আবু হানীফা রহ. এর সঙ্গীদের সাহচর্যে থাকে।'

(রদ্দুল মুহতার : ১/১১৮)

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মত উল্লেখ করার কারণ হলো- যে ব্যক্তি কাউকে মানে না সেও ইমাম শাফেয়ী রহ. কে অনেক সম্মানের চোখে দেখে। একবার তিনি কসম খেয়ে বলেন–

وَاللّٰهِ مَا صِرْتُ فَقِيهًا إِلَّا بِكُتُبِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ বিন হাসানের কিতাব পাঠ করেই আমি ফকীহ হয়েছি!'

(রদ্দুল মুহতার : ১/১১৮)

মুহাম্মাদ রহ. হলেন ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শিষ্য। তাঁর কিতাব পাঠ করেই যদি ইমাম শাফেয়ী রহ. ফকীহ হয়ে থাকেন, তবে উসতাদের ইলমের পরিমাণ কেমন হবে!

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে সে যুগের একজন বড় আলেম লিখেছেন—

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ : رَأَيْت مُحَمَّدًا فِي الْمَنَامِ فَقُلْت لَهُ : مَا فَعَلَ اللَّهُ بِك ؟ فَقَالَ : غَفَرَ لِي ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ أَرَدْت أَنْ أُعَذِّبَك مَا جَعَلْت هَذَا الْعِلْمَ فِيك ، فَقُلْت لَهُ : فَأَيْنَ أَبُو يُوسُفَ ؟ قَالَ : فَوْقَنَا بِدَرَجَتَيْنِ قُلْت : فَأَبُو حَنِيفَةَ ؟ قَالَ : هَيْهَاتَ ، ذَاكَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ.

كَيْفَ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَحَجَّ خَمْسًا وَخَمْسِينَ حَجَّةً، وَرَأَى رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ مِائَةَ مَرَّةٍ-

'ইসমাঈল বিন আবু রাজা বলেন, আমি একবার ইমাম মুহাম্মাদকে স্বপ্নে দেখলাম। তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম– আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন?

তিনি বললেন, তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছেন– আমি তোমাকে আযাব দিতে চাইলে তোমার অন্তরে এ ইলম দিতাম না!

আমি জানতে চাইলাম, ইমাম আবু ইউসুফ কোথায় আছেন?

(ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর সহপাঠী ও সিনিয়র ছিলেন। তিনিও ইমাম আযমের শাগরেদ)

বললেন– তিনি আমাদের চেয়ে দুই স্তর উপরে আছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম আবু হানীফা রহ. কোথায় আছেন?

উত্তর দিলেন– তিনি তো বহু উর্ধ্বে! সীমানা ছাড়িয়ে! সর্বোচ্চ স্তরে আছেন তিনি! কেনই বা থাকবেন না, তিনি তো চল্লিশ বছর এশার অযু দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন; পঞ্চান্নবার হজ পালন করেছেন এবং একশবার আল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছেন!'

(রদ্দুল মুহতার : ১/১২৪-১২৫)

## চল্লিশ বছর এশার অযু দিয়ে ফজরের নামায

যারা কারো কথা মানে না তারা এ তথ্য জেনে বিচলিত হয়। তারা নিজেদের ব্যাপারে বলে– 'আমরা কাউকে মানি না', তাই আমরাও তাদের জন্য এ শব্দ ব্যবহার করছি। তারা আপত্তি করে– 'এটা কীভাবে সম্ভব যে, চল্লিশ বছর এশার অযু দিয়ে ফজর আদায় করেছেন?'

এর উত্তরে প্রথমত বুঝে নিন, মানুষ সাধারণত প্রচলনের ভিত্তিতেই কথা বলে থাকে।

কুরআন মাজীদ থেকে এর উদাহরণ দেখুন। কুরআনে রানী বিলকীসের ব্যাপারে বলা হচ্ছে–

أُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ

'তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে।'

(সূরা নামল : ২২)

যারা কিছু মানে না তারা তো এখানে আপত্তি করবে যে, আচ্ছা, তার কাছে কি রোলস রয়েস গাড়ি ছিল?
তখন তাকে এছাড়া আর কি উত্তর দেয়া যেতে পারে যে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?
এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো- সে যুগের রাজা-বাদশাহদের কাছে যা থাকত, তার কাছেও সে সব বিদ্যমান ছিল।

তো কেউ যদি কুরআনের 'কুল্লু' (كُلِّ) শব্দ দেখে আপত্তি করে যে, এর মানে হলো 'সব'। এর মধ্যে তো সবকিছু অন্তর্ভুক্ত হয়। তো রানী বিলকীসের ঘরে কি এয়ার কন্ডিশনার ছিল?
এর উত্তর তো সেটাই যে, মানুষ কিছু কথা বলে প্রচলনের ভিত্তিতে আর তা গ্রহণযোগ্যও বটে!

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে তাওরাত সম্পর্কে বলছেন-

وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

'তাতে সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ ছিল।'

(সূরা আনআম : ১৫৪)

এখন কোনো ডক্টর যদি আপত্তি তোলে যে, এখানে তো 'কুল্লু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং সবকিছুর বিবরণ তাতে ছিল। তাকে উত্তরে বলতে হবে- আসলে ভাই, তাওরাত ছিল মানুষের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ কিতাব। তাই এ কিতাবে মানুষের হেদায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর কথা বিধৃত হয়েছে। চল্লিশ বছর এশার অযু দিয়ে ফজর আদায়ের বক্তব্যটিও এমন।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি- একজন তালিবে ইলম মাদরাসায় পড়াশোনা শেষ করে কোথাও শিক্ষকতা শুরু করলেন। ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি এ কাজে নিয়োজিত থাকলেন। এমন ব্যক্তির ইন্তেকালের পর আমরা সাধারণত বলে থাকি- তিনি সারা জীবন শিক্ষকতায় কাটিয়ে দিয়েছেন।
এখন কেউ যদি 'সারা জীবন' শব্দটা ধরে বসে যে, তিনি কি একদিনও ছুটি কাটাননি? শুক্রবার কি সবক বন্ধ থাকে না?

তাকে কি উত্তর দেয়া যায়? তাকে শুধু বলা যায়– 'তোমাকে কিছু বলার নেই!'
সুতরাং যারা চল্লিশ বছর এশার অযু দিয়ে ফজর আদায়ের বিষয়টি মানতে চায় না, তাদেরকে এছাড়া আর কী জবাব দেয়া যায়?

মানুষের প্রচলনে 'চল্লিশ বছর' বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাঁর জীবনের নিয়মিত অভ্যাস ছিল এমন। মাঝে কখনো যদি অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে এক-দুই দিন ছুটে যায় তবুও একে নিয়মিত অভ্যাস বলতে সমস্যা নেই।
কেউ বলল, 'অমুক ব্যক্তির পাগড়ি পরিধানের অভ্যাস রয়েছে।'
এর মানে কি এই যে, তিনি কখনো টুপি পরিধান করেননি?
আসলে তা নয়। তার সাধারণ অভ্যাস ছিল পাগড়ি পরিধানের, কখনো প্রয়োজনবশে টুপিও হয়তো পরিধান করেছেন।
এভাবে মানুষের প্রচলন ও ব্যবহার সবার কাছে গ্রহণযোগ্য।

হাদীস শরীফ থেকে এর প্রমাণ দিচ্ছি। হুনাইন যুদ্ধে মুসলমানরা যখন আক্রমণ করতে গেলেন তখন শত্রুরা ওঁৎ পেতে ছিল। হঠাৎ তারা তীর বর্ষণ আরম্ভ করে। এমন অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে মুসলমানরা পিছু হটে গেলেন। তখন রাসূল সা. সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন–

أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

'আমি মিথ্যা নবী নই। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।'
(বুখারী : হাদীস ২৮৬৪)
এখন কেউ যদি আপত্তি করে বসে যে, রাসূল সা. তো আবদুল্লাহর সন্তান ছিলেন, অথচ নাম নিয়েছেন আবদুল মুত্তালিবের। তাকে উত্তর দিতে হবে– মানুষ এভাবে দাদার নাম ব্যবহার করে থাকে।

যাই হোক, আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু হানীফা রহ. কে এমন বরকতময় জীবন দান করেছিলেন যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর ইবাদতের অভ্যাস ছিল এভাবে– এশার পর ইবাদত শুরু করে ফজর পর্যন্ত করতেন।
তিনি জীবনে পঞ্চান্নবার হজব্রত পালন করেছেন এবং একশবার আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বিস্ময়কর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে :

وَفِي حَجَّتِهِ الْأَخِيرَةِ اسْتَأْذَنَ حَجَبَةَ الْكَعْبَةِ بِالدُّخُولِ لَيْلًا فَقَامَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَوَضَعَ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِهَا حَتَّى خَتَمَ نِصْفَ الْقُرْآنِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِهَا حَتَّى خَتَمَ الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ بَكَى وَنَاجَى رَبَّهُ وَقَالَ : إِلَهِي مَا عَبَدَك هَذَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ حَقَّ عِبَادَتِك لَكِنْ عَرَفَك حَقَّ مَعْرِفَتِك، فَهَبْ نُقْصَانَ خِدْمَتِهِ لِكَمَالِ مَعْرِفَتِهِ، فَهَتَفَ هَاتِفٌ مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ عَرَفْتَنَا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ وَخَدَمْتَنَا فَأَحْسَنْتَ الْخِدْمَةَ، قَدْ غَفَرْنَا لَك وَلِمَنْ اتَّبَعَك مِمَّنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِك إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

'তিনি শেষবার হজ করতে গিয়ে বাইতুল্লাহর চাবিরক্ষকের কাছে কাবায় প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। সে দরজা খুলে দিলে তিনি দুই স্তম্ভের মাঝে দাঁড়িয়ে দুই রাকাতে পুরো কুরআন খতম করলেন। প্রথম রাকাতে ডান পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বাম পায়ের ভর ডান পায়ের পিঠে চাপিয়ে দিলেন। এভাবে অর্ধেক কুরআন সমাপ্ত করেন। তারপর রুকু-সেজদা করে উঠে বাম পায়ে ভর দিয়ে ডান পায়ের ভর বাম পায়ের পিঠে চাপিয়ে দিলেন। এভাবে বাকি অর্ধেক তেলাওয়াত করে কুরআন খতম করলেন। সালাম ফেরানোর পর কান্নাকাটি করে মুনাজাত করলেন এবং আপন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বললেন– হে আমার প্রতিপালক! আপনার এ দুর্বল বান্দা আপনার যথাযথ ইবাদত করেনি, তবে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে চিনেছে। সুতরাং তার পরিপূর্ণ পরিচয় লাভের সুবাদে তার ইবাদতের অপূর্ণতা দূর করে দিন!

তখন বাইতুল্লাহর ভেতর থেকে গায়েবি আওয়াজ এল– হে আবু হানীফা, তুমি ভালো করেই আমার পরিচয় লাভ করেছ এবং সুচারুরূপেই আমার খেদমত ও ইবাদত করেছ! তাই আমি তোমাকে এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত তোমার মাযহাবের অনুসারীদের ক্ষমা করে দিলাম।'

(রদ্দুল মুহতার : ১/১২৪)

আলহামদুলিল্লাহ, এ ব্যাপারে আমার সঠিক বুঝ রয়েছে। আসলে যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতের স্বাদ জানে তার জন্য রাত্রি জাগরণ মোটেও কষ্টকর নয়। তাই তো এক আল্লাহপ্রেমী বলেছেন–

ان کی نوزشوں میں تو کوئی کمی نہ تھی
گر کچھ قصور تھا تو شب مختصر کا تھا

'তাঁর অনুগ্রহে তো কোনো কমতি ছিল না,
অপূর্ণতা থাকলে তা একমাত্র সংক্ষিপ্ত রাতের...!'

বুযুর্গরা তো রাত ছোট হওয়ার অভিযোগ করেন।

আলী বিন আবু আসেম রহ. বলেন, 'আবু হানীফা রহ. এর জ্ঞান-বুদ্ধিকে ভূপৃষ্ঠের সকল মানুষের সাথে তুলনা করলে তাঁর জ্ঞানই প্রাধান্য পাবে।'

এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন :

النَّاسُ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفِقْهِ.

'ফিকহ শাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সন্তানের মতো।' (রদ্দুল মুহতার : ১/১২২)

ইনিই হলেন ইমাম আবু হানীফা রহ., যিনি ফিকহের মূলনীতিসমূহকে একত্র করেছেন। তাই তাঁকে 'মুজতাহিদ ফিশ শারা' বলা হয়।

## খামিরা তৈরি করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ রহ.

এরপর বলা হয়েছে–

وَعَجَنَهُ أَبُو يُوسُفَ

'আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. সেই আটা দিয়ে খামিরা তৈরি করেছেন।'

এর অর্থ হলো–

دَقَّقَ النَّظَرَ فِي قَوَاعِدِ الْإِمَامِ وَأُصُولِهِ وَاجْتَهَدَ فِي زِيَادَةِ اسْتِنْبَاطِ الْفُرُوعِ مِنْهَا

'তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মূলনীতি ও নিয়মকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং গবেষণার মাধ্যমে তার শাখাগত মাসআলা আরো বৃদ্ধি করেছেন।'

এ কারণেই তাঁকে 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' বলা হয়। অর্থাৎ তিনি ইজতিহাদ করলেও মূলনীতির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর অনুসরণ করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শিষ্য ছিলেন। এতিম ছিলেন। বলতে গেলে ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁকে প্রতিপালন

করেছেন। মা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন ধোপার কাছে কাজ করার জন্য, ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁকে নিজের কাছে রেখে দেন এবং প্রতি মাসে বেতন দিতেন। তিনি বেতন ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে তিনি বড় আলেম হয়ে সে যুগের ইমাম হয়ে যান। তখন তাঁর মা সব জানতে পারেন।

তিনি কত বড় আলেম ছিলেন তা অনুমান করা যায় খতীব বাগদাদী রহ. এর নিম্নের উক্তিতে :

أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ الْكُتُبَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَمْلَى الْمَسَائِلَ وَنَشَرَهَا وَبَثَّ عِلْمَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ، وَهُوَ أَفْقَهُ أَهْلِ عَصْرِهِ ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ أَحَدٌ فِي زَمَانِهِ، وَكَانَ النِّهَايَةَ فِي الْعِلْمِ وَالْحُكْمِ وَالرِّيَاسَةِ.

'হানাফী মাযহাবে উসুলে ফিকহ তথা ফিকহের মূলনীতি বিষয়ে সর্বপ্রথম কিতাব রচনা করেন তিনি। আর মাসআলা-মাসায়েল লিপিবদ্ধ করে প্রচার করেন এবং ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ইলমকে পুরো ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে দেন। তিনি তাঁর যুগের সেরা ফকীহ ছিলেন। তাঁর যুগে কেউ তাঁর চেয়ে অগ্রসর ছিল না। ইলম, প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের শীর্ষ চূড়ায় ছিলেন তিনি।'

(যেমন- মানুষ বলে থাকে, তিনি তো জ্ঞানের শেষ সীমায় রয়েছেন!)

[রদ্দুল মুহতার : ১/১২১)

## রুটি তৈরি করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.

এরপর বলা হয়েছে : وَخَبَزَهُ مُحَمَّدٌ

'আর ইমাম মুহাম্মাদ রহ. রুটি তৈরি করেছেন।'

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. যে আটার খামিরা তৈরি করেছেন তা দিয়ে রুটি তৈরি করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.।

রুটি তৈরি করার অর্থ হলো :

زَادَ فِي اسْتِنْبَاطِ الْفُرُوعِ وَتَنْقِيحِهَا وَتَهْذِيبِهَا وَتَحْرِيرِهَا بِحَيْثُ لَمْ تَحْتَجْ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ

'তিনি এমনভাবে শাখাগত মাসায়েল উদ্ভাবন, পরিমার্জনা ও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, অন্য (কারো) কিছু করার প্রয়োজনীয়তা থাকেনি।'

## ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর ইলমি অবস্থান

তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে :

وَقَدْ ظَهَرَ عِلْمُهُ بِتَصَانِيفِهِ كَالْجَامِعَيْنِ وَالْمَبْسُوطِ وَالزِّيَادَاتِ وَالنَّوَادِرِ، حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ صَنَّفَ فِي الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ كِتَابًا.

وَمِنْ تَلَامِذَتِهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

'তাঁর ইলম প্রকাশ পায় তাঁর রচনা থেকে। যেমন- জামে সগীর, জামে কাবীর, মাবসূত, যিয়াদাত ইত্যাদি। তাঁর ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি দীনি বিষয়ে নয়শ নিরানব্বইটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইমাম শাফেয়ী রহ.।'
(রদ্দুল মুহতার : ১/১১৮)

ইমাম শাফেয়ী রহ. কসম খেয়ে বলেন–

وَاللَّهِ مَا صِرْتُ فَقِيهًا إِلَّا بِكُتُبِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ বিন হাসানের কিতাব পাঠ না করলে আমি ফকীহ হতে পারতাম না!'
(রদ্দুল মুহতার : ১/১১৮)

যিনি এত বড় বিদ্যাসাগর ও জ্ঞানের জাহাজ ছিলেন, তিনি ফিকহ শাস্ত্র নিয়ে সারা জীবন কাজ করেছেন। কুরআন ও হাদীসের সকল মূলনীতি একত্র করে ফিকহ শাস্ত্র উদ্ভাবন ও সংকলন করেছেন। ছয় লাখের বেশি মাসআলার সমাধান তিনি তাঁর জীবদ্দশায় লিখে গিয়েছেন।

একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কোনো মানুষ যে মাসআলার সম্মুখীন হয়নি, আপনি অনেক ভেবে-চিন্তে সে সব মাসআলার সমাধান কেন লেখেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আগুন লাগার পর কুয়া খনন করলে লাভ হয় না। আগে থেকে খনন করা থাকলে কাজে লাগে। আমরা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন মাসআলারও সমাধান লিখে রাখি, যাতে আগামীতে কারো কোনো মাসআলার প্রয়োজন হলে কিতাবে সমাধান খুঁজে পায়।'

ইমাম শাফেয়ী রহ. একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, ‘একবার আমি ইমাম মুহাম্মাদের সঙ্গে তাঁর কামরায় রাত্রিযাপন করি। আমি দেখলাম, তিনি তাঁর কাগজপত্র পড়তে পড়তে একসময় চেরাগ নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে কুপি জ্বালিয়ে আবার পড়তে বসলেন। তারপর আবার কুপি নিভিয়ে শুয়ে গেলেন। এভাবে সারা রাত তিনি ষোলোবার বাতি জ্বালিয়ে পড়তে বসেছেন।

(যিনি এক রাতে ষোলোবার উঠে পড়তে বসেছেন তিনি কি সারা রাত এক বিন্দু ঘুমিয়েছেন?)

আমি ভেবেছিলাম তিনি কিছু পড়ে আবার ঘুমিয়ে যান, কিন্তু আশ্চর্য হলাম যখন দেখলাম তিনি এশার অযু দিয়েই ফজরের নামায আদায় করলেন!

মূলত তাঁর এমন করার কারণ ছিল– তিনি কিতাব থেকে কিছু পাঠ করে সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে শুয়ে যেতেন। আর বাতি নেভানোর কারণ ছিল- লেখাপড়া না করলে বাতি জ্বালিয়ে রাখলে তো অপচয় হবে।

একবার ইমাম মুহাম্মাদ রহ. কে একজন জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি রাতে ঘুমান না কেন?’

তিনি বললেন, ‘আমার রাত্রিজাগরণের কারণ হলো- মানুষ আমাদের উপর নির্ভর করে সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে। আমরাও যদি ঘুমিয়ে যাই, তবে তাদেরকে মাসআলার সমাধান কে দিবে?’

## আমাদের কাজ শুধু রুটি খাওয়া

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, এ ইমামগণ আমাদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন। তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায়ই ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য লাখো মাসআলার সমাধান লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এখন আমাদের কাজ শুধু রুটি খাওয়া অর্থাৎ শুধু তার উপর আমল করা। তাই আমাদের উচিত, এ সকল মহান ব্যক্তির মর্যাদা বুলন্দির জন্য দুআ করা।

## তাসাওউফ কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

ফিকহ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন সময়ের আবর্তনে তা বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়েছে, তেমনি হাদীস সংকলন ও তাসাওউফও সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বিস্তারিত তো এখন বলা সম্ভব নয়, সংক্ষেপে

শুধু এতটুকু জেনে রাখুন যে, তাসাওউফের সকল মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন কুরআন-হাদীসে রয়েছে। সেখান থেকেই আমাদের আকাবিরগণ সংকলন করেছেন, যার মাধ্যমে আমাদের জন্য পথ চলা সহজ হয়ে গেছে। যুগের বিবর্তনে পরিভাষার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম যুগে একে তাযকিয়া ও ইহসান বলা হত, ইহসান শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ছিল, আর এ যুগে তাসাওউফ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। এতে তো মূল বিষয়ে কোনো পার্থক্য হয়নি।

সর্বপ্রথম 'খলীফা' উপাধি ব্যবহৃত হয় হযরত আবু বকর রা. এর জন্য। সর্বপ্রথম 'আমিরুল মুমিনীন' উপাধি ব্যবহৃত হয় হযরত উমর রা. এর জন্য। সর্বপ্রথম 'কাযিল কুযাত' তথা প্রধান বিচারপতি লকবটি প্রয়োগ হয় ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর জন্য। 'উজির' শব্দের সর্বপ্রথম প্রয়োগ ঘটে আবু সালামা হাফসের জন্য। 'সুলতান' উপাধি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় মাহমুদ গজনবীর জন্য। 'সুফী' শব্দটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয় আবু হাশেম রহ. এর জন্য, যিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর যুগের লোক। আল্লাহ তাআলা এ শব্দকে এতটাই কবুল করেছেন যে, এরপর থেকে নিয়মিত এ শব্দের ব্যবহার চলে এসেছে।

এতটুকু তো মানতেই হবে যে, তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধির সাধনা বাস্তবেই কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কেউ যদি তাসাওউফ শব্দের পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পছন্দ করে, তাহলে ব্যবহার করুক না! আমাদের কোনো আপত্তি নেই! আপত্তি করব তখনই, যখন কেউ বলবে– আত্মশুদ্ধি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

## তাসাওউফের উদ্দেশ্য

এক ব্যক্তি হযরত থানবী রহ. কে জিজ্ঞেস করল, 'হযরত, তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধির মূল উদ্দেশ্য কী?'
তিনি উত্তর দিলেন, 'তাসাওউফ হলো এমন সাধনার নাম, যার মাধ্যমে মানুষের রক্ত-মাংস ও রগ-রেশা থেকে গুনাহের খাদ বের হয়ে যায়।'

## আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়

এক বুযুর্গকে কেউ প্রশ্ন করল, 'হযরত, আমি কীভাবে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারব?'

তিনি সংক্ষেপে তাকে বলে দিলেন, 'জীবিতকে মেরে ফেলো আর মৃতকে জীবিত করো; উপস্থিতকে অনুপস্থিত করো আর গায়েবকে হাজির করো; বন্ধুর সাথে অপরিতের মতো আচরণ করো আর অপরিচিতকে বন্ধু বানিয়ে নাও।'

ঐ ব্যক্তি তো হতবাক হয়ে গেল। তার মাথায় কিছুই ঢুকল না। অথচ বুযুর্গ খুব গভীর জ্ঞানের কথা বলেছেন। এবার এ তিনটি অস্পষ্ট কথার ব্যাখ্যা শুনুন। বুযুর্গ বলেন :

'জীবিতকে মেরে ফেলো আর মৃতকে জীবত করো– এ কথার উদ্দেশ্য হলো, কুপ্রবৃত্তি জীবিত, একে মেরে ফেলো। আর অন্তর মৃত, একে জীবিত করো।

উপস্থিতকে অনুপস্থিত করো আর গায়েবকে হাজির করো– এ কথার মানে হলো, দুনিয়া তোমার মুখোমুখি রয়েছে। একে পেছনে ফেলে দাও। আর আখেরাত তোমার পেছনে রয়েছে। একে তোমার সামনে নিয়ে আসো। অর্থাৎ আখেরাতকে সামনে রেখে জীবনযাপন করো।

বন্ধুর সাথে অপরিতের মতো আচরণ করো আর অপরিচিতকে বন্ধু বানিয়ে নাও– এ কথার অর্থ হলো, শয়তানের সাথে তোমার বন্ধুত্ব রয়েছে, তুমি তাকে মেনে চলো, তাই শয়তানকে অপরিচিত বানিয়ে ফেলো। যার কথা তুমি মানো না, সেই প্রতিপালক তোমার কাছে অপরিচিতের মতো, তাই তাঁকে বন্ধু বানিয়ে নাও।

এ তিনটি কাজ করলে তুমি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে।'

## তিনটি মৌলিক বিষয়

আমি যতটুকু সময় আমার শায়খদের সোহবতে থেকেছি, তাঁদের মুখ থেকে তিনটি বিষয়ের গুরুত্বের ব্যাপারে খুব বেশি আলোচনা শুনেছি। আপনারাও যদি এ তিনটি বিষয়ের উপর আমল করেন তবে এ সম্পর্কের নূর অতি দ্রুত হাসিল করতে পারবেন। সেই তিনটি বিষয় নিম্নরূপ :

### ১. স্বল্প আহার

প্রথম বিষয় হলো কম খাওয়া, অন্য শব্দে ক্ষুধার্ত থাকা। এটা তাসাওউফের ভিত্তি, অথচ বর্তমানে এর উপর আমল হয় না। আমাদের অধিকাংশ রোগ, যেমন নজরের হেফাযত করতে না পারা গুনাহের ইচ্ছা

বেশি হওয়া, তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে জাগ্রত না হওয়া ইত্যাদি সবই অধিক আহারের কারণে হয়ে থাকে। স্বল্প আহারের যে স্বাদ রয়েছে আমরা তা আস্বাদন করিইনি! কত রমযান এসে চলে যায়, আমরা এ মাসেও কম খাওয়ার স্বাদ নিতে পারি না। সাহরীতে এত খাই যে, বমি আসার উপক্রম হয়। আর ইফতারীর সময় রকমারি খাবারের আয়োজন থাকে, আমরা সে খাবারের উপর হামলে পড়ি। রমযান মাসেও আমরা অনুধাবন করতে পারি না যে ক্ষুধা কাকে বলে!

## ক্ষুধার্ত থাকার ফযিলত

একবার হযরত বায়েযিদ বোস্তামী রহ. ক্ষুধার্ত থাকার ফযিলত বর্ণনা করছিলেন। এক লোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হযরত, ক্ষুধার্ত থাকারও ফযিলত আছে তাহলে?'

তিনি বললেন, 'ফেরআউন যদি ক্ষুধার্ত থাকত, তবে সে কখনো খোদা হওয়ার দাবি করত না!'

কারণ মানুষ ক্ষুধার্ত থাকলে বুঝতে পারে, আসলে সে কী! তার মূল্যই বা কতটুকু! তার অস্তিত্ব কত ক্ষুদ্র! তখন আপনাআপনি তার মন কাবু হয়, বিনয় ও অক্ষমতার অনুভূতি তৈরি হয় এবং আল্লাহ তাআলার নেয়ামতরাজির কদর বুঝে আসে।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন– একদিন আমি খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম, কয়েকদিন যাবৎ উপবাস করছিলাম, ক্ষুধার কারণে আমার চোখে পানি চলে এল। রাসূল সা. আমার চোখে পানি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আবু হুরায়রা, তুমি কাঁদছ কেন?'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, কতদিন ধরে খাওয়ার কিছু পাই না! এখন ক্ষুধা সহ্যের বাইরে চলে গেছে! তাই অনিচ্ছায় চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে!'

রাসূল সা. সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আবু হুরায়রা, কেঁদো না! কেউ সওয়াবের নিয়তে ক্ষুধার্ত থাকলে সে কেয়ামত দিবসের কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে না।'

রাসূল সা. ক্ষুধার্ত থাকার ক্ষেত্রে সওয়াবের নিয়ত থাকার কথা বলে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি জানতেন, তাঁর ভবিষ্যৎ উম্মতরা

নিজেদের শরীর সুগঠিত করতে ডায়েট কন্ট্রোল করবে। বর্তমানে তো স্লিমিং ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেয়েরা না খেয়ে থাকে। কিন্তু রোযা রাখার তাওফীক হয় না তাদের। মেদ কমানোর জন্য না খেয়ে থাকলে সওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই উত্তম হলো- ডায়েট কন্ট্রোল না করে অধিকহারে রোযা রাখা, যাতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিও অর্জিত হয় এবং অন্তরও আলোকিত হয়।

## সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন :
'শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্য হতে এমন কিছু লোক আসবে, যারা রকমারি খাবার খাবে, বিভিন্ন ধরনের পানীয় পান করবে, অনেক রকমের পোশাক পরিধান করবে এবং বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে। এরাই আমার উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক!'

তাই তো আমাদের বুযুর্গরা বলেন, মানুষের অন্তরে যে শয়তানি কুমন্ত্রণা আসে তা শয়তানের বীজ; উদর পূর্তি করে খাওয়া ভূমির মতো আর মনভরে ঘুমানো তাতে পানি সিঞ্চনের মতো। যে পেট ভরে খাবে সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হবে। তার চোখ খুলবে কী করে? এমন হলে তো তাহাজ্জুদের সময় ওঠা দূরের কথা, ফজরের সময়ও জাগ্রত হওয়া কঠিন হয়ে যায়! সাধারণ মানুষের কথা বাদই দিলাম, এখন তো তালিবে ইলমদেরও ফজরের নামায পড়া কঠিন হয়ে যায়। আমাদের আকাবিরগণ এর কারণ অনুসন্ধান করে বলেছেন, মূল কারণ হলো পেট ভরে খাওয়া, এতে অলসতা তৈরি হয়। দেখা যায়, উসতাদ দরসে আলোচনা করছেন আর ছাত্ররা ঘুমের রাজ্যে বিচরণ করছে। তবে মানুষের জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অবশ্যই আহার করবে। কারণ একেবারে না খেলে তো শেষে হাসপাতালে যেতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া ক্ষতিকর, অথচ আমরা তাই করে থাকি। মানুষের প্রয়োজন খুবই সামান্য। আপনি কয়েক লোকমা খেয়েও সারা দিন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবেন।

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি স্ত্রী-সন্তানের সাথে খানা খায়, দস্তরখান তুলে ফেলার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন। সুবহানাল্লাহ!

তাই পুরুষদের উচিত, ঘরে আপন স্ত্রী-সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে খানা খাওয়া। তবে যে পরিমাণ খেলে প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় ততটুকু খাবে। এত বেশি খাবে না, যার ফলে অলসতা তৈরি হয়ে ইবাদত থেকে মাহরুম হওয়ার আশঙ্কা হবে।

## অনাহারের দশটি উপকারিতা

ইমাম গাযালী রহ. অনাহার-উপবাসের দশটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন :

১. হৃদয় শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন হয়।

২. অন্তরে কোমলতা তৈরি হয়। (অনেকে চিঠি লেখে যে, হযরত, মুনাজাতে কান্না আসে না! তারা যেন এ কথাটি ভেবে দেখে। হতে পারে, তাদের অন্তর কোমল না হওয়ার কারণ- উদর পূর্তি করে খাওয়া।)

৩. ক্ষুধার্ত ও অসহায়দের প্রতি সহানুভূতি তৈরি হয়।

৪. আখেরাতের ক্ষুধার কথা মনে পড়ে।

৫. গুনাহের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৬. নিদ্রা কমে যায়।

৭. ইবাদতে উদ্যম থাকে।

৮. শরীর সুস্থ থাকে।

৯. অল্পেতুষ্টির গুণ লাভ হয়।

১০. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সহজ হয়ে যায়।

## অপছন্দনীয় দুটি বস্তু

বর্ণিত আছে, দুটি বস্তু বৈধ হলেও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় :

১. উদর পূর্তি করে খাওয়া।

২. স্ত্রীকে তালাক দেয়া।

অর্থাৎ শরয়ী ওজর ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেয়া আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় আর পেট ভরে খাওয়ার অনুমতি থাকলেও আল্লাহ তা পছন্দ করেন না।

## মুনাজাত ও মুলাকাতের মধ্যে তফাত

আলোচনা প্রসঙ্গে তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে একটি ইলমি নুকতা (সূক্ষ্ম তত্ত্ব) বর্ণনা করছি। কিতাবে আছে, হযরত মুসা আ. আল্লাহর সাথে কথা বলতে তুর পাহাড়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি চল্লিশ দিন অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু এ কয়দিন তিনি একটুও ক্ষুধা অনুভব করেননি। অথচ যখন হযরত খিযির আ. এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, তখন ঠিকই ক্ষুধার্ত হয়ে বলেছেন :

قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۫ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿۶۲﴾

'মুসা আ. তার সঙ্গীকে বললেন– আমাদের নাশতা নিয়ে আসো। আমরা এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'
(সূরা কাহফ : ৬২)

দুই ঘটনার মধ্যে পার্থক্য কী? উলামায়ে কেরাম এর উত্তরে লিখেছেন– তুর পাহাড়ে যাওয়া 'মাকামে মুনাজাত' তথা আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য ছিল, আর ইলম অর্জন করতে হযরত খিযির আ. এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সফরে যাওয়া 'মাকামে মুলাকাত' তথা সাক্ষাতের ব্যাপার ছিল। সুতরাং সাক্ষাতে গেলে মানুষ তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আর মুনাজাতের অবস্থায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে ও নিজের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। তাই তো আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

عبدي! خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي.

'ওহে আমার বান্দা, আমি সবকিছু তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি আর তোমাকে সৃষ্টি করেছি আমার (ইবাদতের) জন্য।'

আরেকটি হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يا ابن آدم! أطلبي تجدني، إن وجدتني وجدت كل شيئ، وإن فاتني فات كل شيئ وأنا خير لك من كل شيئ.

'হে আদম সন্তান, আমাকে খুঁজলে পাবে। আমাকে পেলে সবকিছু পাবে, আমাকে না পেলে সব কিছু হারাবে। আর আমি তোমার জন্য সবকিছু থেকে উত্তম।'

আরেকটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا عَبْدِي أَنْتَ تُرِيدُ وَأَنَا أُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ ، فَإِنْ سَلَّمْت لِي مَا أُرِيدُ أَعْطَيْتُك مَا تُرِيدُ ، وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ لِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُك فِيمَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ.

'হে আমার বান্দা, তুমিও কামনা করো, আমিও কামনা করি, আর আমার ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়।
আমি যা চাই তা যদি তুমি মেনে নাও তবে আমি তোমাকে তোমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দিব আর যদি তুমি আমার ইচ্ছা মেনে না নাও তবে আমি তোমাকে ক্লান্ত করে দিব তোমার কাঙ্ক্ষিত বস্তুর অনুসন্ধানে, কিন্তু আমার ইচ্ছাই প্রতিফলিত হবে।'
(হাশিয়াতুস সাবী আলাশ শারহিস সাগীর : ১১/৩২৫)

## শূন্য উদরের স্বাদ

ক্ষুধা শব্দ বাদ দিয়ে আমরা এখন শূন্য উদর শব্দ ব্যবহার করব। তাই আপনাদের কর্তব্য– খালি পেটে থাকার স্বাদ আস্বাদন করুন। কারণ এমন কোনো আত্মশুদ্ধির সাধনাকারী নেই, যিনি কখনো উপবাসের স্বাদ আস্বাদন না করেই এ (পীর-মুরীদির) সম্পর্কের আলোয় প্লাবিত হয়েছেন। আপনি যদি হৃদয়কে আলোকিত করতে চান তবে এই একটি পন্থাই রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে :
'দুনিয়ায় যে ব্যক্তির পেট অধিকাংশ সময় ভরা থাকবে, হাশরের ময়দানে তাকে খালি পেটে হাজির করা হবে।'

## ২. তাহাজ্জুদের পাবন্দি

পীর-মুরীদির সম্পর্কের আলোয় আলোকিত হতে চাইলে দ্বিতীয় জরুরি বিষয় হলো- তাহাজ্জুদের প্রতি মনোযোগী হওয়া। একজন নেককার মানুষ যেভাবে ফরয নামাযের প্রতি যত্নশীল থাকে, আত্মশুদ্ধির সাধনাকারী ব্যক্তিরও তাহাজ্জুদের প্রতি তেমনি যত্নশীল হতে হবে। যে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভ করতে চায় তার কর্তব্য হলো- তাহাজ্জুদের প্রতি যত্নবান হওয়া, যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে।

অনেকে বলে থাকে, আমি মুরাকাবা করার সুযোগ পাই না, তেলাওয়াত করার সুযোগ হয় না, তাসবীহ ছুটে যায় ইত্যাদি। এর সমাধান হলো তাহাজ্জুদের পাবন্দি করা। কারণ যে তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হবে সে ফজর পর্যন্ত আমল করার সুযোগ পাবে। তাহাজ্জুদের প্রতি যত্নবান হতে দুপুরের খাবারের পর নিদ্রা (কাইলুলা) এবং রাতে দ্রুত ঘুমানো অতি সহায়ক। মাসনুন দুআ ও যিকির করার মাধ্যমেও তাহাজ্জুদ আদায় সহজ হয়ে যায়। এরপরও উঠতে কষ্ট হলে এলার্ম দিয়ে রাখা যেতে পারে। নিজের পক্ষ থেকে যতটুকু করা সম্ভব করে বাকিটুকু আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। এতকিছু করার পরেও জাগ্রত হতে না পারলে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই! আপনার সাধ্যে যা ছিল তা তো করেছেন, এখন কুদরতের পক্ষ থেকে তাওফীক না হলে পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষের সাধ্যের পরেও তো তাকদীরের বিষয়টি রয়ে যায়।

লাইলাতুত তা'রীসে রাসূল সা. এর ফজরের নামায কাযা হয়েছিল। কারণ কী ছিল? আল্লাহ তাআলাই কাযা করিয়েছেন, যাতে উম্মতের জন্য কাযা নামায আদায়ের মাসআলা স্পষ্ট হয়ে যায়। তাকদীরের বিষয় হওয়ায় রাসূল সা. আফসোস করেননি। তো সাধ্য অনুযায়ী সবকিছু করার পর বাকিটুকুর জন্য চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের উচিত, আল্লাহর সন্ধানী হওয়া, অবস্থার সন্ধানী হওয়া নয়।

## ৩. শায়খের সাথে সম্পর্ক

তৃতীয় বিষয় হলো- শায়খ ও পীর সাহেবের সাথে গভীর সম্পর্ক। এ সম্পর্ককে যত বেশি বাড়াবে ততই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক লাভ হবে। এক বুযুর্গের ঘটনা বলি। তার নাম আবদুল্লাহ বাহলুবী রহ.। তিনি মুফাসসিরে কুরআন ও তার যুগের বড় পীর ছিলেন। তিনি নিজের কাহিনী বর্ণনা করেন :

আমি এক মাদরাসায় দরস দিতাম। একবার আমি শায়খের দরবারে হাজির হলাম। কিছুক্ষণ থেকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বললাম, 'হযরত, আমার তো মাদরাসায় ফিরে যেতে হবে। সবক পড়াতে হবে।'

(ছাত্রদের সবকে উপস্থিত থাকতে না পারা শরয়ী ওজর)

হযরত বললেন, 'মাওলানা, কয়েক দিন আমার এখানে থেকে যাও!'

(শায়খরাও কামনা করেন, তাঁদের কাছে যে নেয়ামত রয়েছে তা যেন লোকেরা তাঁদের জীবদ্দশায়ই অর্জন করে নেয়)
তিনি ভাবলেন, শায়খ যেহেতু ফিরে যেতে নিষেধ করছেন, মুহতামিম সাহেবকে ফোনে বলে দিই, আমার সবকে যেন অন্য কেউ পাঠদান করে, আমি তিন দিন শায়খের কাছে থাকব।
তিনি বলেন, 'এরপর আমি তিন দিন হযরতের দরবারে থাকলাম। আল্লাহ তাআলা এর ফলে এত বরকত দিলেন যে, ফিরে আসার পর লাগাতার তিন বছর একবারও তাহাজ্জুদ ছুটে যায়নি।'
সুবহানাল্লাহ! মাত্র তিন দিনের বরকতে লাগাতার তিন বছর তাহাজ্জুদ আদায়ের তাওফীক হয়েছে। কিন্তু শায়খের দরবারে থাকতে তো হবে! বর্তমানে তো কুধারণা থেকেই মানুষ বাঁচতে পারে না!

میری ہر نظر تیری منتظر
تیری ہر نظر میرا امتحان

'আমার প্রতিটি দৃষ্টিপাত তোমার অপেক্ষায় কাটে,
আর তোমার প্রতিটি দৃষ্টিপাত আমার জন্য পরীক্ষা।'

প্রতিটি বিষয়কে ভেবে দেখে যে, এটাও তো সুন্নাত মোতাবেক হচ্ছে। এভাবে ভাবতে ভাবতে জীবন অতিবাহিত হয়ে যায়। আর যিনি চলে যাওয়ার তিনি ঠিকই এক সময় দুনিয়া থেকে বিদায় নেন!

## এখনি সময়...

একজন আলেম হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর শাগরেদ ছিলেন। দেওবন্দে তাঁর কাছে দাওরায়ে হাদীসের দরস নিয়েছেন। এরপর আমাদের হযরত মুরশিদে আলম রহ. এর মাদরাসায় দরস দিয়েছেন। হযরতের জীবদ্দশায় দুই বছর মুসলিম শরীফের পাঠদান করেছেন। অনেক সময় তার ইচ্ছা হয়েছে হযরতের হাতে বায়আত হওয়ার, কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠেনি। হযরতের ইন্তেকালের পর আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমি অবহেলা করে সুযোগ হারিয়েছি! রোজ হযরতের কুরআনের দরস শুনেছি। দুই বছর তো কম সময় নয়, পুরো সময় আমি এ ভাবনাতেই কাটিয়ে দিয়েছি যে, হযরত অনেক ভালো, অনেক কামেল মানুষ, সুন্নাতের

অনুসারী, খুব সুন্দর কুরআনের দরস প্রদান করেন, অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন ইত্যাদি। আমার কল্পনাতেও আসেনি যে, হযরত এত দ্রুত দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন! এখন পুরো দেশে অনেক খুঁজেও হযরতের মতো কাউকে নজরে পড়েনি।'

এভাবে বহু মানুষ ভেবে ভেবে সময় কাটিয়ে দেয়। আমাদের যে শায়খগণ এখনো বেঁচে আছেন তাঁদের কাছ থেকে উপকৃত হন। নাহলে মনে রাখবেন, এরপর তাঁদের মতো কাউকেও পাবেন না। এটা মানুষশূন্যতার যুগ। আপনারাই ভেবে দেখুন, যে আলেম ও বুযুর্গগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন, পরবর্তীতে তাঁদের মতো কাউকে কি দেখতে পাচ্ছেন? তাই আজই সময়, আজই তাঁদের সোহবত থেকে উপকৃত হন এবং নিজেকে সংশোধন করে নিন!

## আল্লাহপ্রত্যাশীদের অবস্থা

সবাই বেশি বেশি সৎকর্ম করুন। নেক কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ুন এবং ক্লান্ত হয়ে হয়ে নেক কাজ করুন...!

মুআযা রহ. এর একজন নেককার বাঁদী ছিলেন। খুব ইবাদত করতেন। তার স্বামী জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। তাই তিনি দিনরাত আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এশার পর সুন্নাত পালনার্থে শয়ন করতেন। একটু পর এ কথা ভেবে উঠে যেতেন যে– 'আজ রাতেই যে আমার মৃত্যু হবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে?'
এরপর অযু করে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। একবার তিনি ইবাদত করছিলেন। তখন তিনি চোখের সামনে শহীদ স্বামীর প্রতিমূর্তি দেখতে পেলেন। (কল্পনার জগতে মানুষ যেভাবে দেখতে পায়। আল্লাহ তাআলা হয়তো স্বামীর আকৃতিতে কোনো ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন বা স্বামীর আত্মাকেই প্রেরণ করেছিলেন। প্রকৃত অবস্থা তো তিনিই জানেন!)
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন আপনি?'
স্বামী উত্তর দিলেন, 'তুমি ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছ! তাই আমি তোমাকে নিতে এসেছি!'

শুধু এটুকুই বললেন, তিনি কালিমা পাঠ করলেন, মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার জান কবজ করলেন। এভাবে তিনি আল্লাহর কাছে চলে গেলেন।

আল্লাহর এক নেক বান্দি ছিলেন হযরত রাবেয়া বসরী রহ.। তিনি তাহাজ্জুদে উঠে দুটি কথা বলতেন। প্রথম কথা হলো- 'হে আল্লাহ, দুনিয়ার সকল বাদশাহ তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু তোমার দুয়ার এখনো খোলা আছে। আমি তোমার সামনে আমার আঁচল পেতে দিচ্ছি!'
দ্বিতীয় কথা হলো- 'হে আল্লাহ, আপনি যেভাবে আকাশকে জমিনে পতিত হওয়া থেকে বিরত রেখেছেন, তেমনি শয়তানকে আমার থেকে দূরে রাখুন!'

পৃথিবীর ইতিহাসে এমনও অনেক মানুষ অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তারা এত ইবাদত করতেন যে, রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন এত ক্লান্ত থাকতেন যে পা হেঁচড়ে চলতে হত। আবু রাইহানা রা. নামক এক সাহাবীর বিখ্যাত একটি ঘটনা আছে যে, তিনি বহু কাল জিহাদে কাটিয়ে অবশেষে ঘরে ফিরলেন। তখন এশার সময় ছিল। স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে বললেন, 'একটু অপেক্ষা করো। আমি দুই রাকাত নফল নামায পড়ে তোমার সাথে আলাপ করব।'
এরপর তিনি দুই রাকাত নফলের নিয়ত করলেন এবং নামাযে কুরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করলেন। তেলাওয়াত করতে করতে তিনি এ কথা ভুলে গেলেন যে, বহু কাল পর এইমাত্র বাড়িতে ফিরেছেন। অন্য দিনের অভ্যাস অনুযায়ী যখন নামায শেষ করলেন তখন প্রায় ফজরের সময় হয়ে গেছে। সালাম ফেরানোর পর স্ত্রী অনুযোগ করে বললেন, 'আমার জন্য কি আপনার একটুও সময় নেই? আপনি নিজেও ক্লান্ত হলেন আর আমাকেও সারা রাত অপেক্ষায় রেখে ক্লান্ত করলেন!'
তিনি কসম খেয়ে বললেন, 'তেলাওয়াত শুরু করার পর আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি বাড়িতে ফিরে এসেছি আর তুমি আমার অপেক্ষায় বসে আছ!'

হায় আল্লাহ! ইবাদতে তাঁদের একাগ্রতা কেমন ছিল! আর আমাদের অবস্থা হলো– আমরা নিচ তলায় নামায পড়তে থাকলে কেউ যদি তৃতীয় তলায় আমাদের নাম নেয়, তাহলে আমরা বুঝে ফেলি যে, কেউ আমাদেরকে স্মরণ করছে!

## আমাদের আমল প্লাস্টিকের ফুলের মতো

মনোযোগ দিয়ে একটি কথা শুনুন। কোনো রোবট যদি মানুষকে পানি পান করায় তাহলে কি তার সওয়াব হবে? কখনোই হবে না। কারণ সে অনুভূতিশূন্য। সে মেশিন। ভেবে দেখুন, পানি পান করানো সওয়াবের কাজ হলেও অনুভূতিহীন একটি মেশিন কাউকে পানি করালে সওয়াব পায় না। এমন তো হবে না যে, আমরা অনুভূতিহীন যে সকল নামায আদায় করি, হাশরের ময়দানে তার কোনো প্রতিদানই দেয়া হবে না?

আমাদের মুখ থেকে শব্দ বের হয়, কিন্তু আমাদের অন্তরে কোনো অনুভূতি থাকে না।

আজ আমাদের আমল প্লাস্টিকের ফুলের মতো। প্লাস্টিকের ফুল দেখলে আসল ফুলের মতোই মনে হয়। একে আসল ফুল বলে ভ্রম হয় দর্শকের। দোকানদাররা এর উপর পানি ছিটিয়ে রাখে, যাতে দেখে বোঝা না যায়। তো দেখতে আসল ফুলের মতো হলেও মূলত তা নকল। আজ আমাদের অনুভূতিহীন নামাযও এমন প্লাস্টিকের ফুলের মতো। তাই আমাদের কর্তব্য হলো– আমরা নামায আদায় করব আল্লাহর ধ্যান ও মহব্বতের সাথে, যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা পুরস্কার লাভ করি।

## তিনটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব

তিনটি সূক্ষ্ম বিষয় মনে রাখতে হবে :

### ১. আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি

প্রথম বিষয় হলো- আল্লাহর ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ আত্মশুদ্ধির সাধনাকারীদের অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে–

কারো মধ্যে ভয় প্রবল থাকে, সে কাঁদতে থাকে।

কারো মধ্যে আশা প্রবল থাকে, তাই সে মুচকি হাসে।

কারো মধ্যে তলব প্রবল থাকে, সে পেরেশান থাকে।

আর কারো মাঝে আশা প্রবল থাকে, ফলে সে নিশ্চিন্ত থাকে।

এ সবই ফুলের গুচ্ছ। আল্লাহ তাআলা একেকজনকে একেক অবস্থায় রেখেছেন। তাই ভালোবাসার দাবি হলো- যে নিশ্চিন্ত আছে সে পেরেশানি চাইবে না, আর যে পেরেশানিতে আছে সে প্রশান্তি কামনা করবে না। আল্লাহ

তাআলা যে অবস্থায় রাখবেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে আত্মশুদ্ধির সাধনায় দ্রুত সফলতা লাভ হবে।

## ২. সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি বিমুখতা

দ্বিতীয় বিষয় হলো- দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের মোহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। প্রকৃত বস্তু তো আমল, এর মাধ্যমেই মানুষের জীবন সজ্জিত হয়। অথচ মানুষ আজ সৌন্দর্যের পিছে ছুটে জীবন বরবাদ করছে। অধমের হিসেবে প্রায় নিরানব্বই শতাংশ পুরুষ জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেয় দ্বিতীয় বিয়ের আকাঙ্ক্ষায়। তারা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলা তো স্ত্রী-সন্তান ও সুখী জীবন দান করেছেন, এবার আল্লাহকে রাজি-খুশি করতে হবে।

মনে রাখবেন, ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের পূজারীরা কখনোই সুখ-শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারে না।

সম্পদের ব্যাপারে কিছু জেনে নিন :

* হিশাম বিন আবদুল মালিক উনিশ বছর রাজ্য শাসন করেছেন। যুগের বিবর্তনের শিকার হয়ে বৃদ্ধকালে তিনি বসরার জামে মসজিদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতেন!

* আল কাহের বিল্লাহ আব্বাসী বহু বছর বাদশাহি করেছেন। তার পরিণতি হয়েছিল– শেষ বয়সে বাজারে বাজারে ঘুরে ভিক্ষাবৃত্তি করতেন।

* ওয়াসেক বিল্লাহ অত্যাচারী ও প্রতাপশালী শাসক ছিল। তার চোখের দিকে তাকালে লোকে ভয় পেত। তার মৃত্যুর পর লাশ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে হঠাৎ কাফনের ভেতর নড়াচড়া দেখা গেল। লোকেরা কাফন খুলে অবাক হয়ে দেখল, কাফনের ভেতর একটি ইঁদুর বসে আছে। ইঁদুরটি তার দু চোখ খেয়ে ফেলেছে!

দুনিয়াতেই তার শাস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল!

* সুলাইমান বিন আবদুল মালিক অতি সুদর্শন যুবক ছিলেন। ক্ষমতালোভী ছিলেন। একসাথে চার স্ত্রী রাখতেন এবং প্রতি শুক্রবার একজনকে তালাক দিয়ে নতুন আরেকটি বিয়ে করতেন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তার মৃত্যু

ঘটে। জানাযার পর লাশ দাফনের আগে তার লাশ নড়ে উঠল। তার ছেলে দেখে বলল, 'আব্বা কি জীবিত?'
উমর বিন আবদুল আযীয রহ. উত্তর দিলেন,'জীবিত নন, বরং আল্লাহ তাআলা তোমার বাবাকে দ্রুত শাস্তি দিচ্ছেন!'
সুতরাং এমন হীন সৌন্দর্যের মোহ ও মিছে দুনিয়ার ধন-সম্পদের পেছনে পড়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয়?
কবি কতই না সুন্দর বলেছেন :

ہوئے مر کر ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا
نہ کہیں جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا
مر کر مر ہی جاتے تو اچھا تھا مگر کیا کریں
مر کر مرنا نہیں مر کر پھر زندگی ہے

'এভাবে মরে লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে
সাগরে সলিল সমাধি ঘটাই ভালো ছিল,
কোনো জানাযাও হত না, কোথাও কবরও হত না!
মরে গেলেই তো ভালো ছিল, কিন্তু কী করব,
মৃত্যুর পরেও যে অনন্ত জীবন রয়েছে...!'

## ৩. ইখলাস ও তলব

তৃতীয় বিষয় হলো- যে বান্দা ইখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলার দরজায় করাঘাত করবে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে কখনো ব্যর্থ হবে না। তাই সর্বদা ইখলাস ও একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তাআলার দরজায় করাঘাত করে যেতে হবে।

এর উদাহরণ মহাপবিত্র আল কুরআনে এভাবে বিধৃত হয়েছে যে—
একবার রাসূল সা. এর কাছে কুরাইশ গোত্রের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি হাজির হলো। প্রিয় নবীজির অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল যে, তাদের সামনে ইসলামের সুমহান বাণী তুলে ধরবেন। হতে পারে এতে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। এর ফলে আরো বহু মানুষ মুসলমান হয়ে যাবে। এ ভাবনায় তিনি তাদের সামনে দীনি আলোচনা আরম্ভ করেন।

এদিকে এক বৃদ্ধ অন্ধ সাহাবী এ কথা ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বের হলেন যে, আল্লাহর রাসূল সা. এর দরবারে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, কীভাবে তিনি আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল হতে পারবেন?

এভাবে তিনি হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও নৈকট্য কামনা নিয়ে রাসূল সা. এর কাছে হাজির হলেন। মহানবী সা. আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন বলে তখনি তাঁকে সময় দেননি।

স্বাভাবিক নিয়ম তো এটাই যে, এক ডাক্তারের কাছে দুজন রোগী এল। একজনের ক্যান্সার, অপরজনের সর্দি-কাশি। ডাক্তার দ্বিতীয় রোগীকে বলবে, ভাই, একটু সবর করো। তোমাকে এর পরে দেখব।

রাসূল সা. আত্মার চিকিৎসক ছিলেন। তিনি জানতেন, একদিকে কুফর ও শিরকের ব্যাপার, অর্থাৎ কুফর ও শিরকের ক্যান্সার। তাই তারা বেশি মুখাপেক্ষী। এ কারণে প্রথমে তাদের সাথে কথা বলে নেয়া উচিত। আর সেই সাহাবী যেন সর্দি-কাশির রোগী, তাই তার সাথে পরে কথা বললেও হবে।

কিন্তু ইখলাসে পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে আগমনকারী সেই আগ্রহী সাহাবীর দীনি বিষয় জানার আগ্রহ আল্লাহ তাআলার এতটাই পছন্দ হয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে আয়াত নাযিল করলেন—

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ﴿١﴾ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ﴿٣﴾
اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿۴﴾ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿۵﴾ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى
﴿۶﴾ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾ وَهُوَ
يَخْشٰى ﴿٩﴾ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾

‘১. তিনি ভ্রুকুঞ্চন করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।
২. কারণ তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল।
৩. আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত,
৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং সেই উপদেশে তার উপকার হত।
৫. অপরদিকে যে বেপরোয়া,
৬. আপনি তার চিন্তায় মশগুল।
৭. অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দোষ নেই।
৮. যে আপনার কাছে দৌড়ে আসল,

৯. এমতাবস্থায় যে সে ভয় করে,

১০. আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন!

১১. কখনো এমন করবেন না, এটা উপদেশবাণী।'

(সূরা আবাসা : ১-১১)

সুতরাং বোঝা গেল, প্রকৃত তলব ও আগ্রহ নিয়ে যে বান্দা আগমন করে, আল্লাহর কাছে তার মূল্য রয়েছে।

* এবার এক নারীর কাহিনী শুনুন। এক বৃদ্ধা নারী। স্বামীর সাথে তার কথা কাটাকাটি হলো। স্বামী রাগান্বিত হয়ে তাকে বলে বসল– 'আজ থেকে তুমি আমার মায়ের মতো!'

এ কথা শুনে বৃদ্ধা অত্যন্ত বিচলিত হলো। রাসূল সা. এর দরবারে হাজির হয়ে জানাল– 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্বামী আমাকে এ কথা বলেছে।'

রাসূল সা. বললেন, 'তুমি তার উপর হারাম হয়ে গেছ!'

বৃদ্ধা পেরেশান হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, তিনি আমার সন্তানাদির পিতা!'

রাসূল সা. একই উত্তর দিলেন।

বৃদ্ধা এবার অত্যন্ত কাতর গলায় বলল, 'আল্লাহর প্রিয় রাসূল, আমি তো বিগতযৌবনা হয়ে গেছি! (বৃদ্ধা অবস্থায় তো নতুন করে বিয়ে-শাদি সম্ভব না! কে আমাকে আপন করে নিবে! আমার যে সকল পথই রুদ্ধ হয়ে গেল!)'

রাসূল সা. পুনরায় একই উত্তর দিলেন।

তখন বৃদ্ধার চারদিকে হতাশার অন্ধকার ছেয়ে গেল। বান্দা সবদিক থেকে হতাশ হয়ে গেলে আল্লাহর রহমত নেমে আসে। বৃদ্ধা আল্লাহমুখী হলো। বিগলিত চিত্তে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাল– 'আপনার নবীর হাইকোর্ট ফয়সালা দিয়ে দিয়েছে, তাই আমি সুপ্রীম কোর্টে আপিল করছি। হে আল্লাহ, এখন আমার কী হবে? আমি কীভাবে বাকি জীবন কাটাব?'

কেউ যখন ব্যাকুল চিত্তে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানায়, তখন দয়ালু আল্লাহ তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন না। তাই বৃদ্ধার করুণ মিনতি শুনে তিনি রাসূল সা. এর কাছে অহী প্রেরণ করলেন—

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۱﴾

'যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, নিশ্চয় আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শোনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।'

(সূরা মুজাদালাহ : ১)

এরপর বলেন– এর সমাধান হলো, স্বামী একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা ষাটজন মিসকিনকে দুই বেলা খানা খাওয়াবে। এতে যিহারের কাফফারা হয়ে যাবে এবং সে স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। এভাবে আল্লাহ তাআলা সবকিছু সহজ করে দেন।

হযরত উমর রা. তাঁর খেলাফতকালে একবার মসজিদে নববী থেকে বের হন। এক বৃদ্ধা হেঁটে যাচ্ছিল। তাঁকে দেখে সে বলে উঠল– 'উমর, এক সময় তোমাকে উমাইর ডাকা হত। এখন তুমি খলীফা হয়ে গেছ। জনসাধারণের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখবে সব সময়, কখনো এতে উদাসীনতা প্রদর্শন করবে না।'

আমীরুল মুমিনীন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ির কথা শুনছিলেন। সে চলে যাওয়ার পর কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'এই বুড়ির এত স্পর্ধা যে, আপনাকে শাসিয়ে গেল!'

তিনি বললেন, 'এ হলো সেই বুড়ি, যার ফরিয়াদ আল্লাহ তাআলা শুনেছিলেন। তার কথা না শুনে কি উম্‌রের উপায় আছে!'

এ সকল ঘটনা থেকে এ কথাই স্পষ্ট হয় যে, ইখলাসের সাথে যে আগমন করে আল্লাহ তাআলা তার একনিষ্ঠতা কবুল করেন।

প্রিয় সুধী! আপনাদের মধ্য থেকে যারাই পূর্ণ নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে এ মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন, আল্লাহ তাআলা কখনোই তাদেরকে বঞ্চিতরূপে ফিরিয়ে দিবেন না। অবশ্যই কিছু দান করবেন।

## দুই রকম বীজ

বীজ দুই রকম হয়ে থাকে। একটি হলো ভালো বীজ, আরেকটি নষ্ট বীজ। ভালো বীজ ভূমিতে বপন করলে তা থেকে ফল ও ফুল উৎপন্ন হয়, গাছ হয়। নষ্ট বীজ বপন করলে তা নির্মূল হয়ে যায়। মানুষের আমলের হিসাবও এমন। ইখলাসের সাথে যে আমল করা হয় তাতে আল্লাহ তাআলা

সওয়াব ও প্রতিদানের ফল-ফুল জুড়ে দেন আর লোক দেখানো আমলের কোনো প্রতিদান দেন না।

## দুই ধরনের জন্তু

তেমনি জন্তুও রয়েছে দুই ধরনের। একটি হলো পবিত্র খাবার আহারকারী। যেমন- গরু, মহিষ, বকরি, ভেড়া ইত্যাদি। এরা পবিত্র ঘাস খেয়ে থাকে। আরেক প্রকার হলো মৃত প্রাণী ভক্ষণকারী। যেমন- নেকড়ে মৃত প্রাণী এবং পচা, দুর্গন্ধযুক্ত ও নাপাক গোশত খেয়ে থাকে।

## দুই প্রকারের মানুষ

এভাবে মানুষও দুই প্রকার :

এক. যাদের খাবার পবিত্র ও হালাল, যারা জীবন ধারণ করে পবিত্র খাবার খেয়ে। তাদের মধ্যে মানবিক গুণাবলির সমাহার ঘটে থাকে। যেমন- বিনয়, সেবা, সততা, শান্তি, নিরাপত্তা, ভালোবাসা, পরোপকার, কল্যাণকামনা, অন্যের সফলতায় খুশি হওয়া, অপরের সুখের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা ইত্যাদি।

দুই. যারা মৃত প্রাণীর গোশত বা নাপাক খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করে। ফলে তার ভেতর সৃষ্টি হয় বিভিন্ন রকমের দোষ। যেমন- আত্মগর্ব, লৌকিকতা, অহংকার, ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, হিংসা ইত্যাদি। কারো অন্তরে যদি এ সব নিকৃষ্ট দোষ থাকে তাহলে তার বুঝে নিতে হবে যে, সে অপবিত্র ও হারাম খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করছে।

খুবই ভাবনার বিষয় হলো- কীভাবে আমাদের অন্তর থেকে এ সকল মন্দ বিষয় দূর করা যাবে। এর জন্য আজকের মাহফিলে আমরা আল্লাহ তাআলার সামনে ফয়সালা করে নিব যে— হে আল্লাহ, আজ আমাদের তনু-মন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার দিন।

আল্লাহর বিধান :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ

'তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেছেন আর অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেছেন।'

(সূরা আরাফ : ১৫৭)

আজ থেকে আমরা মন্দ বিষয়গুলোকে নিজের উপর হারাম করে নিব আর ভালো গুণাবলিকে নিজেদের জীবনোপকরণ বানিয়ে নিব।

## আমাদের চেয়ে তো গাছই ভালো

গাছ তো আমাদের চেয়ে ভালো। আপনারা জানেন যে, গাছের সাথে কারো শত্রুতা থাকে না। সে শান্তিময় নীরব জীবনযাপন করে। কারো সাথে ঝগড়া নেই, দুশমনি নেই। প্রতি বছর চাহিদা অনুযায়ী ফল উৎপন্ন করে। শত্রু-বন্ধু সবাইকেই ছায়া প্রদান করে। গাছের সবকিছুই অন্যের জন্য, নিজের জন্য কিছুই করে না। যেমন- মানুষের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে, ফল দেয়, ফুল দেয়। এমনকি গাছের পাতা ও ডালও মানুষের কাজে আসে। গাছ নিজেকে অন্যের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। হায়, আমরাও যদি আমাদের সবকিছু আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিতে পারতাম! আমাদের তো সেই সৌভাগ্য হয় না!!

কড়া মেজাজের কিছু স্ত্রীলোক রয়েছে, স্বামীকে হাসিমুখ দেখানোর সৌভাগ্য যাদের হয় না। মানুষ আমাকে তাদের অবস্থা জানায়, তাই আমি পারিবারিক জীবনের অনেক কিছুই জানতে পারি। সবাই সুন্দর স্বভাবের অধিকারী হতে শিখুন। ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া ও রাগ করা সমীচীন নয়।

## উদ্দেশ্য ভুলে যাবেন না!

স্বাভাবিক অবস্থার ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করবেন। উদাহরণস্বরূপ বলি- কোনো বিজ্ঞানী যদি যন্ত্রের মাধ্যমে জানতে পারে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূমিকম্প হবে, ওদিকে তার সর্দি-কাশিও ছিল, তবে এ অবস্থায় কি তার সর্দি-কাশির কথা মনে থাকবে, না ভূমিকম্পের কারণে পেরেশান হয়ে পড়বে? ভূমিকম্পের ভয় তাকে গ্রাস করে নিলে সে মাথাব্যথার কথা ভুলে যাবে, দাঁতব্যথার কথা ভুলে যাবে, ক্ষুধার্ত থাকলে তাও ভুলে যাবে!

নবীগণের অবস্থাও ঠিক এমনি ছিল। কেয়ামতের বিভীষিকা তাদের সামনে এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, দুনিয়ার এ সকল ছোট ছোট সমস্যা তাদের চোখেই পড়ত না। তাই তারা বলতেন- 'আখেরাতকে স্মরণ রাখো। পার্থিব

জীবনের ছোটখাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া কোরো না! এ সব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখো। কারণ আখেরাতে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে হবে।'

এক ডজন ডিম যেমন দেখতে সবগুলো এক রকম হলেও ভাঙ্গার পর কোনোটা ভালো আর কোনোটা নষ্ট বের হয়, তেমনি মানুষও ডিমের মতো। দেখতে সবাই এক। আখেরাতে যখন ভেতরের অবস্থা প্রকাশ পাবে তখন জানা যাবে কে ভালো ছিল আর কে খারাপ ছিল। তাই আল্লাহর কাছে আমাদের দুআ করতে হবে যে, দয়ালু প্রতিপালক! আমাদেরকে নেক কাজ করার এবং সৎ কাজে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন।

## স্থিরতার গুরুত্ব

সামান্য সামান্য পরিস্থিতিতে প্রভাবিত হয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া বা আমল থেকে মাহরুম হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয়। অনেককে জিজ্ঞেস করি– 'তেলাওয়াত করনি কেন?'

উত্তর দেয়– 'ব্যবসায় পেরেশানি থাকায়...!'

কাউকে জিজ্ঞেস করি– 'তাহাজ্জুদ আদায় করনি কেন?'

বলে– 'স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়েছিল তো...!'

পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে উঠে যেতে হবে। আনন্দ বা বেদনা, উভয় অবস্থাতেই আমল ঠিক রাখতে হবে। আমাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য গভীর রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে হবে। স্থিরতার সাথে আমল করলে দেখতে পাবেন, কীভাবে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। এ যুগের মুসলমানরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের কারণে হতাশ হয়ে যায়। পশ্চিমে এই হয়েছে বা পুবে এই হয়েছে, এ সব শুনেই হতাশায় ভোগে। ভাবে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্য করবেন না। ভেবে দেখুন, কীভাবে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়!

এক বক্তা একবার বলেছিলেন— আজ আমরা ভূমিকম্পকে ভয় করি, অথচ একটা সময় ছিল, যখন আমাদেরকে দেখে পুরো পৃথিবী কেঁপে উঠত!

আজ আমরা আঁধার দেখে ভড়কে যাই, অথচ একসময় আমাদের অস্তিত্বই দুনিয়াকে আলোকিত করে দিত!

মৃদু বৃষ্টিপাত দেখে আমরা ভিজে যাওয়ার ভয়ে পায়জামা গুটিয়ে নিই, অথচ আমাদের পূর্বপুরুষরা সমুদ্র বিদীর্ণ করে পথ করে নিয়েছিলেন!

আমাদের পূর্বসূরিরা সুউচ্চ পর্বত মাড়িয়ে গেছেন!

বিদ্যুৎ চমক দেখে মুচকি হেসেছেন!
মেঘের গর্জন শুনে হাসিমুখে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন!
ঘূর্ণিঝড় দেখে তার গতিমুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন!
টর্নেডো দেখে তাকে লক্ষ করে বলেছেন– এ পথ তোমার নয়!
কবির ভাষায়—

قوت تعمیر تھی کتنی خس و خاشاک میں
آندھیاں چلتی رہیں اور آشیاں بنتے رہیں

'খড়কুটোর মাঝেও তারা বৃক্ষ রোপন করেছেন,
প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের মাঝেও তারা নীড় রচনা করেছেন!'

তাই পরিস্থিতি যেমনি হোক না কেন, আমরা আমাদের আমল কিছুতেই ছেড়ে দিব না। পাবন্দির সাথে আপন রবের সামনে মুরাকাবায় বসতে হবে আর স্থিরতার সাথে নবী কারীম সা. এর প্রতি দুরুদ পাঠ করতে হবে।

## তরবারির ছায়ায় আমল

রাসূল সা. হযরত আলী রা. কে তাসবীহে ফাতেমী শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি নিয়মিত এর উপর আমল করে গেছেন। তিনি বলেন, 'আমি সারা জীবন এ তাসবীহ পাঠ করেছি।'

কেউ জানতে চাইল, 'জঙ্গে সিফফীনের দিন তো আপনি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ছিলেন, তখনও কি তাসবীহে ফাতেমী পাঠ করেছেন?'

তিনি বললেন, 'আমি সে রাতেও তাসবীহে ফাতেমী ছেড়ে দিইনি!'

এ হলো স্থিরতা ও নিয়মানুবর্তিতা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও আমলের ক্ষেত্রে এমন স্থিরতা অর্জনের তাওফীক দান করুন।

## সুযোগ পাওয়া যায় না কেন?

বর্তমানে আমরা শুধু এ অভিযোগ করি যে, আমলের সুযোগই পাই না!

ভাইয়েরা আমার!

মায়েরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন সন্তানের প্রশংসা করে! সময়ের প্রতি লক্ষ্যই থাকে না!

স্ত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বামীর কথা বলে বেড়ায়! স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট হলে প্রশংসা করে আর অসন্তুষ্ট হলে গীবত করে। এভাবে বহু সময় কাটিয়ে দেয়।

স্বামী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যবসায়িক কথাবার্তায় লিপ্ত থাকে।

আমরা কি একটা ঘণ্টাও আল্লাহ তাআলার সাথে নির্জনে কথা বলতে পারি না?

আমরা বলে থাকি, মুরাকাবার সময়ই পাই না!

কথাটা এমন যে, মজনু বলল, আমি লায়লাকে স্মরণ করার সময়ই পাই না!

এ কেমন মজনু?

এ যুগের সালিকরাও এমন!

তারা বলে, হযরত, মুরাকাবার সুযোগই পাই না!

আরে ভাই, কেন সুযোগ পান না?

ধরুন, পথ চলতে গিয়ে একজন মুসাফির আপনার পথরোধ করে বলল, ভাই, দুই মিনিট সময় দিন!

আপনি তো তখন পাঁচ মিনিট সময় বের করে নিতে পারবেন।

তার জন্য সময় বের করতে পারছেন, অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে মুরাকাবার জন্য পাঁচ মিনিট সময় বের করতে পারছেন না?

কী দুঃখজনক!

সুতরাং সবাই পাবন্দি ও গুরুত্বের সাথে মামুলাত আদায় করবেন। প্রতিজ্ঞা করে নিন যে, আজ থেকে আমরা কখনোই আমাদের আমল কাযা হতে দিব না।

এভাবে গুরুত্বের সাথে মুরাকাবা করে দেখুন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কেমন রহমত বর্ষিত হয়!

## অনুশোচনার অনুভূতির বরকত

একটি সূক্ষ্ম কথা জেনে রাখুন— যে ব্যক্তি গুনাহকে গুনাহ মনে করবে এবং নিজেকে অপরাধী ভাববে, সে জীবনে কখনো না কখনো তাওবার তাওফীক লাভ করবে। অনুশোচনার অনুভূতির বরকত এত বেশি যে, আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পূর্বে তাকে তাওবার তাওফীক দান করেন।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يا ابن آدم· إنْ ذكرتني ذكرتك وإن نسيتني ذكرتك.

'হে আদম সন্তান, তুমি আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাকে স্মরণ করি। তুমি আমাকে ভুলে গেলেও আমি তোমাকে স্মরণ করি।'

কতই না মেহেরবান আমাদের রব!

বর্ণিত আছে : বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে একবার বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। হযরত মুসা আ. পুরো জাতিকে নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার দুআ করতে গেলেন। সারা দিন দুআ করার পরও বৃষ্টির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করে বললেন, 'হে আল্লাহ, বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার কারণটা একটু বলে দিন না!'

তিনি ইরশাদ করলেন–

إن فيكم رجلا يبارزني منذ أربعين سنة.

'তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আছে, যে চল্লিশ বছর যাবৎ গুনাহের মাধ্যমে আমার সাথে যুদ্ধ করছে, আমার নাফরমানি করছে। এ কারণেই আমি বৃষ্টি বর্ষণ করছি না।'

হযরত মুসা আ. তো রাশভারী মানুষ ছিলেন। তখনি দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

من عصاه أربعين سنة؟

'কে চল্লিশ বছর যাবৎ আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করছে?'

কেউ দাঁড়াল না। অবাক ব্যাপার হলো, কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টিবর্ষণ আরম্ভ হলো। আল্লাহ তাআলা জানালেন, যার কারণে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ ছিল, তার কারণেই পুনরায় বৃষ্টিবর্ষণ আরম্ভ হয়েছে।

হযরত মুসা আ. জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে?'

বললেন— আপনার ঘোষণা শুনে গুনাহগার বান্দাটি মনে মনে আমার কাছে প্রার্থনা করল :

يا رب عصيتك أربعين سنة فاحلمتني فجئتك تائبا فاقبلني.

'হে আল্লাহ, আমি চল্লিশ বছর আপনার অবাধ্যতা করেছি, আপনি ধৈর্য ধরেছেন। আমাকে আযাব দেননি, অপমানিত করেননি। (আমি আমার গুনাহের কারণে লজ্জিত ও অনুশোচনায় জর্জরিত!) আজ আমি তাওবা করছি। আমার তাওবা কবুল করে নিন!'

ফলে আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করে নেন এবং বৃষ্টিবর্ষণ করেন। তিনি বলেন :

عبدي! تعرض عني وأنا مقبل إليك.

‘ওহে আমার বান্দা, তুমি আমার থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করো আর আমি তোমার প্রতি মনোনিবেশ করি। (তুমি কবে আমার প্রতি মনোনিবেশ করবে?)’

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের প্রতি মনোনিবেশ করব এবং এখনি আমাদের গুনাহ থেকে প্রকৃত তাওবা করে নিব।

## অজ্ঞতার প্রতিষেধক হলো মহব্বত

প্রিয় সুধী!

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে, অনেক সময় দুধের শিশু মায়ের চেহারায় থাপ্পড় দিয়ে বসে। মাকে থাপ্পড় দেয়া মারাত্মক অপরাধ, তা সত্ত্বেও মা তার হাত ধরে চুমু খান। মা কেন এমন করেন? কারণ মা জানেন– শিশুটি অবুঝ। সে যা করছে মহব্বতের কারণেই করছে। সে আমাকেই ভালোবাসে। আমাকে ছেড়ে কোথাও যায় না। কেউ তাকে দূরে নিয়ে গেলে আমার জন্য কান্নাকাটি আরম্ভ করে, ছটফট করতে থাকে। পুনরায় আমার কোলে না আসা পর্যন্ত শান্ত হয় না।

এ কারণেই অবুঝ শিশুর ভালোবাসাময় এ কাজ মাকে এত খুশি করে। শিশু কখনো শাস্তিযোগ্য কোনো কাজ করে ফেললেও মা তাকে মাফ করে দেন এবং তাকে চুমু খান।

বোঝা গেল, যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালককে মহব্বত করবে, তার ইবাদত করবে, তেলাওয়াত করবে, তাহাজ্জুদে ফরিয়াদ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে অবগত হবেন যে, সে তাঁকে মহব্বত করে। ফলে কখনো যদি মানবীয় দুর্বলতার কারণে গুনাহ করে বসে, তবে দয়াময় আল্লাহ সাজা দেয়ার পরিবর্তে তার ভুলকে বোকামি ভেবে পরিশেষে মাফ করেই দিবেন।

হায়, আমরা যদি আমাদের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পারতাম!!!

## আল্লাহর রহমতের প্রতি ভরসা

বন্ধুগণ!

মহান আল্লাহর রহমত বড়ই প্রশস্ত। আমরা আঁচল পাতলে কখনো তাঁর রহমত থেকে খালি হাতে ফিরব না।

এক আল্লাহওয়ালা দ্রুত গতিতে মসজিদ পানে যাচ্ছিলেন। মসজিদে প্রবেশ করে পেছনের কাতারে নিশ্চিন্তে বসে গেলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'হযরত, আপনি মসজিদ পানে আগমনের সময় দ্রুত গতিতে হাঁটছিলেন, অথচ মসজিদে এসে শেষ প্রান্তে বসে গেলেন যে?'
তিনি বললেন, 'মসজিদ পানে আসার সময় অন্তরে এ ভয় ছিল যে, এমন যেন না হয় যে নেকির এ মাহফিল শেষ হয়ে যাবে আর আমি তাতে অনুপস্থিত রয়ে যাব। তাই আল্লাহর রহমত লাভের জন্য দ্রুত গতিতে এসেছি। মসজিদে এসে পেছনের কাতারে বসে যাওয়ার কারণ হলো, আমি জানি, আল্লাহর রহমতের খাজানা এত ব্যাপক যে, তিনি সামনের কাতারসমূহের সবাইকে দান করলেও খাজানা শেষ হবে না। আমিও অবশ্যই রহমতের ভাগীদার হব।'

আল্লাহ তাআলার রহমতের উপর আল্লাহওয়ালাদের এত বেশি ভরসা থাকে। আমাদেরও উচিত, আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভর করা।
হে আল্লাহ, আপনি যাদেরকে এখানে একত্র করেছেন তাদের সবাই তো গুনাহগার নয়, এমন কিছু লোকও নিশ্চয় আছে, যারা পবিত্র জীবনযাপন করে; কিছু এমন লোকও আছে, যারা তাহাজ্জুদের সময় আপনার সাথে নির্জনে কথা বলে, মুনাজাত করে।
হে আল্লাহ, আমরা যদি মাকবুল না হই, তাহলে আপনার এই মাকবুল বান্দাদের উসিলায় আমাদের উপস্থিতিকে কবুল করে নিন।
হে আল্লাহ, আমরা সন্ধি করতে হাজির হয়েছি, আমরা আপনার সাথে সন্ধি করতে চাই।
হে আল্লাহ, আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন এবং আমাদের তাওবা কবুল করে নিন।

## অসহায়ের সহায়— আল্লাহ

মনে রাখবেন, বান্দা মনপ্রাণ দিয়ে, বিগলিত চিত্তে কোনো কথা বললে আল্লাহ তাআলা তার সেই অক্ষমতাকে কবুল করে নেন। কারণ সেই বান্দার

অনুভূতি এমন যে— আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো অবলম্বন নেই। আল্লাহ ছাড়া আমার এই সমস্যা সমাধানকারী কেউ নেই। আমার প্রয়োজন পূরণ করার মতো আর কেউ নেই। অবলম্বনহীনের একমাত্র অবলম্বন যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন।

হাদীস শরীফে আজিব এক ঘটনা আছে। বশীর নামক এক সাহাবী ছিলেন। বাবা-মার সাথে তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন। বয়স একদম কম ছিল। আল্লাহর ইচ্ছা, মদীনায় আগমনের পর তার মা ইন্তেকাল করেন। কিছু দিন পর উহুদ যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। তার পিতা জিহাদে শরিক হয়ে যান। তিনি একদম একা হয়ে যান। ছোট্ট শিশু; মা-ও নেই, বাবাও নেই! প্রতিবেশীদের ঘরে সময় কাটান। আল্লাহর ইচ্ছা, তার বাবাও জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়ে যান।

যুদ্ধ শেষে মুসলমান সেনাবাহিনী ফিরে আসছিল। মদীনার লোকেরা আপন পরিবার-পরিজনের অপেক্ষায় ছিল। ছোট্ট বশীরও মদীনার বাইরে গিয়ে একটি পাথরে উপবিষ্ট হয়ে বাবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। একে একে মুজাহিদরা আগমন করলেন। হযরত আবু বকর রা. এলেন, হযরত উমর রা. এলেন, হযরত উসমান রা. এলেন, হযরত আলী রা. এলেন। তার বাবাকে কোথাও দেখা গেল না। তিনি রাসূল সা. কে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আব্বু কখন আসবেন?'

রাসূল সা. বশীরের চেহারা দেখলেন। কী নিষ্পাপ মায়াবী চেহারা! মা-ও নেই, বাবাও শহীদ হয়ে গেছেন। আল্লাহর রাসূল সা. এর অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। তিনি বশীরকে বুকে তুলে নিয়ে বললেন—

يا حبيب ما يبكيك؟ أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك؟

'(বশীর! তুমি তোমার পিতাকে স্মরণ করছ?) ওহে প্রিয়! তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি এতে খুশি হবে না যে, আজ থেকে আমি তোমার বাবা হব আর আয়েশা তোমার মা হবে?'

বশীর বললেন, 'কেন নয়? আল্লাহ তাআলা তো আমার উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন!'

(কানযুল উম্মাল : হাদীস নং ৩৬৮৬২)

ভেবে দেখুন, যে অসহায় হয় আল্লাহ তাআলা তাঁর মাহবুবকে তার সহায় বানিয়ে দেন। তাই আমরা আজ আল্লাহর সামনে আমাদের আঁচল পেতে

দিয়ে বলব— হে পরওয়ারদেগার! আমরা গুনাহের কারণে পদে পদে ধাক্কা খেয়েছি, কত দিকে ঘুরেছি, কিন্তু কোথাও শান্তি পাইনি। হে আল্লাহ! আমরা আজ শান্তির সন্ধানে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি...!
কবির ভাষায়—

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی

میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں

হে আল্লাহ! আজ আমি প্রকৃতই আমার গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার তাওবা কবুল করে নিন।
ইয়া আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আমার প্রতি বরকত দান করুন।

## হযরত ঈসা আ. এর নসিহত

তাওরাতে আছে, হযরত ঈসা আ. তাঁর জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

'লোকেরা! তোমরা প্রার্থনা করো; তোমাদেরকে দেয়া হবে।
তোমরা অনুসন্ধান করো; পেয়ে যাবে।
দরজায় করাঘাত করো; দরজা খুলে দেয়া হবে।
তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যার সন্তান তার কাছে খাবার চাইবে আর সে তার মুখে পাথর পুরে দিবে?
তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার পুত্র মাছ খেতে চাইবে আর সে তার মুখে সাপ দিয়ে দিবে?
লোকসকল! তোমরা যদি মন্দ হয়েও আপন সন্তানের সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারো, তবে তোমাদের প্রতিপালক ভালো হয়েও কেন তোমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন না?'

বন্ধুগণ!

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন—

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ

'প্রত্যেকেই আপন পদ্ধতিতে কাজ করে।'
(সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৪)

আমার বান্দারা! তোমরা গুনাহ করে আমার দরবারে এসেছ। আমি ক্ষমাকারী প্রতিপালক। আমি তোমাদের সাথে উত্তম ব্যবহারই করব। আসো আমার দরবারে, আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিব।

## বান্দার জন্য আল্লাহর অপেক্ষা

বন্ধুগণ!

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, দয়ালু আল্লাহ তার গুনাহগার বান্দার জন্য যতটা অপেক্ষা করেন, একজন মা-ও তার সন্তানের জন্য এত বেশি অপেক্ষা করেন না। মা তার ছেলের জন্য কেমন অপেক্ষা করেন? ছেলে বাইরে গেলে মা তার ফেরার প্রতীক্ষায় থাকেন। শুয়ে থাকলে কারো পায়ের আওয়াজ শুনলেই ছেলের পায়ের আওয়াজ ভেবে উঠে বসেন; ছেলে এসেছে ভেবে দরজা খুলতে উদ্যত হন। মা যদি তার ছেলের জন্য এত অপেক্ষা করেন, তবে ভেবে দেখুন, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য কতটা অপেক্ষা করেন! তাই তিনি হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন—

من أقبل إلى لقيته من بعيد.

'যে আমার দিকে অগ্রসর হয়, আমি কাছে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাই।'

আল্লাহর রহমত অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আজই সবাই গুনাহ থেকে সত্য তাওবা করে নিন এবং আপন প্রতিপালকের কাছে তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টি দান করুন!

ইয়া আল্লাহ! আমাদের প্রতি রাজি-খুশি হয়ে যান এবং আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন!

এ কথাকে এক কবি পাঞ্জাবি ভাষায় বলেছেন—

سن فریاد میرے سوہنیا اللہ تے میں ہور سناواں کینوں
تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی تے میرے جئے لکھ تینوں

হে আল্লাহ! আমাদের মতো লাখো মানুষ আপনার ইবাদত করছে। কিন্তু আমরা তো আপনার মতো ক্ষমাকারী কোথাও পাব না! মেহেরবানি করুন! আজ আপনার বান্দারা আঁচল পেতে আছে; বান্দিরা আঁচল পেতে রেখেছে! হে আল্লাহ! এই বান্দা ও বান্দিদেরকে মাফ করে দিন! আমীন, সুম্মা আমীন!

﴿وَآخِرُ دَعْوٰنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ

(سورة الرعد : ٢٥)

বয়ান- ৫

# আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

صلۂ رحمی

বয়ান : শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী হাফিযাহুল্লাহ

তারিখ : ১৫ জানুয়ারি, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

স্থান : যয়নব জামে মসজিদ, মা'আদুল ফকীর আল ইসলামী, ঝাঙ্গ।

উপলক্ষ্য : জুমআর খুতবা।

## চয়নিকা

দেখুন, দুটি বাক্যের মধ্যে সব কথা চলে এসেছে—
صِلْ مَنْ قَطَعَكَ 'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক জোড়া দাও।' কী সুন্দর শিক্ষা!

এক ব্যক্তি আমার থেকে দূরে চলে যেতে চায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়, আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব, সে যেন আমার সাথে মিলেমিশে থাকে, নিকটে থাকে; আমাদের মধ্যে মহব্বত থাকে, ভালোবাসা থাকে। একসাথে বসবাস করলে কারো সাথে মনোমালিন্য হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাই শরীয়ত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, কখনো এমন হয়ে গেলে তোমরা অপরজনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, কৈফিয়ত প্রদান করো, 'দুঃখিত' বলো। আর অপরজনকে বলা হয়েছে, ভাই, তুমি দ্রুত তাকে মাফ করে দাও।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ:

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

وقال الله تعالى في مقام اخر :

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ

وقال الله تعالى في مقام اخر :

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ.

## ইসলাম হলো স্বভাবজাত ধর্ম

ইসলাম হলো মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। এটি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এক বিশাল নেয়ামত। সফল জীবনযাপনের সর্বোত্তম পন্থা। এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো— ইসলাম ধর্ম মানুষকে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার শিক্ষা দেয় এবং পরস্পরের সম্পর্ককে জোরালো করে। ইসলাম ধর্মের গণ্ডির ভেতর থাকা অবস্থায় পরস্পরের প্রতি মহব্বত ও হৃদ্যতা রাখার আদেশ দেয়া হয়। কারণ মানুষ আবেগ ও অনুভূতিসম্পন্ন। তাই ভালোবাসা ও হৃদ্যতা থাকলে একে অপরকে আনন্দিত রাখে আর ঘৃণা ও শত্রুতা থাকলে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

## দুতরফা সম্পর্ক

ইসলাম ধর্ম যেভাবে মানুষকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করেছে তেমনি অপরাপর মানুষের কাছাকাছিও করেছে। মানুষের এ সম্পর্ক দুতরফা :
একটি সম্পর্ক মাখলুক ও সৃষ্টিজীবের সাথে। বিশেষত তার পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয় যেমন- বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়তার সম্পর্ক। শরীয়ত এদের সাথে মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতে বলেছে।
দ্বিতীয় সম্পর্ক তার স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার সাথে। মানুষের কর্তব্য হলো- আল্লাহর সাথেও সম্পর্ক রাখা। কেউ যদি এ দুটি সম্পর্কের কোনো একটাতেও উদাসীনতা প্রদর্শন করে তবে সে অসম্পূর্ণ মানুষ বলে গণ্য হবে।

সুস্থ মানুষ তাকেই বলা হয় যার পুরো শরীর সুস্থ থাকে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে তাকে সুস্থ বলা হয় না। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক রাখে, সবাইকে খুশি রাখে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে, তবে সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও দুনিয়াদার মানুষ। আর যে ব্যক্তি অনেক দীনদার, আল্লাহ তাআলার সব ইবাদত ঠিকমতো আদায় করে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ। উভয় প্রকার মানুষ আল্লাহ তাআলার অপছন্দ। আল্লাহ তাকেই পছন্দ করেন, যে দুটি সম্পর্ককেই ঠিক রাখে।

## ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য

ইসলাম ধর্মের একটি সৌন্দর্য এই যে, এ ধর্ম সমাজে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা স্থাপনের প্রতি জোর দেয়। এক হাদীসে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ
وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

‘হে লোকসকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটাও। ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াও। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো। লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন (তাহাজ্জুদের) নামায আদায় করো এবং নিরাপত্তার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করো।’
(সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীস ৩২৫১; সুনানে দারেমী : হাদীস নং ১৫০১)

এ হাদীস ভিন্ন রেওয়ায়াতেও বর্ণিত আছে। তবে সেখানে তিনটি কথা আছে : সালামের প্রসার ঘটানো, খানা খাওয়ানো ও রাতের নামায আদায়। আর সুনানে ইবনে মাজাহর উক্ত হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

## আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার অর্থ হলো- আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা। ইসলাম ধর্ম সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলার পরিবর্তে সম্পর্ক জোড়া দেয়াকে পছন্দ করে। ইসলাম ধর্মের সুন্দর একটি শিক্ষা হলো- মানুষ পরস্পরের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রেখে এবং সামাজিকভাবে মিলেমিশে জীবনযাপন করবে।

## মজবুত সমাজের জন্য বুনিয়াদি চারটি বিষয়

সমাজের লোকদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়, মজবুত ও হৃদ্যতার হতে হলে চারটি বিষয় থাকা খুবই জরুরি—

**১. বংশ :**

বংশ বা খান্দান। সমাজের সবার জানা থাকতে হবে যে, কোন ব্যক্তি কোন বংশের। তাই তো মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا

'আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও।'
(সূরা হুজুরাত : ১৩)

**২. বিবাহ :**

বংশ রক্ষার জন্য বিবাহের বিধান দেয়া হয়েছে যে, পুরুষ ও নারী একসাথে জীবনযাপন করতে চাইলে বিয়ে করতে পারবে। বিয়ে ব্যতীত নারী-পুরুষের একত্রে অবস্থান গুনাহের কাজ।

বিবাহের অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন- বংশপরিচয় জানা যায়, নারীর নিরাপত্তা বিধান হয়, মোহর নির্ধারণ হয় আর নারী তার স্বামীর মীরাস

লাভের হকদার হয়। নারীরা বিয়ে না করলে পুরুষ জাতি তাদেরকে টিস্যু পেপারের মতো ব্যবহার করে; ব্যবহার শেষে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। ইসলাম ধর্ম নারী জাতিকে নিরাপত্তা দিতে বিবাহের বিধান করেছে।

**৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা :**

বিয়ের পর কর্তব্য হলো- আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। পরিবার হওয়ার পর বংশের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করতে হবে।

**৪. উত্তরাধিকার :**

মৃত্যুর পর মীরাস বা উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বণ্টন করা। ইসলাম ধর্মে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে কীভাবে বণ্টন করতে হবে।

এ চারটি বিষয় সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। এর উপর ভিত্তি করে মজবুত সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

ইসলাম ধর্ম এ শিক্ষা দিয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজন একে অপরের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবে। মিলেমিশে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই ভুল বোঝাবুঝি হয়, মনোমালিন্য হয়। এ অবস্থায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ জিদ পূরণ করলে একজনের চেহারা থাকবে পূর্ব দিকে, আরেকজনের চেহারা থাকবে পশ্চিম দিকে। তাই এ ক্ষেত্রে সরল সঠিক ধর্ম ইসলামের শিক্ষা হলো, দুজনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজের জিদ ও ক্রোধ সংবরণ করে অপরজনকে কাছে টেনে নিবে। একেই বলে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা।

## শরীর ও আত্মার উদাহরণ

এর উদাহরণ এভাবে বুঝে নিন যে, মানুষের শরীর বিভিন্ন রকম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি। প্রতিটি অঙ্গের নিজস্ব ও পৃথক গুণ রয়েছে। সে গুণের ভিত্তিতে এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের চেয়ে ভিন্ন, বরং একে অপরের বিপরীত। যেমন- চোখ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, বাকি পুরো শরীর অন্ধ। যবান বাকশক্তিসম্পন্ন, এছাড়া পুরো শরীর বোবা। কান শ্রবণক্ষমতার অধিকারী, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বধির। এভাবে প্রত্যেকটি অপরটির বিপরীত। অন্যভাবে বললে, আল্লাহ

তাআলা মানুষের দেহকে বিপরীতমুখী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি বানিয়েছেন। তবে এ সবের মধ্যে এমন একটি বস্তু দিয়েছেন, যা সবগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করে। এর নাম রূহ বা আত্মা। যতক্ষণ মানুষের দেহে আত্মা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ সকল অঙ্গ একত্রে মিলেমিশে কাজ করে।

জীবিত মানুষের হাতে আঘাত লাগলে পা কখনো ডাক্তারের কাছে যেতে অস্বীকার করে না। জখম হয় হাত, অশ্রু প্রবাহিত হয় আঁখিযুগল থেকে। অথচ আঁখিযুগল আহত হয়নি। মানবদেহের সকল অঙ্গ এক হওয়ার কারণে একজনের খুশি সবার খুশি, একজনের দুঃখ সবার দুঃখ। পেটে পীড়া হলে পা কখনো বলে না যে, এটা আমার ব্যাপার নয়, পেটের সমস্যা সেই দেখবে। রাতে নিদ্রা না আসলে চোখ জেগে থাকে, এতে পুরো শরীর অস্থির হয়ে যায়।

সুতরাং জীবিত মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এক অঙ্গের কষ্ট বা বেদনা পুরো শরীর অনুভব করে আর এক অঙ্গের আরাম পুরো দেহ উপভোগ করে। সবাই এক ও অভিন্ন। এর কারণ কী? রূহ বা আত্মাই সবাইকে এক বানিয়ে রাখে। এই আত্মাকে দেহ থেকে বের করে দিলে কী হবে? সব অঙ্গ পৃথক হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির জিহ্বা টেনে বের করে দুই টুকরো করে ফেললেও তার চোখ থেকে বিন্দুমাত্র অশ্রুপাত হবে না; বাধা দিতে তার হাত অগ্রসর হবে না; তার পা সাড়া দিবে না যে, পলায়ন করে প্রাণ বাঁচাবে। এর কারণ একমাত্র এই যে, শরীরটি প্রাণহীন, আত্মাবিহীন। পরস্পরের মাঝে যে একতা ছিল, হৃদ্যতা ছিল, তা রূহের কারণেই ছিল।

## গৃহের মাঝে দীন হলো আত্মার ন্যায়

উপরের উদাহরণটি বুঝে থাকলে মানুষের গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। একটি পরিবারে আল্লাহ তাআলা যে কয়জন মানব সৃষ্টি করেছেন তাদের সবাই নিজস্ব অবস্থান অনুযায়ী একে অপরের বিপরীত। যেমন- বাবার যে অবস্থান তা অন্য কারো অর্জন করা সম্ভব নয়। পুত্র পিতা হতে পারে না, পিতা পুত্র হতে পারে না, ভাই কখনো বোন হতে পারে না, বোনও ভাই হতে পারে না, মা কিছুতেই কন্যা হতে পারবে না, কন্যাও কখনো মা হতে পারবে না।

প্রত্যেকেরই নিজস্ব অবস্থান রয়েছে। সে হিসেবে একটি পরিবারও বিপরীতধর্মী কয়েকজন মানুষের সমষ্টি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝেও এমন এক নেয়ামত দান করেছেন, যার মাধ্যমে এক পরিবারের সবাই মিলেমিশে থাকতে পারে, যেমনিভাবে আত্মা বিদ্যমান থাকলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একসাথে থাকে। এই নেয়ামতের নাম ইসলাম। আমাদের ঘরে ও পরিবারে যদি ইসলাম থাকে তাহলে তা আত্মাযুক্ত দেহের ন্যায়। পরিবারের একজনের অনুভূতি সবাই ভাগ করে নিবে, একজনের খুশিতে সবাই খুশি হবে, একজনের বেদনায় সবাই বেদনার্ত হবে। এভাবে সবাই মিলেমিশে থাকবে। পরস্পরের প্রতি মহব্বত থাকবে, ভালোবাসা থাকবে। শরীয়ত এরই নির্দেশ দিয়েছে। আর যদি এমন হয় যে, ঘর একটি, কিন্তু পরস্পরের সাথে বিরাট দূরত্ব, তবে এ পরিবার প্রাণহীন দেহের ন্যায়।

শরীয়ত এর সীমা আরো বিস্তৃত করেছে। শরীয়তের নির্দেশ— শুধু পরিবারই নয়, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাদের সাথে তোমাদের রক্তের সম্পর্ক। তাই তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো, সবার সাথে মিলেমিশে থাকো। এভাবে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকে শরীয়ত অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। যে এ সম্পর্ক রক্ষা করে না তাকে শরীয়ত ভালো দৃষ্টিতে দেখে না। মানুষের মূল্য এখানেই যে, মানুষ একে অপরের সুখ-দুঃখ অনুভব করে। এই অনুভব ছেড়ে দিলে তো মানুষের মূল্যই থাকে না।

## মানুষ ও রোবটের মাঝে পার্থক্য

ধরুন, আপনি কোনো রোবটকে পানি এনে দিতে বললেন। সে পানির পেয়ালা নিয়ে এল। এতে কি তার সওয়াব হবে? কখনোই না। কারণ সে অনুভূতিশূন্য। পক্ষান্তরে কোনো মানুষ যদি আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করে তাহলে সে অবশ্যই নেকি পাবে। কেননা তার মধ্যে সহমর্মিতা ও মহব্বতের অনুভূতি রয়েছে।

এক ইংরেজ বিজ্ঞানী একটি ফিকশন লিখেছিলেন। ফিকশন বলা হয় কল্পকাহিনীকে। তাতে তিনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন। আমি ছাত্রজীবনে তা পাঠ করেছিলাম। বিষয়বস্তু চলনসই হওয়ায় তা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি।

তিনি লেখেন— ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এত বেশি উন্নতি করবে যে, এমন এক রোবট আবিষ্কৃত হবে, যা মানুষ থেকে সব দিক দিয়ে উত্তম হবে। যেমন- মানুষ দিনে দেখে, রাতের আঁধারে দেখে না। সেই রোবট আলো-আঁধারে সমানভাবে দেখতে পাবে। মানুষ কয়েকশ গজ দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না, সেই রোবটের অভ্যন্তরে এমন দূরবীন স্থাপন করা হবে, যার ফলে সে হাজার মাইল দূরের বস্তুও দেখার যোগ্যতা লাভ করবে। মানুষের শ্রবণশক্তি নিতান্তই সীমাবদ্ধ, সেই রোবটের শ্রবণক্ষমতা অনেক ব্যাপক হবে।

আমি একবার যাদুঘরে ছোট্ট একটি পতঙ্গ দেখেছিলাম। ক্যাপশনে লেখা ছিল— এ পোকা এত তীক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন যে, সে দশ মাইল দূর থেকে স্বজাতির উপস্থিতি বুঝে ফেলে।

তার অনুভূতি কত বেশি! মানুষের চেয়েও বহু গুণ বেশি। দেয়ালের পাশে কেউ থাকলে আমরা তা বুঝতে পারি না। কেউ স্ত্রীর সাথে রাগ করলে সে সামনে বসে থাকলেও দেখতে পায় না। অথচ এই ছোট্ট পোকার অনুভূতিশক্তি এতটাই প্রবল যে, দশ মাইল দূরত্ব থেকেও কারো উপস্থিতি টের পেয়ে যায়।

কুকুরের ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে অনেক তীব্র। বর্তমানে কোথাও চুরি-ডাকাতি হলে অপরাধীকে ধরতে কুকুর লেলিয়ে দেয়া হয়। সে অপরাধস্থল থেকে অপরাধীর শরীরের ঘ্রাণ নেয়, এরপর ছোটা শুরু করে। কয়েক মাইল দূরে লুকিয়ে থাকলেও অপরাধীকে সহজেই খুঁজে বের করে ফেলে। সেই রোবটের ঘ্রাণশক্তিও এমন প্রখর হবে।

মানুষ কিছু শব্দ শুনতে পায় আর নির্দিষ্ট সীমার বাইরের শব্দ শুনতে পায় না। অথচ বিভিন্ন প্রাণী বহু দূরের আওয়াজও শ্রবণ করে। এই রোবটের মধ্যেও এমন ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

মানুষ সাধারণত এক ধরনের বিষয়বস্তুর উপর পড়াশোনা করতে পারে। হয় দীনি পড়াশোনা, নয়তো দুনিয়াবি পড়াশোনা। যারা দুনিয়াবি পড়াশোনা করে তারাও যে কোনো একটি দিক গ্রহণ করতে পারে। হয় ডাক্তার, নয়তো ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কিছু। সেই রোবটের মাঝে এমন মেমোরি সংযুক্ত করা হবে, যাতে দীনি-দুনিয়াবি উভয় প্রকার জ্ঞান থাকবে। পৃথিবীকে প্রায় পঞ্চাশ প্রকারের জ্ঞান আছে, তার সবই রোবটটির মেমোরিতে থাকবে। মানুষ

সর্বোচ্চ পাঁচ-ছয়টি ভাষা বুঝতে পারে ও বলতে পারে, সেই রোবট দুনিয়ার শতাধিক ভাষায় সমানভাবে পারদর্শী হবে। সব ভাষার অভিধান তার মেমোরিতে দেয়া হবে।

মানুষ কয়েক ঘণ্টা কাজ করে ক্লান্ত হয়ে যায়। এই রোবট ক্লান্ত হবে না। সে ক্ষুৎ-পিপাসা থেকে মুক্ত হবে। মোটকথা, বিজ্ঞানীরা এমন এক রোবট তৈরি করবে, যা সব দিক থেকে মানুষের চেয়ে উত্তম হবে।

এ সকল কথা উল্লেখ করে তিনি লেখেন— কেয়ামতের দিন রোবটের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী আল্লাহর সামনে রোবট উপস্থাপন করে বলবে, 'হে আল্লাহ, আপনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন আর আমিও এক অতুলনীয় বস্তু সৃষ্টি করেছি। আমার সৃষ্টি আপনার সৃষ্টি থেকে উত্তম।'

আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আচ্ছা, তোমার সৃষ্টি দেখাও তো।'

সে দুই-তিনটি রোবট হাজির করবে।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'একটু চালনা করে দেখাবে?'

সে সুইচ অন করবে আর রোবটগুলো চলাফেরা ও কথাবার্তা আরম্ভ করবে।

তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতে একটি রোবটের মধ্যে এমন সমস্যা সৃষ্টি করে দিবেন যে, তার একটি অংশ বিকল হয়ে যাবে। যন্ত্র নষ্ট হওয়ার শব্দ হবে এবং রোবটটি স্থির হয়ে যাবে। বাকি দুই রোবট স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আমার বান্দা, তোমার রোবটের অবস্থা দেখলে?'

সে উত্তর দিবে, 'জি আল্লাহ, দেখলাম। একটি বিকল হয়ে গেলেও অন্যগুলো চলছে।'

আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আচ্ছা, এবার আমার সৃষ্টিজীব দেখো।'

আল্লাহ তাআলা তিনজন মানুষকে উপস্থিত করবেন। তাদের মধ্যে একজনকে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত করে দিবেন। সে অসুস্থ হয়ে পড়ামাত্রই অন্য দুজন ছুটে আসবে এবং জিজ্ঞেস করবে— ওষুধ এনে দিব? খাওয়ার কিছু এনে দিব?

ব্যথা একজনের, অথচ অন্যদের চোখেও অশ্রু চিকচিক করবে।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তুমি যা সৃষ্টি করেছ তা এতটাই অনুভূতিহীন যে, একটা বিকল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাকিরা তা অনুভব করেনি। আর

আমার সৃষ্টিজীব অনুভূতিপ্রবণ, আবেগপ্রবণ ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। এবার বলো, তোমার সৃষ্টি উত্তম, নাকি আমার সৃষ্টি?'

তখন সে লোক আল্লাহর সামনে সেজদাবনত হয়ে বলবে, 'বাস্তবে আপনার সৃষ্টিজীবের নজির তৈরি করতে পারবে না কেউই!'

উপরের কাহিনীটি যদিও কাল্পনিক, তবে তা থেকে এতটুকু স্পষ্ট হয় যে, মেশিনের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এ কারণেই যে, অনুভূতিসম্পন্ন ও ভালোবাসায় ভরা একটি অন্তর রয়েছে মানুষের। এ ভালোবাসা না থাকলে মানুষ ও মেশিনের মধ্যে কী পার্থক্য রইল? তাই ইসলাম ধর্ম পরস্পরের সাথে হৃদ্যতা ও মিল-মহব্বত কায়েম করার আদেশ দিয়েছে। একেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা বলে। যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তাদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতা থাকতে হবে।

## ভালোবাসাও হতে হবে শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, এ ভালোবাসাও হতে হবে শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে থেকে। উক্ত সুযোগ গ্রহণ করে কারো এ কথা বলার অধিকার নেই যে— আমাকে গুনাহ করতে দাও, অন্যথায় আমি অসন্তুষ্ট হব। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে—

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা করে সৃষ্টিজীবের আনুগত্য বৈধ নয়।'
(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : নং ৩৩৭১৭)

যে ব্যক্তিই তোমাকে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করতে বলবে, সে তার মর্যাদা খুইয়ে ফেলবে। বাবা-মা যদি বলে— নামায আদায় কোরো না, তবে তা মানা যাবে না। পিতা-মাতা বলল— ঘুষ নাও, হারাম নিয়ে আসো! এমন আদেশ মান্য করা যাবে না। সুতরাং শরীয়তের গণ্ডির ভেতর থেকে আমরা সবার সাথে হৃদ্যতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করব। শরীয়ত এরই আদেশ দিয়েছে।

কোনো ব্যক্তি যদি রাতদিন জায়নামাযে বসে ইবাদত-বন্দেগি করে, কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের সাথে তার সম্পর্ক ভালো না হয়; কারো হৃদয়ের ডাক যদি সে অনুভব না করে, না পিতা-মাতার, না উসতাদ-পীরের, না পাড়া-

প্রতিবেশীর, আর না আত্মীয়-স্বজনের। তবে শরীয়ত তার ব্যাপারে বলে যে, মানুষকে কষ্ট দেয়ার কারণে এ লোক সবার আগে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

## মুহাম্মাদি শরীয়তের সুন্দর শিক্ষা

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে এত সুন্দর ধর্ম দান করেছেন, যা মানুষকে পরস্পরের সাথে হৃদ্যতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করে মিলেমিশে থাকতে বলে। যে ব্যক্তি এ সকল সম্পর্ক স্থাপন করে তার অনেক নেকি লাভ হয়। রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ

'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করো।'

(মুসনাদে আহমাদ : নং ১৬৬৯৬)

রাসূল সা. কে আল্লাহ তাআলা এ মুজিযা দান করেছিলেন যে, তিনি আরবের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। ছোট্ট কয়েকটি শব্দে বা বাক্যে তিনি বড় বড় বিষয়বস্তু বলে দিতেন। কথায় আছে না, নদীকে পাত্রে আটকে দেয়া! তিনি যেন সমুদ্রকে ছোট পাত্রে আবদ্ধ করে দিতেন। এই যে দেখুন দুটি শব্দে কী বিশাল আলোচনা করেছেন!

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ

'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করো।'

কী সুন্দর শিক্ষা!

এক ব্যক্তি আমার থেকে দূরে চলে যেতে চায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়, আমার কর্তব্য হলো- তাকে কাছে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা; তার সাথে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা রাখা। একসাথে বসবাস করলে কারো সাথে মনোমালিন্য হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাই শরীয়ত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, কখনো এমন হয়ে গেলে তোমরা অপরজনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো,

কৈফিয়ত প্রদান করো, 'দুঃখিত' বলো। আর অপরজনকে বলা হয়েছে, ভাই, তুমি দ্রুত তাকে মাফ করে দাও।

অভিজ্ঞ ড্রাইভারদেরও অনেক সময় এক্সিডেন্ট হয়ে যায় না? দেখা যায়, অনেক দক্ষ ড্রাইভার, বিশ-বাইশ বছর ধরে গাড়ি চালায়, সেও অনেক সময় এক্সিডেন্ট করে বসে। তেমনি ভালো দুজন মানুষের মাঝে মনোমালিন্য হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে শরীয়তের আদেশ হলো— এ মনোমালিন্যকে স্থায়ী হতে দিয়ো না। একে দূর করো। অনুভূতিসম্পন্ন হও। বান্দা যদি এ বিষয়টি অনুভবই না করে তবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। তাই তো হাদীস শরীফে এসেছে—

وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وأَحسِنْ إلى من أسَاءَ إلَيْكَ

'যে তোমার উপর যুলুম করে তুমি তাকে মাফ করে দাও আর যে তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করো।'

(জামিউল আহাদীস : নং ১৩৫৭৮)

কী চমৎকার শিক্ষা! এতেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। যে ব্যক্তির মাঝে এ তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, ভেবে দেখুন সে একটি পরিবারের কত উত্তম সদস্য হবে!

শরীয়ত মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে সম্পর্ক জোড়া দিতে। বর্তমানে তো মানুষের অন্তর থেকে এমনভাবে ভালোবাসা বিদায় নিয়েছে যে, মানুষ তার সহোদর ভাইয়ের প্রতিও সহমর্মিতা দেখায় না। এটা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। হাদীস শরীফে এসেছে যে, কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত হলো— মানুষের অন্তর থেকে সম্পর্কের অনুভূতি বিদায় নিবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, সম্পর্ক জোড়া দেয়া, সবার সাথে সম্পর্ক ভালো রাখা, সবার ভালো-মন্দের দিকে লক্ষ রাখা, অপরের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা ইত্যাদিকে শরীয়ত খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحمَنُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

'অনুগ্রহকারীদেরকে মহান অনুগ্রহকারী অনুগ্রহ করেন। তোমরা জমিনবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, তাহলে আসমানবাসী তোমাদের প্রতি দয়ালু হবেন।'
(তিরমিযী : হাদীস নং ১৯২৪)

জারীর রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়াতে আছে—

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

'যে মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে দয়া করেন না।'
(সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৭৩৭৬)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিষয়টিও দয়া প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যে একে রক্ষা করবে আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করবেন আর যে তা ছিন্ন করবে আল্লাহ তাআলাও তাকে বিচ্ছিন্ন রাখবেন। আরেক হাদীসে রাসূল সা. ইরশাদ করেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا.

'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না আর বড়দেরকে সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'
(তিরমিযী : হাদীস নং ১৯১৯)

কী অতুলনীয় ইসলাম ধর্মের শিক্ষা!

সাধারণত দেখা যায়, মানুষ যৌবনে একে অপরের প্রতি লক্ষ রাখলেও বার্ধক্যে কেউ কারো সঙ্গ দেয় না। তাই এক্ষেত্রেও ইসলামের শিক্ষা অত্যন্ত মহান। রাসূল সা. এর বাণী—

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ

'যে মুসলমানের দাড়ি সাদা হয়ে গেছে তাকে সম্মান করা মহান আল্লাহকে সম্মান করার নামান্তর।'
(সুনানে আবু দাউদ : হাদীস নং ৪৮৪৫)

আপনারাই বলুন, বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এরচেয়ে মহান বাণী আর কী হতে পারে?

মহানবী সা. ইরশাদ করেন :

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

'যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, তার প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হয় না।'

(সহীহ বুখারী : নং ৬০১৩)

আরেক হাদীসে রাসূল সা. ইরশাদ করেন :

الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ

'সৃষ্টিজীব মহান আল্লাহর পরিবার। আর আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহর পরিবারের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।'

(শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী : নং ৭০৪৮)

তাই আমাদের কর্তব্য হলো— নিজ বাড়ি ও সমাজের সর্বোত্তম ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া। নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও অন্যকে উপকৃত করার চেষ্টা করা।

রাসূল সা. একবার বাজারের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তিনি দোকানদারদের লক্ষ করে বললেন—

زِنْ وَأَرْجِحْ

'তোমরা পণ্য ওজন করো এবং মাপে বেশি দাও।'

(সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং ১৩০৫)

অর্থাৎ দোকানদারদের উচিত, পণ্য কিছু বেশি দিয়ে গ্রাহককে খুশি করা। এ বিষয়টিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত যে, মানুষ নিজের ক্ষতি স্বীকার করে হলেও অন্যকে উপকৃত করার চেষ্টা করবে। এক হাদীসে তো এমন বক্তব্যও রয়েছে যে, বিরোধিতাকারী আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করলে মানুষ উত্তম সদকার সওয়াব লাভ করে।

## আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার উপকারিতা

যে ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষা করে এবং সবার সাথে হৃদ্যতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলে, হাদীস শরীফে তার কিছু উপকারিতার কথা আলোচিত হয়েছে। আশা করি আপনারা তা অন্তরের কান দিয়ে শুনবেন এবং এ নিয়তে শুনবেন যে, আমরা এর উপর আমল করে এ সকল ফায়দা লাভে সচেষ্ট হব। উপকারিতাসমূহ নিম্নরূপ :

## ভালোবাসা বৃদ্ধি

রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন যে, আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার দ্বারা ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ রাখে, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের সাথে যাওয়া-আসা ও সাক্ষাৎ করে এবং প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে দাঁড়ায়, মানুষ তাকে পছন্দ করে। সে সবার চোখের পুতলি হয়ে ওঠে।

## সম্পদ বৃদ্ধি

রাসূল সা. আরো বলেন— 'যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, আল্লাহ তাআলা তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন।'

একটি হলো সম্পদের প্রাচুর্য, আরেকটি হলো সম্পদের বরকত। সম্পদের মধ্যে বরকত হওয়ার অর্থ হলো- যে লোকের যতটুকু সম্পদ আছে, ততটুকুই তার প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হওয়া। আর সম্পদের মধ্যে বরকতহীনতার অর্থ হলো- সম্পদের পরিমাণ অনেক বেশি হলেও তাতে প্রয়োজন পূরণ না হওয়া।

হাদীসে বলা হয়েছে- আল্লাহ তাআলা সম্পদে বৃদ্ধি ঘটাবেন। এ কারণেই যে ব্যক্তি স্বজনদের পেছনে খরচ করে, তাদেরকে হাদিয়া-তোহফা দেয়, বাসায় দাওয়াত দেয়, আপনারা দেখবেন আল্লাহ তাআলা অতি দ্রুত তার সম্পদ বাড়িয়ে দেন।

বর্তমানে কত লোক সম্পদহীনতার অভিযোগ করে। অথচ রাসূল সা. সম্পদ বৃদ্ধি করার অব্যর্থ উপায় বলে গেছেন। আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের জন্য ব্যয় করেই দেখুন না, কীভাবে আল্লাহ তাআলা সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন।

## বয়স বৃদ্ধি

নবী কারীম সা. আরো বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কারণে মানুষের বয়সও বাড়িয়ে দেয়া হয়। তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় আছে, মহান আল্লাহ তার মৃত্যুকে বিলম্বিত করে দেন। অর্থাৎ তার বয়স বেড়ে যায়। প্রতিটি মানুষেরই ব্যাকুল কামনা থাকে- সম্পদ ও দীর্ঘ সুস্থ জীবন লাভ করা। আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তা রক্ষার বিনিময়ে এ নেয়ামত দান করেন।

## রিযিকে প্রশস্ততা

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কারণে আল্লাহ তাআলা রিযিকেও প্রশস্ততা দান করেন। রিযিকের প্রশস্ততার বিষয়টি বলার কারণ হলো- এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক কোটিপতি আছে, যাদের দিনরাত শুধু টেনশন আর টেনশন। নানা রকমের দুশ্চিন্তা। তাদের কোটি টাকা যেমন আছে, তেমনি কোটি টাকা ঋণও আছে। বাহ্যিকভাবে তাদের গাড়ি-বাড়ি, সোনা-দানা ও সব ধরনের প্রাচুর্য থাকলেও মনে শান্তি থাকে না। সারাক্ষণ টেনশনে অস্থির থাকে। যেমন- কোম্পানির শেয়ার এত হয়ে গেছে, কন্ট্রাক্ট ফেঁসে গেছে, পেমেন্ট আটকে গেছে ইত্যাদি। চব্বিশ ঘণ্টা মানসিক অস্থিরতায় কাটে তাদের। একে রিযিকের প্রশস্ততা বলে না। এ কারণেই বলা হয়েছে- আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর সম্পদও আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধি করে দেন এবং সম্পদে এমন বরকত ও প্রশস্ততা দান করেন যে, সকল টেনশন দূর করে দেন। মানুষের জন্য এটি কত বড় কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক বিষয়!

## অপমৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকা

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার আরেকটি বড় উপকারিতা হলো- মহান আল্লাহ মানুষকে অপমৃত্যু ও দুর্ঘটনা থেকে হেফাযতে রাখেন। এই একটি ফায়দাই এত চমৎকার যে, অন্তত এটি অনুধাবন করলেও আমরা আত্মীয়তা রক্ষার জন্য উঠে পড়ে লাগব। আপনাকে যদি কেউ এমন কোনো ফর্মুলা বলে দেয়, যার মাধ্যমে জীবন সায়াহ্নে সুন্দর মৃত্যু লাভ করতে পারবেন, তবে আপনি নিশ্চিত বলে উঠবেন— আমি তো স্বর্ণের খনি পেয়ে গেছি!

উম্মতের প্রতি রাসূল সা. কী পরিমাণ অনুগ্রহ করে গেছেন যে, তাদেরকে তিনি মহামূল্য এক ফর্মুলার কথা জানিয়েছেন— যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ এর বরকতে তাকে অপমৃত্যু থেকে নিরাপদে রাখবেন। প্রত্যেক মানুষের মনেই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে- তার জীবনের শেষাংশ যেন সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত হয়! তার যেন মর্যাদার মৃত্যু হয়! এ মহান নেয়ামত মানুষ লাভ করে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কল্যাণে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখেছি, এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সবাই তাকে অভিশম্পাত করে। সবাই বলে, লোকটা মরেছে, যাক বাঁচা গেল!

এ হলো অপমৃত্যু।

আত্মীয়তা রক্ষার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে সুন্দর মৃত্যুর সৌভাগ্য দান করেন।

এ হাদীসে আরো আছে : আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি থেকে বিপদ-মুসিবত সরিয়ে দেন। আপনাদের অনেকেই হয়তো এ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন যে, পায়ে হেঁটে বা মোটর সাইকেলে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন, হঠাৎ এক্সিডেন্ট থেকে কোনোমতে রক্ষা পেলেন। এই যে এক্সিডেন্ট করতে গিয়েও বেঁচে গেলেন, খুব সম্ভব আত্মীয়তা রক্ষা করার কারণে আল্লাহ তাআলা এ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। অন্যথায় আহত হতেন, হাড়গোড় ভেঙ্গে যেত, মাসের পর মাস হাসপাতালের বেডে পড়ে থাকতে হত, মাথায় দুশ্চিন্তার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ত! আল্লাহ তাআলা এই পেরেশানি থেকে রক্ষা করলেন।

অনেকেই আমার কাছে এসে কাহিনী শোনায় যে, একটুর জন্য বেঁচে গেছে! এভাবে কে রক্ষা করেন? আল্লাহ তাআলা! এমনি কোনো আমলের কারণে রক্ষা করেন। তো আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তা রক্ষাকারীকে বিপদাপদ থেকে হেফাযত করেন।

একজন আমাকে তার জীবনের একটি কাহিনী শোনালেন যে— একবার আমার ফয়সালাবাদ সফর ছিল। বাস স্টেশনে গিয়ে চেষ্টা করলাম যেন প্রস্তুত বাসের টিকেট পেয়ে যাই। কিন্তু সে বাসে জায়গা পেলাম না। আমি লাইনে ছিলাম, আমার পাশেরজন টিকেট পেয়ে গেল, কিন্তু আমি টিকেট পেলাম না। আমার খুব রাগ লাগছিল। আফসোস করছিলাম। আধ ঘণ্টা পরের গাড়িতে আমি রওনা হই। পথে এক স্থানে পৌঁছে জানতে পারি, আগের গাড়িটি মারাত্মক এক্সিডেন্ট করেছে। অকুস্থলেই দশজন মারা গেছে। তখন আমি অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলাম যে, এ গাড়িতে টিকেটের ব্যবস্থা না করে আপনি আমার প্রতি কত বড় অনুগ্রহ করেছেন!

মানুষ যে এভাবে বিভিন্ন মুসিবত থেকে বেঁচে যায়, তা নেক আমলের বরকতে হয়। মহানবী সা. ইরশাদ করেন, যে বান্দা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া দেয়, মহান আল্লাহ তার বিপদাপদ দূর করে দেন।

## পাপ মোচন

আরেকটি বিরাট ফায়দা হলো- যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে, মহান আল্লাহ তার নেক আমলের বরকতে তার গুনাহ মাফ করে দেন। আত্মীয়তা রক্ষা করা বড় বড় গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার উপায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

'নিশ্চয় নেক কাজ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।'

(সূরা হুদ : ১১৪)

সুতরাং মানুষ যদি বেশি বেশি নেক কাজ করে তবে তা কত শত গুনাহ মাফের মাধ্যম হয়ে যাবে!

## আমল কবুল হওয়া

আল্লাহর রাসূল সা. আরো বলেন : আল্লাহ তাআলা এমন বান্দার নেক আমলসমূহকে কবুল করে নেন। দেখুন, কত বড় ফায়দা! মানুষ কত নেকিই তো করে, কিন্তু তা তো সেই মাপকাঠিতে পড়ে না যা আল্লাহর শান উপযোগী হবে। তাই কোয়ালিটি ভালো না হওয়ার কারণে সম্ভাবনা থাকে যে, তা কবুল হবে না।

মানুষের স্বভাবও এর ব্যতিক্রম নয়। যেমন ধরুন, আপনি কোনো দোকানে গিয়ে আপেল দিতে বললেন। দোকানদার আপেল দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কলা নিবেন না?

কলা দেখে আপনার পছন্দ হলো না। বলে দিলেন, কলা লাগবে না। এই যে একনজর দেখেই বলে দিলেন কলা লাগবে না, এর কারণ কী? কারণ এই কলা আপনার পছন্দ হয়নি।

তেমনি হতে পারে যে, আমাদের প্রাণহীন নামায ও সেজদা, রিয়া ও লৌকিকতায় পরিপূর্ণ আমাদের আমলসমূহ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা একনজর দেখেই বলবেন- এমন আমলের প্রয়োজন নেই আমার।

তখন কী হবে আমাদের?

গুনাহের ব্যাপারে অনুশোচনা আর আমল কবুল না হওয়ার দুঃখ ভিন্ন জিনিস। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার কল্যাণে আল্লাহ তাআলা মানুষের নেক আমলকে কবুল করে নেন।

## জান্নাত লাভ

এরপর নবী কারীম সা. বলেন : যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার যোগ্য ও হকদার বানিয়ে দিবেন।

## রহমত বর্ষণ

রাসূল সা. আরো দুটি কথা বলেছেন : আল্লাহ তাআলা ঐ জাতির উপর রহমত বর্ষণ করেন, যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। যদি একজন ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষা করে তাহলে শুধু তার উপর রহমত বর্ষণ করা হয়। আর আমরা পুরো জাতি মিলে যদি এ আমল করি এবং শরীয়তের এ বিধানের গুরুত্ব মাথায় রাখি, তাহলে এর ফলে আল্লাহ তাআলা পুরো জাতির উপর রহমত নাযিল করবেন।

## বরকত বর্ষণ

হাদীস শরীফে রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন : যে দেশে আত্মীয়তা রক্ষাকারী জাতি বসবাস করে, আল্লাহ তাআলা সে দেশের আবাদি ও ফসলে বরকত দান করেন। ফসল বেশি হয়, ফল বেশি হয়, বসন্ত থাকে, দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পায়। বর্তমানে যেমন বিভিন্ন জিনিসের দুর্ভিক্ষ ও মন্দা দেখা দেয়, আল্লাহ তাআলা এ সকল মুসিবত থেকে রক্ষা করেন।

## আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ

হাদীস শরীফে সর্বশেষ যে ফায়দার কথা বলা হয়েছে তা জেনে সবাই আনন্দিত হবে। রাসূল সা. বলেন : 'আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তির সাথে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেন।'

শরীয়তের একটি নিয়ম হলো- যেমন নেকি তেমন বিনিময়। আত্মীয়তা রক্ষাকারী ব্যক্তি যেহেতু আল্লাহর জন্য আল্লাহর বান্দাদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধন তৈরি করে, তাই আল্লাহ তাআলা তাকে বলেন— ওহে আমার বান্দা! এখন আমি তোমার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক তৈরি করব।

এ কারণেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়; যদিও সে অনেক ইবাদতগুযার হয়, তেলাওয়াত করে, নামায আদায় করে, সব সময় জায়নামাযেই বসে থাকে এবং দীনের কাজ করে।

# আত্মীয়তা ছিন্ন করার অপকারিতা

## দুনিয়াতেই শাস্তি

হাদীস শরীফে এসেছে, এমন চারটি গুনাহ রয়েছে, যার শাস্তি আখেরাতে তো হবেই, আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেও তার শাস্তি প্রদান করেন। অর্থাৎ কিছু গুনাহ তো এমন, যার শাস্তি আখেরাতে প্রদান করা হবে, যার ফলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। আর চারটি গুনাহ এমন, যা করলে দুনিয়াতেও তার শাস্তি পেতে হবে।

এর মধ্যে একটি হলো অহংকার। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অহংকার ও গর্ব করে তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, এই অহংকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই তাকে আমি লাঞ্ছিত করে দেখাব।

ইতিহাস পাঠ করে দেখুন, পৃথিবীতে কত বড় বড় অহংকারী ও ফেরআউন এসেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের পরিণতি কী করেছেন? সবাইকে দুনিয়াতেই অপমানিত ও অপদস্থ করে ছেড়েছেন। সুতরাং অহংকার, গর্ব, আত্মম্ভরিতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বড়ত্ব প্রকাশ সাজে কেবল আল্লাহর, বান্দার সাজে বিনয় অবলম্বন করা। আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে নত হব, বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ করব, কোনো ধরনের বড়ত্ব জাহির করব না। কারণ বড়ত্ব প্রকাশের কারণে দুনিয়াতেই একাধিকবার সাজা পেতে হয়। কাউকে আল্লাহ তাআলা একটু বেশি নেয়ামত দেন, তখন সে ঐ নেয়ামত হজম করতে পারে না। তখন তার কথাবার্তায় সম্পদের গর্ব প্রকাশ পায়। মনে রাখতে হবে, যে মহান প্রতিপালক সম্পদ দিয়েছেন তিনি তা কেড়ে নিতেও সক্ষম। তিনি দুনিয়াতেই এমন দাম্ভিককে শাস্তি প্রদান করেন।

দ্বিতীয় গুনাহ হলো- পিতা-মাতার নাফরমানি করা। বাবা-মার ছোটখাট নির্দেশ অমান্য করা। বিশেষ করে বর্তমানে স্কুল-কলেজের কমবয়সী ছেলে-মেয়েরা তো বাবা-মাকে কিছুই মনে করে না। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। বিশেষত মা-কে 'খোদার গাভী' মনে করা হয়। তাই শরীয়ত ধমকি দিয়ে বলেছে- পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান দুনিয়াতেই শাস্তি পাবে।

মুলতানে আমার এক ডাক্তার বন্ধু থাকেন। তিনি বিস্ময়কর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তার ভাষায় শুনুন—

একবার আমার কাছে এক গ্রাম্য যুবক চিকিৎসার জন্য এল। সুস্বাস্থ্যবান। তার রোগ এত মারাত্মক ছিল যে, সারাক্ষণ তীব্র চিৎকার করে কাঁদত এবং বলত, আমার গলা টিপো না! আমার গলায় চাপ দিয়ো না!

অর্থাৎ তার রোগ হলো, সে সব সময় এমন অনুভব করে যে, তার গলায় যেন কেউ চাপ দিচ্ছে!

আমি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম।

তার করুণ অবস্থা দেখে আমার অনেক খারাপ লাগল এবং চোখে পানি এসে গেল!

তার বাবা বললেন, 'আপনি একে দেখে কাঁদছেন! জানেন কেন এমন হয়েছে? তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে সে!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করেছিল সে?'

তিনি বললেন, 'যুবক বয়সে তার বিয়ে হলো। সে নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। তার স্ত্রী আমাদের সাথে থাকা পছন্দ করত না। তাই বিয়ের পরেই সে স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক হয়ে গেল। স্ত্রী তাকে বলল বাবা-মায়ের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে। স্ত্রীর কথামতো সে বাবা-মায়ের সাথে যোগাযোগ ও কথাবার্তা বন্ধ করে দিল।

তার মা তাকে বুঝিয়ে বলত যে, 'বেটা, আমি তোমার মা! মাঝেমধ্যে অন্তত আমার সাথে সাক্ষাৎ করো।'

উত্তরে সে বৃদ্ধা মা-কে বলত, 'চুপ করো! আমার সাথে কথা বললে আমি তোমার গলা টিপে দিব!'

মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ দুনিয়াতেই তাকে এমন শাস্তি দিয়ে যেন বলছেন- তুমি মায়ের গলা টিপে দিতে চাও, আমি তোমার গলা টিপে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি!

অহংকারের শাস্তি এভাবেই দুনিয়াতে পেতে হয়।

তৃতীয় গুনাহ হলো- অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। আজকাল তো সন্তান বাবা-মায়ের অবাধ্য, ছাত্ররা উসতাদের অবাধ্য, প্রজারা সৎশাসকের অবাধ্য, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য। এ অবাধ্যতা ও নাফরমানির শাস্তি আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন।

চতুর্থ বিষয় হলো- আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। আত্মীয়তা ছিন্নকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই সাজা প্রদান করেন।

## জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া

এক হাদীসে আছে, 'আত্মীয়তা ছিন্নকারীকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দিবেন না।'

## শবে কদরের ফযিলত থেকে বঞ্চিত হওয়া

আরেক হাদীসে আছে, 'আল্লাহ তাআলা শবে কদরে বড় বড় পাপীকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু কিছু পাপী এ রাতেও ক্ষমা পায় না। তাদের মধ্যে একজন হলো- আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি।'

ভাবনার বিষয়!

যে রাতে আল্লাহ তাআলার রহমত মুষলধারে বর্ষিত হয়, শত বছরের পাপীও যে রাতে ক্ষমা পেয়ে যায়, এমন বরকতময় রাতেও আত্মীয়তা ছিন্নকারী ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে মাহরুম থাকে।

## জুমআর বরকত থেকে মাহরুমি

হাদীস শরীফে এসেছে : প্রতি জুমআর দিন প্রত্যেক মানুষের আমল আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থাপন করা হয়। কিছু আমল দৈনিক পেশ করা হয়। তারপর সারা সপ্তাহের আমল জুমআর দিন পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, ফেরেশতারা তার আমল আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থাপন করে না।

## আল্লাহর রহমত থেকে মাহরুমি

হাদীস শরীফে এসেছে : একবার রাসূল সা. সাহাবীদের মজলিসে আগমন করে বললেন, 'যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে যেন আমার মজলিসে না বসে!'

এ কথা শুনে এক যুবক উঠে বাসায় গেল। কোনো কারণে সে তার খালার সাথে কথা বলত না। তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল। তাই সে ঘরে গিয়ে খালার কাছে মাফ চাইল, এরপর মজলিসে ফিরে এল।

রাসূল সা. তাকে ফিরে আসতে দেখে বললেন, 'উক্ত কথা বলার কারণ হলো- যে মজলিসে আত্মীয়তা ছিন্নকারী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, আল্লাহ তাআলা সেই মজলিসের লোকদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন না।'

কী মারাত্মক ব্যাপার! যে মজলিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী উপস্থিত

থাকে, আল্লাহ তাআলা সেই মজলিস থেকে রহমত সরিয়ে রাখেন। ভেবে দেখুন, আজ আমাদের অবস্থা কী? আমাদের জীবনে বরকত কীভাবে আসবে? আমরা যে রিযিকের সঙ্কীর্ণতার অভিযোগ করি, আমরা যে মুসিবতের অভিযোগ করি, বরকতহীনতার অভিযোগ করি, দুনিয়াবি বিপদাপদে আপতিত থাকার অভিযোগ করি, এমন তো নয় যে, এর জন্য দায়ী আত্মীয়তা রক্ষা না করা?

## তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ

শরীয়ত যাদেরকে নিকটাত্মীয় আখ্যা দিয়েছে, তাদের সবার সাথে শরীয়তের সীমার ভেতর থেকে ভালোবাসা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক রাখা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, কারো সাথে বেশি সম্পর্ক রাখবে, কারো সাথে শুধু সালাম দেয়ার সম্পর্ক রাখবে। কারো সাথে যদি মনের মিল না হয়, যেমন- কারো ক্রোধ বেশি, তার সাথে সম্পর্ক গভীর হচ্ছে না। এক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ হলো- তুমি তার সাথে সম্পর্ক একটু কম রাখো, কিন্তু সালাম-মুসাফাহার সম্পর্ক অবশ্যই রাখবে। যাতে তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী হিসেবে গণ্য না হও। শরীয়তে তিন দিনের বেশি কারো সাথে কথা বন্ধ রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। শরীয়তের নির্দেশ— ক্রোধ দমন করো! একে অপরকে ক্ষমা করে দাও!

## সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও!

এটা আমাদের ধর্মের সৌন্দর্য যে, সবার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি এত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ভেবে দেখুন, আমরা যদি দীনের এ সকল শিক্ষার উপর আমল করি, তাহলে আমাদের ঘরে কী পরিমাণ সুখ আসবে! আমাদের সমাজ কী পরিমাণ শান্তিময় হয়ে উঠবে!

এ কারণেই তো বলা হয়- ইসলাম হলো জগৎময় ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়ার ধর্ম। আমরা যদি এর উপর আমল করা আরম্ভ করি, তাহলে দুনিয়াতে থেকেই আমরা জান্নাতে বসবাসের স্বাদ পাব।

আমরা সবাই অপরের কল্যাণকামী হব; সবাই একে অপরের সুখ কামনা করব; একে অপরের ভাই হয়ে যাব।

রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন :

كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

'ওহে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে জীবনযাপন করো।'
(মুসনাদে আহমাদ : ১৯/৪৩০ নং ৯৭৬৩)

## নিজেকে পর্যবেক্ষণ করুন

শরীয়তের নির্দেশ :

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وأَحسِنْ إلى من أسَاءَ إِلَيْكَ

'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করো।
যে তোমার উপর যুলুম করে তুমি তাকে মাফ করে দাও আর যে তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করো।'

এ হাদীসকে সামনে রেখে আমরা আমাদের জীবনকে দেখব এবং যাচাই করব যে, আমাদের ভেতর কি এ তিনটি গুণ রয়েছে? থাকলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করব এবং এর উপর অটল থাকার দুআ করব। আর অবহেলা থাকলে (যার সম্ভাবনাই বেশি) আজই তাওবা করে নেয়া উচিত।

## আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক তৈরি করুন

যার ব্যাপারে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রয়েছে, সে যদি মুমিন হয়, তবে এ বিদ্বেষ দূর করে তার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আমরা তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক তৈরি করবেন। রাসূল সা. বলেন : 'আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তির সাথে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেন।'

এক হাদীসে আছে : 'আত্মীয়তা রক্ষা করা আল্লাহর রহমতের একটি শাখা। যে তা রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করবেন, আর যে তা ছিন্ন করবে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।'

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ হাদীসের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন!

﴿وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

(سورة الحجرات : ١٢)

বয়ান- ৬

# কুধারণার প্রতিকার

بدگمانی کا زہر

বয়ান : শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী হাফিযাহুল্লাহ

তারিখ : ২ নভেম্বর, ২০০৬ খ্রি.; ১৮ শাবান, ১৪২৭ হি.

স্থান : হযরতের বাসস্থান।

উপলক্ষ্য : বার্ষিক ইজতেমার পর বিশেষ মজলিস

## চয়নিকা

কুধারণা কেন হয়? একটি মূলনীতি মনে রাখবেন যে, কুধারণা তখনি হয়, যখন বান্দা যিকির করে না। যে আল্লাহর যিকির করবে না বা সম্পর্ক রাখবে না, তার মনে সর্বদা কুধারণা আসতেই থাকবে। যে সম্পর্ক রাখবে ও যিকির করবে, তার মনে কুধারণা আসা সম্ভবই নয়। যে বলবে- তার মনে কুধারণা তৈরি হয়; এই 'কুধারণা' শব্দটিই বলে দিচ্ছে যে তার অন্তরে অন্ধকার রয়েছে। কারণ কোনো ঘরে আঁধার থাকলেই কীট-পতঙ্গ বের হয়, আলো থাকলে পোকা-মাকড় ভয়ে বেরই হয় না। তেমনি অন্তর আলোকিত হলে কুধারণা আসতেই পারবে না।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ:

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿۴۱﴾

وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿۴۲﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ظُنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ خَيْرًا.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ.

## আল্লাহর স্মরণ

কুরআন মাজীদে আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন বেশি বেশি আমাদের প্রতিপালককে স্মরণ করি। ইরশাদ হচ্ছে—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿۴۱﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকহারে আল্লাহর যিকির করো।'

(সূরা আহযাব : ৪১)

স্মরণ করার স্থান হলো মানুষের অন্তর। যবান থেকে প্রকাশ পায় আর অন্তরে স্মরণ হয়। উদাহরণত কারো পুত্র চাকরি বা অন্য কোনো কাজে

মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকলে মা তাকে সব সময় চিঠিতে লেখেন— বেটা, আমার অন্তর তোমাকে অনেক স্মরণ করে।
তিনি এ কথা লেখেন না যে, বেটা, আমার যবান তোমাকে অনেক স্মরণ করে; আমার মস্তিষ্ক তোমাকে অনেক স্মরণ করে।
এর দ্বারা বোঝা যায় যে, স্মরণ করার স্থান হলো মানুষের হৃদয়। তাই আল্লাহ তাআলার স্মরণও মানুষের অন্তরেই হবে।

## অন্তরের যিকিরের ফযিলত

হাদীস শরীফে এসেছে : 'ফেরেশতারা যে যিকির শ্রবণ করেন (যা যবান দিয়ে করা হয়) তা থেকে সত্তর গুণ বেশি ফযিলত ঐ যিকিরের যা তারা শ্রবণ করে না (অর্থাৎ যা অন্তর দিয়ে করা হয়)'

সুতরাং 'যিকরে খফী' (অপ্রকাশ্য যিকির) ও 'যিকরে জাহরী' (প্রকাশ্য যিকির) উভয়টিই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যিকরে খফীকে 'যিকরে কলবী', 'যিকরে সিররী' ও 'যিকরে খামেল'ও বলা হয়। সবগুলো শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সবই অন্তরের স্মরণ বোঝায়। একেই 'রুজু ইলাল্লাহ', 'ইনাবাত ইলাল্লাহ' ও 'তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ' (আল্লাহমুখী হওয়া) বলে।

## আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ সৃষ্টির পদ্ধতি

আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা সালেককে প্রথমে আল্লাহর যিকির করতে বলে থাকি। উদাহরণত যে শিশু কুরআন মাজীদ শিখতে আসে তাদেরকে প্রথমে নূরানী কায়েদা পড়ানো হয়। কেউ যদি আপত্তি করে বসে যে, নূরানী কায়েদা পড়ার কথা তো হাদীসে বলা হয়নি। উত্তরে তাকে বলতে হবে- আরে বেকুব, নূরানী কায়েদা তো শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার একটা মাধ্যম। কায়েদা পড়ে সে মাখরাজ ও ইরাবের পরিচয় লাভ করে। এরপর তার জন্য কুরআন মাজীদ পড়া সহজ হয়ে যায়। তেমনি 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির একটি মাধ্যম। এর ফলে মানুষের অন্তরে আল্লাহমুখিতা সৃষ্টি হয়। আর যখন আল্লাহমুখিতা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন তাকে ফিকির বলে, যা যিকির থেকেও বেশি উত্তম। আমাদের সিলসিলায় যারা সবক নিতে আসে তারা জানে যে, প্রথম সাত সবক পর্যন্ত যিকির থাকে, এরপর তাহলীলের দুটি সবক রয়েছে, তারপর ফিকিরের সবক। তখন থেকে

'আল্লাহ আল্লাহ'র যিকির শেষ হয়ে যায়। 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকিরের উদ্দেশ্যও এটাই যে, প্রাথমিকদের জন্য আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা সহজ হয়ে যায়।

বিষয়টি বুঝে নিন! এটি একটি আজিব বিষয় যে, মানুষের অন্তর যখন সৃষ্টিজীবের মাঝে আটকে থাকে তখন তা ছাড়ানোর জন্য পীর সাহেবগণ তাকে 'আল্লাহ আল্লাহ'র যিকির করতে বলেন। এতে তার অন্তরে শুধু আল্লাহ তাআলার স্মরণ থাকে। সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে শুধু আল্লাহর সাথেই সম্পৃক্ত হয়। 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকিরের পর তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকির করানো হয়। এরপর তাকে মুরাকাবা করানো হয়, যেখানে কোনো নাম উল্লেখেরই প্রয়োজন হয় না। দশম সবক থেকে নিয়ে পঁয়ত্রিশতম সবক পর্যন্ত যত মুরাকাবা রয়েছে তাতে কোনো নাম উল্লেখ করা হয় না। সুতরাং প্রথমে যে 'আল্লাহ আল্লাহ'র যিকির করানো হয় তা পথ্য হিসেবে হয়ে থাকে, যাতে প্রাথমিকদের জন্য আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ সহজ হয়ে যায়।

## সত্তাগত ও গুণগত তাজাল্লীর মধ্যে পার্থক্য

এ কথাও মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সিফাতী তথা গুণগত নামের যিকির করবে সে ফানার স্তরে পৌঁছে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। যেমন- সুবহানাল্লাহ একটি যিকির, আলহামদুলিল্লাহ একটি যিকির, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কায়্যুম-ও যিকির। যেহেতু তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার গুণগত নাম ছিল, তাই কিছু সময়ের জন্য সে আল্লাহ তাআলার সত্তার দীদার লাভ করবে। এরপর তার উপর সিফাতের পর্দা চলে আসবে। এমন সালেক আল্লাহ তাআলাকে দর্শন করে সিফাতের আবরণের ভেতর দিয়ে। আর যে সালেক শুধু আল্লাহ শব্দের যিকির করে সে সরাসরি আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ করে, সিফাতের আবরণ আসে না।

আমাদের নকশবন্দী সিলসিলার একজন বড় বুযুর্গ, ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এ কারণেই বলেছেন, 'যারা আল্লাহ তাআলার সিফাতী ও গুণবাচক নামসমূহের যিকির করে তারা বিদ্যুৎ চমকের মতো সাময়িক সময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী লাভ করে।'

অর্থাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো হঠাৎ আল্লাহ তাআলার সত্তার দীদার ও দর্শন লাভ করে, এরপর সিফাতের আবরণ চলে আসে। যেন দুলহান মুখের নেকাব সরিয়ে সৌন্দর্যের ঝলক দেখিয়েই আবার মুখ ঢেকে ফেলল!
অপরদিকে যারা আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নামের যিকির করে তারা সরাসরি সাক্ষাৎ ও দর্শন লাভ করে। অর্থাৎ একবার চেহারা থেকে আবরণ সরিয়ে নেয়ার পর সালেক সর্বদা তা দর্শন করে। একে 'তাজাল্লী যাতী দায়েমী' বলে।

সাধারণ মানুষ তো ভাবে, সুবহানাল্লাহ-এর যিকির কেন করা হয় না? আলহামদুলিল্লাহ-এর যিকির কেন করা হয় না? এই মারেফাতি কথা তাকে কে বোঝাবে? এটি তো শুধু তারাই জানেন, যারা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে প্রত্যক্ষ করেন। তারা বুঝতে পারেন, নাম ও সিফাতের আবরণ অন্তরায় সৃষ্টি করলে তা মানুষের জন্য কতটা খেদের কারণ হয়।

## 'আল্লাহ আল্লাহ'র যিকির কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

আমাদের শায়খগণ শুধু আল্লাহ শব্দের যিকির করতে বলেছেন। এর কারণ হলো- কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে :

قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرۡهُمۡ فِیۡ خَوۡضِهِمۡ یَلۡعَبُوۡنَ ﴿۹۱﴾

'আপনি বলুন- "আল্লাহ", এরপর তাদেরকে ছেড়ে দিন, যেন তারা খেলাধুলায় মত্ত থাকে।'
(সূরা আনআম : ৯১)

হাদীসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল সা. ইরশাদ করেন :

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الأَرْضِ: اللَّهُ اللَّهُ.

'ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না জমিনে আল্লাহ আল্লাহ বলার মতো লোক বিদ্যমান থাকবে।'
(সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং ৩৩৩১/২২০৭)

এ হাদীসে দুইবার আল্লাহ শব্দ এসেছে। একবার এলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু এসেছে দুইবার- আল্লাহ আল্লাহ। নবী কারীম সা. যেহেতু দুইবার আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন, তাই এখন যদি কেউ বারবার একে পুনরাবৃত্তি করে— আল্লাহ আল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ, তবে তাতে কীসের

আপত্তি থাকতে পারে? রাসূল সা. আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন তো? এটা তো তাঁর পবিত্র যবান থেকে উচ্চারিত শব্দ। তাই এ বিষয় নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই যে, আল্লাহ আল্লাহর যিকির কেন করা হয়?

## একটি প্রশ্নের উত্তর

অনেকের আপত্তি- কোনো কথা নেই, শুধু নাম নেয়া, এ তো বেয়াদবি! উত্তরে বলব- আরে ভাই, নিজের উপর আল্লাহকে কিয়াস করা উচিত নয়। কথায় আছে—

اَلْمَرْءُ يَقِيْسُ عَلٰى نَفْسِهٖ.

'মানুষ নিজের উপর অন্যকে কিয়াস (তুলনা) করে।'

বাস্তবেই যদি আমরা কাউকে তার নাম ধরে বারবার ডাকতে থাকি তাহলে সে অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু এটা বান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক আদবের, এটা ভিন্ন বিষয়। এখানে হলো মহব্বতের সম্পর্ক। মহব্বতের সম্পর্কের ভিত্তিতে বান্দা যখন ভালোবাসা ভরে আল্লাহ আল্লাহ ডাকে তখন আল্লাহ তাআলা তা শুনে আনন্দিত হন।

হযরত শাইখুল হাদীস দামাত বারাকাতুহুম বলেছেন যে, ছোট্ট শিশু কেঁদে কেঁদে কী বলে? আম্মু আম্মু-ই তো বলে। কখনো কোনো ছোট্ট বাচ্চাকে এভাবে বলতে শুনেছেন?— আমার প্রিয় আম্মু! আমার সুন্দর আম্মু! আমার অনেক ভালো আম্মু!

আলহামদুলিল্লাহ ও সুবহানাল্লাহ-এর যিকির, তাতে তো এমনি গুণের উল্লেখ রয়েছে। কোনো শিশু কি ওভাবে তার মাকে ডাকে? শিশুরা কীভাবে ডাকে? শুধু আম্মু বলে ডাকে। কিন্তু তার মহব্বতের সম্পর্ক এমনি যে, আম্মু ডাক শোনামাত্রই মা বেচাইন হয়ে ওঠেন। নাম শোনার সাথে সাথেই সকল কাজ ফেলে সন্তানের দিকে ছুটে আসেন এবং তাকে বুকে জড়িয়ে নেন। এমনিভাবে বান্দা যখন আল্লাহর নাম মহব্বতের সাথে নেয় তখন তিনি আরো বেশি মহব্বতের সাথে বান্দার দিকে মনোনিবেশ করেন।

## আল্লাহ আল্লাহ ডাকের স্বাদ

আসলে আমরা এখনো আল্লাহ আল্লাহ বলার স্বাদ ও মজা পাইনি, তাই আমরা এ ধরনের আপত্তি করে থাকি। যারা স্বাদ পায় তাদের মুখ তো মিষ্টি হয়ে যায়। দেখুন, মিষ্টি ও টক এমন শব্দ, যা বললে জিভে জল আসে। তাহলে আল্লাহ শব্দ বললে মুখে স্বাদ অনুভূত হবে না? এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, আচারের নাম নিলে জিভে জল আসে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নাম নিলে এতটুকু প্রভাব পড়ে না যে, অন্তর শীতল হয়ে যাবে!!

## আল্লাহ্ শব্দের প্রভাব

খাজা আবুল হাসান খারকানী রহ. নামে একজন বুযুর্গ ছিলেন। একবার তার মাহফিলে বিখ্যাত দার্শনিক ও হাকিম আবু আলী ইবনে সীনা আগমন করলেন। হযরত তখন 'ইসমে যাত'-এর ফযিলত বর্ণনা করছিলেন যে, ইসমে যাতের যিকির করলে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে, পেরেশানি দূর হয়, বিপদাপদ থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে, ঈমান নিরাপদ থাকে, সুস্থতা লাভ হয়, বয়সে বরকত ও রিযিকে বরকত হয়, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হয়। এভাবে তিনি ইসমে যাতের এত বেশি ফযিলত বয়ান করছিলেন যে, তা শুনে ইবনে সীনা অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'শুধু একটি নামের যিকির করলেই এত এত ফযিলত লাভ হয়? এত কিছু হয়?'

হযরতও দার্শনিক ছিলেন। তিনি ভরা মজলিসে ইবনে সীনাকে লক্ষ করে বললেন, 'ওহে গাধা, তুমি কী জানো?'

ইবনে সীনা ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত হাকিম ও চিকিৎসক। ভরা মজলিসে এত লোকের সামনে তাকে গাধা সম্বোধন করায় তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তিনি ঘামতে আরম্ভ করলেন। তার অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করে হযরত বললেন, 'হাকিম সাহেব! আপনার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল কেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'আসলে আপনি এমন শব্দ বলেছেন, যা শুনে আমার এমন অবস্থা হয়েছে!'

বুযুর্গ বললেন, 'আমি গাধা শব্দ বলতেই আপনার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল, আল্লাহ শব্দ কি আপনার অবস্থা পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম নয়? গাধা শব্দ

শুনে আপনার সারা দেহে প্রভাব পড়ল, আল্লাহ শব্দ শুনে কি প্রভাব পড়তে পারে না?'

মূলত আমরা আল্লাহর যিকিরের স্বাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাই আমাদের অন্তরে এত প্রশ্ন জাগে!

কবির ভাষায়—

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے
کہ تیرے بحر کی موج میں اضطراب نہیں

'তোমার সমুদ্রের ঢেউয়ে কোনো কম্পন নেই,
খোদা যেন তোমায় কোনো তুফানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন!'

কারো সাথে সম্পর্ক থাকলে তার কথা শুনে কান খাড়া হয় কি না? বিয়ের দিন বর-কনের প্রথম পরিচয়ের সময় একে অপরের নাম নিলে অপরজনের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে কি না? এত সামান্য দুনিয়াবি সম্পর্কের কারণে মানুষের উপর যদি এমন প্রভাব পড়ে, তবে আল্লাহ তাআলার সাথে তো মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর।

## কুধারণা কখন হয়?

অনেকেই একটি প্রশ্ন করেন- কুধারণা কখন হয়? উত্তরে একটি মূলনীতি মনে রাখবেন যে, কুধারণা তখনি হয় যখন মানুষ যিকির করে না। যে আল্লাহর যিকির করবে না বা সম্পর্ক রাখবে না, তার মনে সর্বদা কুধারণা আসতেই থাকবে। যে সম্পর্ক রাখবে ও যিকির করবে, তার মনে কুধারণা আসা সম্ভবই নয়। যে বলবে- তার মনে কুধারণা তৈরি হয়; এই 'কুধারণা' শব্দটিই বলে দিচ্ছে যে তার অন্তরে অন্ধকার রয়েছে। কারণ কোনো ঘরে আঁধার থাকলেই কীট-পতঙ্গ বের হয়, আলো থাকলে পোকা-মাকড় ভয়ে বেরই হয় না। তেমনি অন্তর আলোকিত হলে কুধারণা আসতেই পারবে না। পানি কোথাও স্থির হয়ে থাকলে তাতে পোকা-মাকড় জন্ম নেয়। তেমনি মানুষের অন্তর আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল থাকলে তাতে কুধারণার পোকা-মাকড় জন্ম নেয়।

# কুধারণা কী?

অন্যের ব্যাপারে কোনো মন্দ কথা মনে মনে ভাবাকে কুধারণা বলে। শরীয়ত কুধারণাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। রাসূল সা. ইরশাদ করেন :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

'তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাকো! কেননা অধিকাংশ কুধারণা মিথ্যা হয়ে থাকে।'

(সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৫১৪৩, ৬০৬৪)

মুমিনদের সম্পর্কে কুধারণা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন :

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

'তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসু নয়।'

(সূরা নাজম : ২৮)

তাই তো মানবতার ধারক শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সা. ইরশাদ করেন :

ظُنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ خَيْرًا.

'মুমিন নারী-পুরুষের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করো! (কুধারণা পোষণ কোরো না!)'

(আল মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী : নং ২৩৯)

শরীয়ত যেহেতু মুমিনদের ব্যাপারে নেক ধারণা পোষণ করার আদেশ দিয়েছে, তাই কেয়ামতের দিন মানুষকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে কুধারণা করেছিলে কেন? এ ব্যাপারে দলিল উপস্থাপন করো। পক্ষান্তরে বান্দা যদি কারো ব্যাপারে সুধারণা করে তবে ঐ লোক খারাপ হলেও সে সওয়াব পাবে। বিষয়টি কতই না মজার! কেউ মন্দ হলেও তার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করলে আল্লাহ তাআলা নেকি দান করেন। আর কুধারণা করলে কেয়ামতের দিন সে ব্যাপারে শরয়ী দলিল পেশ করতে হবে, প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। অন্যথায় মানুষ নিজেই এ অপরাধে ধৃত হবে।

এখন তো মানুষ আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেও কুধারণা পোষণ করে। নাউযুবিল্লাহ! তাওবা তাওবা! কুধারণা এত বড় রোগ যে, এরচেয়ে বড় রোগ

আর কিছু হতে পারে না। এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে সারা জীবনের আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন মাজীদে মুমিনদের ব্যাপারে কুধারণা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

'নিশ্চয় কিছু ধারণা গুনাহ হিসেবে গণ্য হয়।'
(সূরা হুজুরাত : ১২)

## কুধারণার চিকিৎসা

আমাদের শায়খগণ লিখেছেন যে, কোনো মুসলমানের ব্যাপারে কোনো বিষয়ে কুধারণা সৃষ্টি হলে তার কোনো ভালো ব্যাখ্যা বের করতে হবে। এমনকি যদি একশর মধ্যে নিরানব্বইটি মন্দ দিক হয় আর মাত্র একটি ভালো দিক পাওয়া যায়, তবে সেই ভালো দিকটিই গ্রহণ করতে হবে। যাতে মনে কুধারণা তৈরি না হয়।

আমাদের পূর্বসূরিদের কাহিনী বড় আজিব! তারা কোনো অবস্থাতেই মনে কুধারণা আসতে দিতেন না।

## যুন নুন মিসরী রহ. এর ঘটনা

একবার হযরত যুন নুন মিসরী রহ. নৌকায় সফর করছিলেন। নদী অনেক বড় ছিল, অতিক্রম করতে যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। কাছাকাছি আরেকটি নৌকায় কিছু যুবক-যুবতী আরোহী ছিল। তারা হই-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া করছিল। তাদের হাসি-আনন্দ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা কত উদাসীন। যুবতীরা বেপর্দা ছিল এবং তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের অশ্লীলতা প্রদর্শন করছিল।

হযরতের নৌকায় আরোহীরা এ দৃশ্য দেখে কুধারণা করল যে, এরা সবাই খারাপ লোক। কুকাজের জন্যই নৌকায় সওয়ার হয়ে মাঝ দরিয়ায় এসেছে। তারা রাগান্বিত হয়ে হযরতকে বলল, 'হযরত, এই নির্লজ্জ বেহায়াদের জন্য বদ দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন তাদের নৌকা ডুবিয়ে দেন!'

যুন নুন মিসরী রহ. অপর নৌকার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারা সত্যিই হাসাহাসি করছে। তিনি দুআর জন্য হাত তুললেন। লোকেরা ভাবল তিনি

বদ দুআ করতে হাত তুলেছেন। কিন্তু হযরতের যবান থেকে এ দুআ বের হলো- 'আয় আল্লাহ! আপনি এদেরকে যেভাবে দুনিয়ার খুশি দিয়েছেন, তেমনি আখেরাতের খুশিও দান করুন!'

দুআর ফল এই হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে তাওবা করার তাওফীক দান করেন। ভাই, আখেরাতের খুশি তো তখনি পাওয়া যাবে যখন তারা দুনিয়ার জীবনে তাওবা করবে। সুবহানাল্লাহ! কেমন ইতিবাচক ভাবনা! এমন দৃশ্য দেখেও কুধারণা না করে সুধারণা করেছেন এবং তাদের জন্য নেক দুআও করেছেন।

## আলী হাজবীরী রহ. এর ঘটনা

হযরত আলী হাজবীরী রহ. একবার নৌকায় করে কোথাও যাচ্ছিলেন। সেদিন মাত্র তিনি মাথা মুণ্ডিয়েছেন। নৌকায় কিছু ছেলেও ছিল। সাধারণত মাথা মুণ্ডানো কাউকে দেখে দুষ্টু ছেলেরা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। বুযুর্গ এক কোণে চুপচাপ বসে ছিলেন। এক ছেলে তার টাকে হাত দিয়ে বলল, কত মোলায়েম! এ কাজ করে সে মজা পেল।

তার দেখাদেখি অন্য ছেলেরাও এসে টাক মাথায় হাত বুলাল।

এক ছেলে এত অপদার্থ ছিল যে, সে এসে মাথায় ঠুয়া লাগিয়ে বসল। এটা দেখে সবাই হাসাহাসি আরম্ভ করল। এরপর অন্যরাও ঠুয়া দিল। হযরত কিন্তু নির্লিপ্ত। আপন কাজে মশগুল। যিকির-মুরাকাবায় ব্যস্ত। তিনি ভাবলেন, এরা তো ছোকরা! করুক না দুষ্টামি!

একজন ঠুয়া দিলে সবাই হেসে উঠত, আরেকজন ঠুয়া দিলে বাকিরা হেসে ফেলত। এভাবে বড়রাও হাসাহাসিতে মেতে উঠল। নৌকায় আরোহী সবাই এ বদমাশিতে শরিক হয়ে গেল। ছেলেরা ঠুয়া দিচ্ছিল আর সবাই বুযুর্গকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিল। হযরত চুপচাপ বসে ছিলেন।

তাদের এ হেন কাজে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি আলী হাজবীরী রহ. এর কাছে ইলহাম পাঠালেন যে, 'হে আমার প্রিয় বান্দা! তুমি যদি এখন বদ দুআ করো তবে আমি তোমার দুআয় এ নৌকা ডুবিয়ে এদের সবাইকে নিমজ্জিত করব।'

ইলহাম শুনে আলী রহ. হাত তুলে দুআ করলেন, 'আয় আল্লাহ! আপনি যদি নৌকা উল্টে দিতেই চান, তবে নৌকার সকল আরোহীর অন্তরের নৌকা উল্টে দিন!'

তিনি দুআ করামাত্রই আল্লাহ তাআলা দুআ কবুল করে নিলেন। কথিত আছে, নৌকায় যতজন আরোহী ছিল তাদের সবাই পরবর্তীতে আল্লাহর অলী হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। সুবহানাল্লাহ!

এ হলো ইতিবাচক ধারণা। এ হলো তরীকত। এ হলো সুলুক। এই হলো তাসাওউফ। আমরা যে তাসাওউফ নিয়ে বসে আছি তা তো ময়লার ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা হবে। সামান্য বিষয়ে কুধারণা, কেউ দাঁড়ালে কুধারণা, কেউ বসলেও কুধারণা, কেউ কিছু খেলেও কুধারণা!
কী আজিব!!

## মনের উপর শয়তানের কব্জা

ভাইয়েরা! অন্যের ব্যাপারে কোনো কুধারণা পোষণ কোরো না! নিজের কথা ভাবো যে, আমার অন্তরের অবস্থা কত মন্দ। আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপারে, মুমিনদের ব্যাপারে আমার অন্তরে কুধারণা রয়েছে। অর্থাৎ মনের উপর শয়তানের এত বেশি কর্তৃত্ব রয়েছে যে, সে যখন চায় কুধারণা ঢেলে দিতে পারে। কোনো মুমিন সম্পর্কে কখনো মন্দ ধারণা রাখবে না! এমনকি কেউ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলেও কুধারণা করা যাবে না। তার সাথে সম্পর্ক না রাখা ভিন্ন ব্যাপার। সম্পর্ক রাখবে না বা নীরবতা অবলম্বন করবে, তবুও অন্তরে কোনো কুধারণা রাখা যাবে না।

## পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়!

মূলনীতি মনে রাখবেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন : 'আমি কাঁচা পেঁয়াজ খাই না। কারণ এর গন্ধ অপছন্দ করি আমি।'

এ হাদীস থেকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, রাসূল সা. এ কথা বলেননি যে, আমি কাঁচা পেঁয়াজ অপছন্দ করি, বরং বলেছেন, আমি কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ অপছন্দ করি। বোঝা গেল, আমাদের উচিত গুনাহগারকে ঘৃণা না করে গুনাহকে ঘৃণা করা।

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন—

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے
مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی

'নেশা পান করিয়ে মাতাল করতে তো সবাই জানে,
মজা তো তখন, সাকী যখন মাতালের নেশা ছুটিয়ে দিবে!'

## এমন সুধারণা থাকা উচিত

কুধারণা পোষণ করতে তো সবাই জানে। গুনাহগারের ব্যাপারে সুধারণা করা আল্লাহর অলীদের কাজ। আল্লাহ তাআলারও নিয়ম হলো- গুনাহ করা সত্ত্বেও তাঁর বান্দাদের প্রতি খুব দ্রুত অসন্তুষ্ট হন না। দুনিয়াতে শুধু মা-ই এমন যে, তার সন্তানদের অপরাধ সত্ত্বেও তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন। পীর ও শায়খগণ ভেতর-বাহিরের সব খবর জানেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাউকে ধিক্কার দেন না। কাউকে আয়না দেখিয়েও বলেন না যে, ভাই, তোমার আসল রূপ তো এমন!

## মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি

হযরত মুরশিদে আলম রহ. এর কাছে এক ব্যক্তি এল। কেউ হযরতকে বলল, 'হযরত, এ লোক তো দুনিয়াবি ফায়দার জন্য এসেছে!'
হযরত বললেন, 'আমি অভিশাপ দিই এমন পীরকে, যার কাছে তার মুরীদ আসে কিন্তু সে বুঝতে পারে না এ লোক কেন এসেছে? মানুষ পীর সাহেবদের কী ভাবে? তারা কি অন্ধ?'

পুলিশ কয়েকজন মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বুঝতে পারে, অপরাধী কে! আল্লাহ তাআলা সাধারণ মানুষকে এমন বিচক্ষণতা দান করেন। সুতরাং যার পুরো জীবন আল্লাহ তাআলার স্মরণে কেটেছে, ইবাদত-বন্দেগিতে কেটেছে, তার মুমিনসুলভ অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপারে আপনার কী ধারণা? হাদীস শরীফে এসেছে :

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ.

'তোমরা মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো। কেননা সে আল্লাহর নূর দিয়ে অবলোকন করে!'
(তিরমিযী : হাদীস নং ৩০৫২/৩১২৭)

আল্লাহ তাআলা তাঁর অলীদেরকে মানুষের অন্তরের অবস্থা জানিয়ে দেন। কিন্তু তারা মানুষের ভুল-ভ্রান্তি না দেখে তার কোনো ভালো ব্যাখ্যা করে নেন।

## জুনাইদ বাগদাদী রহ. এর অন্তর্দৃষ্টি

একবার হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. বসে ছিলেন। এক সুদর্শন যুবক তার কাছে এল। সে জুব্বা ও পাগড়ি পরিহিত ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'হযরত, হাদীসে যে এসেছে- اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ। এর অর্থ কী?' জুনাইদ বাগদাদী রহ. মাথা উঠিয়ে তাকে একনজর দেখে বললেন, 'ওহে খ্রিস্টানের বেটা! এ হাদীসের অর্থ হলো- তোমার হেদায়াতের সময় হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও।'

এ কথা শুনে যুবকটি ঘেমে গেল। বলল, 'হযরত, আমি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাচ্ছি। বাস্তবেই আমি খ্রিস্টান। মুসলমানদের আকৃতি ধারণ করে এসেছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, আপনাকে এ হাদীসের অর্থ জিজ্ঞেস করব। আপনি তার কোনো উত্তর দিলে বলব, দেখলেন, আমি খ্রিস্টান, অথচ আপনি তা বুঝতেও পারেননি! আপনার অন্তর্দৃষ্টি কোথায় গেল?'

এ সকল আল্লাহওয়ালাদের ঘটনা শুনে বিস্মিত হতে হয় যে, মাত্র একনজর দেখেই বুঝে ফেললেন, এ লোকের অন্তর ঈমানশূন্য।

## হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. এর ঘটনা

হযরতজি হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. এর দুইজন মুরীদ ছিল। তাদের দুজনের মধ্যে পুরনো মনোমালিন্য ছিল। এ হিংসা-বিদ্বেষ ভীষণ খারাপ। দুনিয়ার নিয়ম হলো- যাকে আল্লাহ তাআলা যত বেশি সম্মান-মর্যাদা দান করেন, তার হিংসুকের পরিমাণও তত বেশি হয়। দেখুন, রাসূল সা. এর মর্যাদা দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে বেশি। তাই তার প্রতি হিংসাকারীর সংখ্যাও বেশি। তাই তো আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ দুআ শিক্ষা দিয়েছেন—

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

'এবং হিংসুকের হিংসা থেকে (আশ্রয় চাচ্ছি), যখন সে হিংসা করে।' (সূরা ফালাক : ৫)

তারা দুজনেই নতুন মুরীদ ছিলেন। তবে একজনের হৃদয়ে শায়খের প্রতি মহব্বত একটু বেশি ছিল, অপরজনের হৃদয়ে স্বাভাবিক মহব্বত ছিল। যার হৃদয়ে মহব্বত বেশি ছিল সে হযরতের কাছে আগমন করলে হযরত তার সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। কারণ মহব্বতের জবাব মহব্বতের মাধ্যমেই দেয়া হয়। তা দেখে দ্বিতীয়জনের হিংসা হত যে, হযরত কেন তার সাথে এত মহব্বতের আচরণ করেন! তার কাছে এটা খারাপ লাগত। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, একবার প্রথম ব্যক্তি একটা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলো। এতে দ্বিতীয়জন একটা মজবুত দলিল পেয়ে গেল। সে মনে মনে ভাবল- আমি হযরতের কাছে গিয়ে বলব, ঐ যে আপনার কাছে একজন আসে না, যে খুব ভালোবাসা প্রকাশ করে, সে তো একটা মারাত্মক কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে।

এর ফলে হযরতের সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। আজ আমি সফল হব। আমি যেভাবে শক্তিশালী প্রমাণ নিয়ে যাচ্ছি, তাতে আজকের পর কেউ তার মুখের দিকেও তাকাবে না।

সে হযরতের কাছে গিয়ে বলল, ‘হযরত, আপনার অমুক মুরীদ, যে অনেক মহব্বত প্রকাশ করে থাকে, সে তো একটা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে! আমার কাছে তার প্রমাণও আছে! মানুষ তাকে এ গুনাহ করতে দেখেছে। সে গুনাহের কাজ করা অবস্থায় ধরা পড়েছে।’

হযরত বললেন, ‘তাই নাকি?’

সে বলল, ‘জি!’

হযরত বললেন, ‘আল্লাহর একটি গুণ আছে না ‘মুদিল্ল’ (পথভ্রষ্টকারী)? সম্ভবত এর তাজাল্লী ও প্রভাব সে সময় তার উপর পড়েছে। এতে সে গুনাহের কাজ করে বসেছে।’

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা হেদায়াতও দেন, পথভ্রষ্টও করেন। উত্তর শুনে এ বেচারা পেরেশান হয়ে গেল। তার কথার তো কোনো প্রভাবই পড়ল না। হযরতের মনে কুধারণা সৃষ্টি করতে এসেছিল, অথচ হযরত তার অন্তর থেকেও কুধারণা দূর করে দিলেন।

আল্লাহওয়ালাদের অন্তর এত পরিষ্কার হয় যে, মানুষ মারাত্মক মারাত্মক কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে তাদের কাছে আসে, তারা পাপীকে ঘৃণা না করে তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করেন।

## অন্তর্দৃষ্টির প্রার্থনা করো!

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি মোটেও গায়বের ইলম নয়। অনেকে ভাবতে পারে, আল্লাহর অলীদেরকে গায়বের ইলম দান করা হয়। বরং বিষয় হলো মুমিনের যেমন দৃষ্টি থাকে, তেমনি অন্তর্দৃষ্টিও থাকে। মানবদেহে যে চোখ রয়েছে তার আলোকে 'বাসারাত' বা দৃষ্টিশক্তি বলে আর অন্তরের চোখের দৃষ্টিকে 'বাসীরাত' বা অন্তর্দৃষ্টি বলে।

কবির ভাষায়—

دل بینا بھی کر خدا سے طلب
آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

'খোদার কাছে অন্তর্দৃষ্টির প্রার্থনাও করো,
কারণ দৃষ্টি তো কখনোই অন্তর্দৃষ্টির বরাবর নয়।'

চোখের দৃষ্টি এক জিনিস আর অন্তরের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলার নিকট আসল অন্ধত্ব হলো অন্তরের অন্ধত্ব। ইরশাদ হচ্ছে :

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

'বস্তুত চোখ অন্ধ হয় না, বরং বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়!'
(সূরা হজ : ৪৬)

## কুধারণার অস্ত্র কখন কার্যকর হয়?

মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য শয়তানের কাছে অনেক অস্ত্র ও বহু চাবি রয়েছে। তার মধ্যে একটা হলো অন্যের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি করা। তবে এ অস্ত্র শুধু তাদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে পারে, যারা নিজেদের অন্তর এত খোলা রেখে দেয় যে, তাতে শয়তানের চলাচলের জন্য চৌরাস্তা তৈরি হয়। তারা কোনো পথে চলতে চাইলে শয়তান তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন আইসক্রীম দোকানদার সুন্দর মিউজিক বাজিয়ে রাখে। এতে শিশুরা দোকানের কাছাকাছি আসামাত্র সেখানে ছুটে যায়। সে মিউজিক শিশুদের অন্তরকে দোকানে টেনে নিয়ে যায়। তেমনি শয়তান অনেক সময় মানুষের মনে এমন মিউজিক বাজায়, যার ফলে তার মনে মুমিনদের ব্যাপারে কুধারণা

সৃষ্টি হয়। সবার ব্যাপারে কুধারণা। অনেক লোককে দেখেছি, তারা ভাবে- দুনিয়ায় সে ছাড়া আর কোনো ভালো লোক নেই!

## কুধারণার অপারেশন

কিছুদিন আগের কথা। এক লোক ক্রোধের সুরে আরেকজনকে বলছিল, 'এ দেশে মনে হয় আমিই একমাত্র ভালো মানুষ। আর কাউকে তো ভালো দেখি না!'

অধম তার কাছেই বসে ছিলাম। একটু পর তাকে একা পেয়ে আচ্ছামতো ধোলাই করলাম। তাকে বললাম, 'তোমাকে তোমার আসল রূপ দেখাচ্ছি।' সাধারণত এমন কাজ করি না। কিন্তু মাঝেমধ্যে কাউকে এমন দাওয়াই দিতে হয়।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এ কাজ করেন?'

সে বলল, 'জি।'

জানতে চাইলাম, 'এ কাজও তো করেন, তাই না?'

বলল, 'জি।'

আমি তাকে এভাবে ধরায় তার ঘাম ছুটে গেল। সে আমার পায়ে পড়ে বলল, 'হযরত, মাফ করে দিন।'

বললাম, 'আমি তখন ঐ লোকের সামনে কিছু বলিনি, একে আমার উদারতা মনে করো। সবাইকে অন্ধ ভাবা ঠিক নয়!'

এরপর সে কুধারণার গুনাহ থেকে তাওবা করল।

## ধোপার কাছে ময়লা কাপড়ই আসে!

হযরত লাহোরী রহ. এর কাছে এক যুবক আসত। তার ব্যাপারে অনেক ধরনের অভিযোগ ছিল। তাই লোকেরা হযরতের কাছে এসে বলল, 'হযরত, আপনি তাকে আপনার কাছে আসতে নিষেধ করে দিন। সে আসার কারণে আপনার বদনাম হচ্ছে!'

এ কথা শুনে হযরতের চোখে পানি চলে এল। তিনি বললেন, 'শোনো, আমি তো ধোপার মতো। আর ধোপার কাছে ময়লা কাপড়ই আসে। কাপড় পরিষ্কার হলে তা ধোপার কাছে পাঠানো হবে নাকি?'

আরে ভাই, সব মানুষ যদি ভালো হত তবে তো ঘরে বসে আরাম করে জীবন কাটানো যেত। এদের আগমনের কারণই তো হলো- এরা অনুভব করে যে, তাদের অন্তর পরিষ্কারের প্রয়োজন রয়েছে; কোনো ওয়াশিং মেশিনে থেকে হৃদয়ের কালিমা দূর করার জরুরত রয়েছে। অন্যথায় ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা কি সহজ? স্ত্রী-সন্তান ও কাজ ফেলে চলে আসা কি বর্তমানে সহজ? দেশ-বিদেশ বা দূর-দূরান্ত থেকে যখন কেউ আসে তখন বুঝতে হবে, তার অন্তরে অনুশোচনার অনুভূতি অবশ্যই রয়েছে। তাই পাপীকে না দেখে নিজেকে দেখতে হবে যে, আমার মন এত কুধারণা করে কেন?

## শবে কদরের ফযিলত থেকে বঞ্চিত হওয়া

সবার অন্তর বিদ্বেষমুক্ত হওয়া উচিত। বিদ্বেষ বলা হয়- কারো ব্যাপারে অন্তরে সংকীর্ণ মনোভাব থাকা, শত্রুতা-দুশমনি থাকা, ঘৃণা থাকা।

শুনুন! অন্তরের কান দিয়ে শুনে রাখুন!

হাদীস শরীফে এসেছে : শবে কদরে আল্লাহ তাআলা কয়েকজন বাদে সকল গুনাহগারকে মাফ করে দেন। এদের মধ্যে একজন হলো- যার হৃদয়ে ঈমানদারদের ব্যাপারে বিদ্বেষ রয়েছে।

অন্যের ব্যাপারে কুধারণা ও বিদ্বেষপোষণকারী লাইলাতুল কদরেও ক্ষমা পায় না।

তাই কখনো কোনো মুমিন সম্পর্কে কুধারণা রাখা যাবে না। কুধারণা এলে সঙ্গে সঙ্গে তা খতম করে দিতে হবে। আপনি যদি অন্যের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করেন, তবে আল্লাহ তাআলাও আপনার সাথে সুধারণাপূর্ণ ব্যবহার করবেন। তাই তো হাদীস শরীফে এসেছে : মানুষ যেন অন্যের ভুল-ত্রুটি দ্রুত মাফ করে দেয়। তাহলে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার ভুল-ত্রুটিও দ্রুত ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দ্রুত অন্যের ওজর গ্রহণ করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা দ্রুত তার ওজর কবুল করবেন।

## মুক্তির ভার আল্লাহর হাতে থাকায় রক্ষা!

কেয়ামতের দিন মানুষের মুক্তির ফয়সালা আল্লাহ তাআলা নিজের হাতে রেখেছেন। সেজন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়। এ দায়িত্ব মানুষের হাতে থাকলে না জানি কী হত!

হযরত বেলাল রা. বলতেন : 'হে আল্লাহ, আপনার রহমতের উপর আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক! এ কারণে যে, হেদায়াত প্রদানকে আপনি নিজের হাতে রেখেছেন। মানুষের হাতে থাকলে আমার মতো কালো ও কুশ্রী আকৃতির লোককে হেদায়াত দিত কে?

এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি জান্নাতে প্রবেশের ফয়সালা নিজের জিম্মায় রেখেছেন, বান্দার হাতে রাখেননি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ

'যদি তোমাদের হাতে আল্লাহ তাআলার রহমতের ভাণ্ডার থাকত, তবে তোমরা তা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে বন্ধ করে রাখতে!'
(সূরা বনী ইসরাঈল : ১০০)

বান্দার হাতে এ ক্ষমতা থাকলে আল্লাহ তাআলার ভাণ্ডারকেও বন্ধ করে রাখত এ ভয়ে যে, তা শেষ হয়ে যেতে পারে!

## নিজের ভালো এবং অন্যের মন্দ দেখা

প্রিয় সুধী!

মন বড় করুন। হৃদয়ে উদারতা আনুন। কুধারণা করলে নিজের ব্যাপারেই করুন। এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে। শেখ সাদী রহ. এর ভাষায় শুনুন—

مرا پیر دانائے مرشد شہاب
دو اندر فرمود بر روئے آب
یکے آنکہ بر خویش خود بین مباش
دیگر آنکہ بر غیر بد بین مباش

'আমার পীর ও মুর্শিদ মহাজ্ঞানী শিহাব নদীর তীরে বসে দুটি শব্দে আমাকে তাসাওউফ শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাসাওউফের মূলকথা বলে দিয়েছেন। প্রথমটি হলো- নিজের ভালো বিষয়গুলো না দেখা আর দ্বিতীয়টি হলো- অন্যের মন্দ বিষয় না দেখা।'

প্রথমটিকে বলে- 'খুদ বীনী'। এর অর্থ- নিজের ভালো বিষয়গুলো নজরে পড়া। দ্বিতীয়টিকে বলে- 'বদ বীনী'। এর অর্থ- অন্যের মন্দ বিষয়গুলো চোখে পড়া।

আমরা কী করি?

নিজের মন্দ স্বভাবগুলো দেখি না আর অন্যের ভালো বিষয়গুলো দেখি না। তবুও আমরা সুফী সেজে বসে থাকি। আমাদের আসল রোগই ভালো হচ্ছে না! আমাদের নজর শুধু অন্যের দোষ-ক্রটিতেই লেগে থাকে!

আচ্ছা একটা প্রশ্নের উত্তর দিন!

আমি যখন আমার সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তির বুক দেখি, তখন কি আমি আমার বুক দেখতে পাই?

-দেখতে পাই না।

সুতরাং যে শুধু অন্যের দোষ দেখতে পায় তার বুঝে নিতে হবে যে, তার দৃষ্টি নিজের উপর পড়ে না। সে নিজেই নিজের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য, লুকায়িত। এটা তার জন্য অনেক বড় বিপদ।

আল্লাহ তাআলা যখন কারো উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান তখন তাকে তার দোষ-ক্রটি দৃষ্টিগোচর করান। আর কারো উপর অসন্তুষ্ট হলে তার দোষ-ক্রটি তার দৃষ্টির আড়ালে রাখেন। সে অনুধাবন করতে পারে না যে, কী গভীর জলে ডুবে আছে সে! সে ভাবে- আমি অনেক ভালো ও নেককার, বড় সুফী ও যিকিরকারী। অন্য সবাই খারাপ! অমুক ব্যক্তিও খারাপ, তমুক ব্যক্তিও খারাপ!

কাহিনী আছে, এক নারী তার বাচ্চার ময়লা কাপড় পরিবর্তন করছিল। এতে তার আঙ্গুলে সামান্য নাপাকি লেগে গেল। হাত ধোয়ার আগেই ঘরের বাইরে থেকে ছেলে-মেয়েদের চিৎকার ভেসে এল— ঈদের চাঁদ উঠেছে! ঈদের চাঁদ উঠেছে!

সে ভাবল, আমিও একনজর ঈদের চাঁদ দেখে আসি। মহিলাদের অভ্যাস হলো- চাঁদ দেখার সময় নাকের উপর আঙ্গুল রাখে। সেও নাকের উপর আঙ্গুল রাখল। চাঁদ দেখে সে বলতে লাগল- ঈদের চাঁদ তো ঠিক আছে, কিন্তু বুঝতে পারছি না এবারের চাঁদে এত দুর্গন্ধ কেন!!??

মূলত চাঁদে তো কোনো গন্ধ ছিল না, তার হাতের দুর্গন্ধই নাকে আসছিল। যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখে এবং আপত্তি করে তাদের বিষয় অনেকটা এমনি।

## শায়খ হলেন আয়নার মতো

যে লোক অন্যদের মাঝে শুধু দোষ-ত্রুটিই দেখতে পায় তার মনে রাখতে হবে যে, হাদীসে এসেছে :

المؤمِنُ مرآةُ المؤمِنِ

'এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়নাস্বরূপ।'

(আবু দাউদ : হাদীস নং ৪৯১৮)

আয়নায় নিজের চেহারার দাগ নজরে পড়ে। সুতরাং যে মুমিনদের দোষ বেশি দেখতে পায় সে মূলত নিজের অন্তরের পঙ্কিলতাই দেখতে পায়। আরে মিয়া, তুমি যদি আয়নায় কালো দাগ দেখতে পাও তবে আয়নার উপর খেপে যেয়ো না। এটা তার দোষ নয়, তোমার চেহারার দোষ।

মুমিন যদি মুমিনের আয়না হয় তবে শায়খ কি আয়না নন? শায়খের ব্যাপারে কুধারণা সৃষ্টি হলে বলুন তো সেটা মূলত কী?

শায়খগণ কিতাবে লিখেছেন যে, কোনো ব্যক্তির নজরে যদি তার শায়খের দোষ-ত্রুটি ধরা পড়তে থাকে তবে সে যেন বুঝে নেয়, তার ভেতর এ সব দোষ সৃষ্টি হয়েছে। শায়খের আয়নায় সে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়।

হযরত মির্জা মাযহার জানে জানা রহ. এর কাছে একবার এক হিন্দু এল। সে বলল, 'আমি কাশফুল কুলুব জানি।'

কাশফুল কুলুবের মানে হলো- অন্যের অন্তরে অনুপ্রবেশ করে দেখে নেয়া, তার অন্তরে কী রয়েছে। এটি কাশফের এক প্রকার। বুযুর্গদেরকে আল্লাহ তাআলা এ ক্ষমতা দান করে থাকেন। কোনো অমুসলিম যদি অত্যধিক সাধনা করে তবে তাকেও আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে এ ক্ষমতা প্রদান করেন সামান্য কিছু দেখানোর জন্য। ঐ হিন্দুরও এ ক্ষমতা ছিল।

হযরত তাকে বললেন, 'আচ্ছা, আমার অন্তর দেখো তো!'

সে হৃদয় দেখে বলল, 'আপনার অন্তরে তো শুধু কালো আর কালো দেখতে পাচ্ছি!'

তিনি বললেন, 'তুমি এ ক্ষমতা কীভাবে অর্জন করেছ?'

সে বলল, 'আমি সব কাজ আমার মনের চাহিদার বিপরীত করেছি। এর ফলে এ ক্ষমতা লাভ করেছি।'

হযরত একটু পর বললেন, 'তুমি মুসলমান হও না কেন?'

সে বলল, 'আমার মন চায় না!'

বলার সাথে সাথেই হযরত তাকে ধরে বসলেন। বললেন, 'তুমি সব কাজ তোমার মনের বিরুদ্ধে করেছ, এটাও মনের বিরুদ্ধে করে ফেলো।'

সে দ্বিধায় পড়ে গেল। হযরতের তাওয়াজ্জুহ তার উপর পড়ছিল তখন। এক সময় সে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

এরপর মির্জা মাযহার রহ. তাকে বললেন, 'এবার আমার অন্তরে প্রবেশ করে দেখো তো!'

সে দেখে বলল, 'হযরত, এখন তো শুধু আলো আর আলো দেখতে পাচ্ছি!'

হযরত উত্তর দিলেন, 'শোনো, আমার হৃদয় আয়নার মতো ছিল। তুমি প্রথম যখন দেখলে তখন তুমি কাফের ছিলে। তাই তোমার অন্তরের অন্ধকার দেখতে পেয়েছ। মুসলমান হওয়ার পর যখন দেখলে, তখন তুমি তোমার অন্তরের ঈমানের নূর দেখেছ।'

বোঝা গেল, মানুষ অন্যের মাঝে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়।

## আল্লাহওয়ালাদের বিচক্ষণতা

এ কারণে কারো ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করা উচিত নয়। নেককার ও আল্লাহওয়ালারা কারো ব্যাপারে কুধারণা করেন না। আজিব ব্যাপার হলো- কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা তাদের কাছে আসে, কিন্তু তারা কুধারণা করেন না। তারা আল্লাহকে মহব্বত করেন, তাই এমন লোকদের হেদায়াতের মাধ্যম হন। বুযুর্গরা যদি এ সকল গুনাহ ও দোষ দেখে তিরস্কার করতেন, তবে আমার-আপনার মতো ব্যক্তিরা তাদের পায়ের কাছে ঘেঁষারও সাহস পেতাম না! তাদের কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য হত না! যাওয়ার আগেই জুতার বাড়ি খেতে হত!

আমি হযরত বাবুজি আবদুল্লাহ রহ. কে দেখেছি, অনেক সময় তার অবস্থা এমন হত যে, তার কাছে যে ব্যক্তিই আসত, তার সব দোষ প্রকাশ করে দিয়ে বলতেন, এটা থেকে তাওবা করো! ওটা থেকে তাওবা করো!

পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে, ভয়ে কেউ তার কাছে যেতই না। তবে তার অবস্থান ও মর্যাদা ভিন্ন ছিল।

একবার তার কাছে ডি.সি আসল। তিনি তাকে সবার সামনে বললেন, 'মিথ্যা কথা বলবে না।'

ডি.সি. বলল, 'আমি তো মিথ্যা বলি না।'

এ কথা শুনে তিনি বাঘের মতো চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোনো, আমি আমার অন্তর্চক্ষু দিয়ে তোমার অন্তর দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে আমার চোখ দিয়ে তোমার চেহারা দেখতে পাচ্ছি! আমার কাছে মিথ্যা বলো!!'

তখন সে মেনে নিল যে, সে মিথ্যা বলে।

এটা আল্লাহওয়ালাদের বিচক্ষণতা যে, তারা মানুষের অন্তরের ভাবনা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তা গোপন রাখেন।

হযরত উসমান রা. একদিন বসে ছিলেন। তখন এক লোক এল। আসার পথে সে গায়রে মাহরাম নারীদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল। উসমান রা. বললেন, 'লোকদের কী হলো! এরা আমাদের মজলিসে নির্ভয়ে চলে আসে, অথচ তাদের চোখ থেকে যিনা ঝরে পড়ে!'

কত মহব্বত! কত স্নেহ! সে মন খারাপ করতে পারে ভেবে তার নামও উল্লেখ করেননি!

তিনি বিষয়টা নিজে দেখেননি, কাশফের মাধ্যমে জেনেছেন।

আল্লাহওয়ালারা এমন অনেক কিছু দেখেন। তা সত্ত্বেও তাদের মুখ বন্ধ থাকে। এরপরও তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করেন। আর আমাদের অবস্থা হলো- আমাদেরকে কেউ যদি কারো ব্যাপারে একটা মন্দ কথাও বলে, তবে সারা জীবনের জন্য তার ব্যাপারে আমার খারাপ ধারণা থেকে যায় এবং তাকে ঘৃণা করতে শুরু করি।

## তুমি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছ?

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রা. এর ঘটনা। এক যুদ্ধে তিনি এক কাফেরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সেই কাফের তলোয়ার দেখেই কালিমা পাঠ করল। কিন্তু তিনি এ কথা ভেবে তাকে আক্রমণ করলেন যে, সে তো জান বাঁচাতে কালিমা পড়েছে।

যুদ্ধ শেষে রাসূল সা. এর খেদমতে হাজির হলে রাসূল সা. তাঁর কাছে জবাবদিহিতা চাইলেন যে, 'কালিমা পড়ার পরও তুমি কেন তাকে হত্যা করলে?'
তিনি উত্তর দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো কাফের ছিল। তরবারি দেখে মৃত্যুর ভয়ে সে কালিমা পাঠ করেছিল।'
রাসূল সা. বললেন, 'তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছ?'
তিনি বললেন, 'জি না!'

একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহর নবী যদি এক সাহাবীকে এ কথা বলতে পারেন যে, তুমি সেই কাফেরের ব্যাপারে এ কুধারণা কেন করলে যে সে তলোয়ারের ভয়ে কালিমা পড়েছে, আল্লাহর ভয়ে কালিমা পড়েনি?
তবে আমরা কী করছি! মুমিনদের ব্যাপারেই কত না কুধারণা নিয়ে বসে আছি!

## কুধারণা একটা চারিত্রিক ব্যাধি

কেয়ামতের দিন কিছু লোক নিজেদেরকে ভালো মনে করবে। তাদেরকে সবার সামনে সর্বপ্রথম উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ সৃষ্টিজীব সম্বন্ধে কুধারণা করার অভ্যাস ছিল তাদের। কুধারণার সম্পর্ক স্বভাবের সাথে যে, মানুষ নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে কিছুই মনে করে না। কারো লাখো ভালো গুণ থাকলেও তা নজরে পড়ে না। অথচ মন্দ বিষয়ের প্রতি যেন দূরবীন ফিট করে রাখে।

মনে রাখবেন, আপনি তার সাথে যে আচরণ করছেন, আল্লাহ তাআলাও আপনার সাথে সেই আচরণ করবেন। অন্যের দোষ গোপন রাখা কোথায় গেল? কল্যাণকামিতা কোথায় হারাল? ক্ষমাপরায়ণতা কোথায় গেল? আমরা পরস্পরের নিকটে থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কুধারণা আরম্ভ করি, একেই কি ইসলাম বলে? এটা হলো চারিত্রিক ব্যাধি। এ ব্যাধির চিকিৎসা সবচেয়ে কঠিন। আমাদের উচিত আল্লাহ তাআলার কাছে কেঁদে কেঁদে মাফ চাওয়া।

## রাসূল সা. এর ব্যাপারে এক যুবকের কুধারণা

এক যুবক কুধারণা পোষণ করত। কার ব্যাপারে? সৃষ্টিকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ সা. এর ব্যাপারে! সে আমাকে বলছিল— একজন পুরুষকে

চার বিয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। রাসূল সা. নিজে এগারোটি বিয়ে কেন করলেন?

এ কথা শুনে আমি তাকে এমন ধোলাই করলাম যে, তার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল যে, কত মারাত্মক কথা বলেছে সে।

আমি তাকে বললাম— দেখো, পনেরো বছরের পর থেকে বিয়ের চাহিদার বয়স। রাসূল সা. যখন পূর্ণ যৌবনে ছিলেন, তাঁর বয়স যখন পঁচিশ ছিল, বিয়ের আকাঙ্ক্ষা যে বয়সে সবচেয়ে বেশি থাকে, তখন তিনি কাকে বিয়ে করলেন? সাইয়েদা খাদীজাতুল কুবরা রা. কে। যিনি একবার নয়, দুবার বিধবা হয়েছিলেন। বয়স কত ছিল তাঁর? চল্লিশ বছর। রাসূল সা. কি কোনো যুবতী ও কুমারী মেয়ে খুঁজে পাননি? কাফেররা তো তাঁর কাছে এসে বলত- মক্কার যে মেয়েকেই আপনি পছন্দ করবেন, আমরা তাকে আপনার দাসী বানিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি! ধন-সম্পদ দিতে রাজি আছি, আপনার প্রার্থিত সবকিছু দিতে তৈরি আছি!

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেছেন কাকে? চল্লিশ বছরের বিধবা মহিলাকে। আচ্ছা বলো তো, চল্লিশ বছর বয়সে মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্য কতটুকু বাকি থাকে? তার মধ্যে কতটুকু আকর্ষণ থাকে? বর্তমানে তো ত্রিশ বছরের নারীদেরই এমন করুণ দশা হয় যে, দেখে মনে হয় কবরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে! এমন নারীর দিকে কি কেউ তাকায়?

একদিকে চল্লিশ বছরের বিধবা, অপরদিকে পূর্ণ যৌবনের অধিকারী সুস্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবক। এ সম্বন্ধকে কি তুমি যৌন চাহিদার সম্বন্ধ বলতে পারবে? নাকি এ বিবাহ দীনের মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছিল?

ভাই, এ বিয়ে দ্বারা রাসূল সা. এর উদ্দেশ্য কি এটাই ছিল না যে, প্রভাবশালী এক নারীকে বিয়ে করলে তার বংশ মুসলমান হয়ে যাবে, তাঁর কারণে আরো অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে। চাচার পরামর্শে তিনি তাঁকে বিয়ে করেন। তো এ বিবাহ কী উদ্দেশ্যে ছিল? শুধু দীনের স্বার্থে। একে চাহিদা পূরণের বিবাহ বলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

খাদীজা রা. এর সঙ্গে রাসূল সা. কত বছর কাটিয়েছেন? তেপ্পান্ন বছর বয়স পর্যন্ত। হিজরতের দেড় বা দুই বছর পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত রাসূল সা. আর বিয়ে করেননি। ততদিনে রাসূল সা. এর বয়স কত হয়েছে? পঞ্চাশ বছরের বেশি! যৌবন কত বছর পর্যন্ত থাকে?

পনেরো থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত বয়সকে যৌবন বলে। পঞ্চাশের পর তো যৌবন থাকে না, এরপর বার্ধক্য চলে আসে।

এবার তুমিই বলো, রাসূল সা. পুরো যৌবন কাটিয়ে দিয়েছেন একজন স্ত্রীর সাথে। তাও এমন স্ত্রী, যিনি বয়সে তাঁর থেকে পনেরো বছরের বড় ছিলেন। রাসূল সা. এর বয়স যখন পঞ্চাশ, তখন তাঁর স্ত্রীর বয়স পঁয়ষট্টি হয়ে গেছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সা. এর একাধিক বিয়ে শারীরিক চাহিদার কারণে ছিল না।

হিজরত করে মদীনায় আগমনের পর আল্লাহ তাআলা রাসূল সা. কে সব ধরনের স্ত্রী দিয়েছেন। কুমারী, বিধবা, বাঁদী, বড় বড় রাজাদের কন্যা ইত্যাদি। বিভিন্ন পরিবেশের ও বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের স্ত্রী, বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন গোত্রের স্ত্রী আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়েছেন। এর কারণ কী ছিল?

কারণ হলো- রাসূল সা. এর পবিত্র জীবন এত শিক্ষণীয় ছিল যে, তার পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাসগ্রন্থ ও হাদীসগ্রন্থে সংরক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। হিজরতের পর থেকে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। এ সময় দীনের অকল্পনীয় প্রচার-প্রসার হয়েছে, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং রাসূল সা. এর পুরো জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কিতাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ঘরের বাইরে, মসজিদে নববীতে তো হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরাম বিদ্যমান ছিলেন, যারা রাসূল সা. এর কথা ও বাণী সংরক্ষণ করবেন, কিন্তু ঘরোয়া বিষয়াদি সংরক্ষণ করবে কে? নিশ্চয় ঘরওয়ালি, গৃহিণী।

স্ত্রী যদি একজন হতেন তাহলে কাফেররা আজ আপত্তি করত যে, একজন মহিলার কথার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? স্ত্রী পৌঢ়া হলে কাফেররা আপত্তি জানাত যে, এ বয়সে তো স্মরণশক্তি প্রবল থাকে না। পৌঢ়া রমণীরা তো নিজেদের কথাই ভুলে যায়!

বয়স্কা স্ত্রী যদি গরিব খান্দানের হতেন, তাহলে প্রশ্ন উঠত- ধনী ও গরিব বংশের মেয়েদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে!

সবাই যদি স্বাধীনা হতেন তবে আপত্তি করত- বাঁদীদের চিন্তা-চেতনা ভিন্ন হয়ে থাকে।

এ সকল আপত্তি ওঠার সম্ভাবনা থাকায় আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীর জন্য এমন কিছু স্ত্রী দান করেছেন, যাঁদের মধ্যে সব স্তরের নারী আছেন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও ব্যাকগ্রাউন্ডের ছিলেন।

কমবয়সী স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা রা. আছেন। তিনি স্মৃতিশক্তির দিক থেকে সবার সেরা ছিলেন। বয়স্কা স্ত্রীও ছিলেন, যাঁরা অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হন। রাজা বা নেতার কন্যাও ছিলেন— আবু সুফিয়ান রা. এর কন্যা হযরত উম্মে হাবীবা রা.। সর্দারকন্যা। সব ধরনের স্ত্রীই ছিল রাসূল সা. এর। বোঝা গেল, এ নির্বাচন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ছিল। তিনি এ নির্বাচন এ কারণে করেছিলেন যে, তাঁর প্রিয় নবীর জীবনবৃত্তান্ত সংরক্ষণের জন্য সব ধরনের স্ত্রী বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন।

রাসূল সা. এর ঘরোয়া জীবনের বর্ণনা কারা দিয়েছেন? ঘরে অবস্থানকারিণী স্ত্রীরা দিয়েছেন। তাই তো আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের জন্য এগারোজন স্ত্রী নির্বাচন করেছেন। রাসূল সা. এর এগারোজন স্ত্রী যদি আল্লাহ তাআলারই নির্বাচন হয়ে থাকে, তবে আমরা বুঝে নিব যে, আল্লাহ তাআলা যেভাবে পুরুষদের জামাত নির্বাচন করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের জামাত, যাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ পঁচিশ হাজার, যারা হুযুর সা. এর ঘরের বাইরের জীবনকে উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি এগারোজন স্ত্রীকে নির্বাচন করেছেন ঘরোয়া জীবনকে উম্মতের কাছে পৌঁছানোর জন্য। ঘরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দীনের যে নির্দেশনা আমরা পেয়েছি তা কাদের মাধ্যমে পাওয়া? রাসূল সা. এর সম্মানিতা স্ত্রীগণের মাধ্যমে।

রাসূল সা. বলেছেন, 'আমার আয়েশা অর্ধেক দীন।'

অর্থাৎ দীনের অর্ধেক পুরুষরা বর্ণনা করেছে আর বাকি অর্ধেক সম্মানিতা স্ত্রীগণ বর্ণনা করেছেন।

ওহে বিবেকহীন! পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত পুরো যৌবনকাল রাসূল সা. শুধু একজন স্ত্রীর সাথে অতিবাহিত করেছেন। এরপর দীনের প্রয়োজনে যে জীবন কাটিয়েছেন তাতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এগারোজন স্ত্রী দিয়েছেন। এতে এমন কী রয়েছে, যা মানুষের বুঝে আসে না? যা আপত্তিকর?

তোমরা নির্জনে বসে তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে ওয়াদা নাও যে, আমাদের মধ্যে যা কিছু হবে তার মীমাংসা আমরাই করে নিব আলোচনার মাধ্যমে। ঘরের বাইরের কাউকে এ সব ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না, কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।

তোমাদের জীবন তো এমন যে, তোমরা স্ত্রীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নাও ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ না করার! আর প্রিয় নবী সা. এর জীবন দেখো! এমন পবিত্র যিন্দেগির জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক!

তিনি তাঁর স্ত্রীদের আদেশ দিয়েছেন- 'ঘরের ভেতর তোমরা আমাকে যা কিছু করতে দেখো, তা মানুষের কাছে পৌঁছানো তোমাদের অবশ্যকর্তব্য।'

একেই বলে আদর্শ জীবন!

কুধারণার কথা আর কী বলব! কুধারণা পোষণকারী ব্যক্তি রাসূল সা. এর ব্যাপারেও কুধারণা করে। মনে রাখতে হবে, কুধারণার কোনো সীমা নেই। এখন তো মানুষ আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেও বদগুমানি করে! নাউযুবিল্লাহ!

## আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কুধারণা

আমাদের অবস্থা এত করুণ যে, আমরা এখন আল্লাহ তাআলা সম্পর্কেও কুধারণা করে বসি।

সেদিন এক মহিলা ফোন করে বলল, হযরত! দুআর দরখাস্ত! জানি না আমার সংসার টিকবে কি না! আমার স্বামীর অবস্থা হলো- সে বলে, আমি আল্লাহর কাছে কত দুআ করেছি, কতকিছু চেয়েছি, আল্লাহ আমার দুআ কবুল করেননি। সুতরাং আল্লাহর মধ্যেও ফেবারিটইজম আছে। তিনি শুধু মৌলবীদের দুআ কবুল করেন, যারা দাড়ি রাখে না তাদের দুআ কবুল করেন না!

আপনারাই বলুন, তার ঈমানের অবস্থা কী? সে আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে কুধারণা করছে। নিজের ঈমানকে তো হেফাযত করা উচিত!

হযরতের মুসা আ. এর উপর তাঁর জাতি ও ফেরআউন অনেক অভিযোগ করেছিল। কারূনও অভিযোগ করেছিল। কত ধরনের কত অভিযোগই তো করেছিল! পৃথিবীর মানুষ এমন বহু কল্পিত অভিযোগ করে। হযরত মুসা আ. বিরক্ত হয়ে গেলেন। তুর পাহাড়ে গিয়ে বললেন,

'হে আল্লাহ, আমার সম্পর্কে মানুষের অভিযোগের পাহাড় বন্ধ করুন!'

আল্লাহ তাআলা অহী প্রেরণ করলেন, 'হে মুসা! আমার ব্যাপারেই মানুষের অভিযোগ শেষ হয় না, তোমার ব্যাপারে কী বন্ধ করব?'

# কান্নার বিষয়

কুধারণা মারাত্মক এক রোগ। এটা অবশ্যই কান্নার ব্যাপার যে, বিশ-ত্রিশ বছর যাবৎ একজন মানুষ সম্পর্কে জানি, তারপরও তার ব্যাপারে কুধারণা হয়ে যায়। ত্রিশ বছর সে তোমার সামনে ছিল, তুমি কি অন্ধ ছিলে? বুদ্ধি ছিল না? দেখতে পেতে না? তার ত্রিশ বছরের জীবনের দিন-রাতের সবকিছু একপাশে রেখে আরেকজনের সামান্য কথায় কুধারণা করে বসলে! আফসোস তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর! কাল কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যে, কেন তুমি অমুকের ব্যাপারে বদগুমানি করেছ? যখন তোমাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, কেন তুমি কুধারণা পোষণ করতে? তখন কী জবাব দিবে?
মুমিনদের ব্যাপারে কুধারণা করা অন্তরের রোগ।

ইদানীং বারবার এ বিষয়ে মানুষ প্রশ্ন করছিল। তাই ভাবলাম, বিষয়টা সবাইকে বুঝিয়ে বলি যে, কুধারণা মূলত নিজের অন্তরের অবস্থা অন্যের মধ্যে দেখা। সুতরাং এ থেকে বাঁচতে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে হবে। আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে মুমিনদের সম্পর্কে কুধারণা করা থেকে হেফাযত করেন। নিজের মনকে বোঝাতে হবে যে, কেয়ামতের দিন তো আমার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, অন্য কাউকে নয়। তাই নিজের সম্পর্কে ফিকির করা উচিত।

কবি বলেন—

نہ تھی جو اپنی برائیوں کی خبر
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر
تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

'নিজের মন্দ কাজ সম্পর্কে যার কোনো খবর থাকে না,
সে-ই অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়।
নিজের দোষের প্রতি যখন নজর পড়ে,
তখন আর কাউকে মন্দ মনে হয় না।'

আমাদের হযরত বলতেন—

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو

'অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কী দরকার?
আগে নিজের সংশোধনের চিন্তা করো।'

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, 'আমি একটা গুনাহ করার কারণে পাঁচ মাস পর্যন্ত তাহাজ্জুদ থেকে মাহরুম হয়েছি।'

কেউ জিজ্ঞেস করল, 'কোন গুনাহ?'

তিনি বললেন, 'একদিন আমি এক লোককে দেখলাম, কেঁদে কেঁদে দুআ করছে। তার ভাব দেখে আমার মনে হলো, সে লোক দেখানোর জন্য এভাবে দুআ করছে। আমার অন্তরে এ ভাবনা আসামাত্রই আল্লাহ তাআলা আমাকে পাকড়াও করে বসলেন। এর শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঁচ মাস পর্যন্ত রাতের মুনাজাত থেকে মাহরুম করলেন। যেন তিনি বলেছেন- তুমি রাতের মুনাজাতের যোগ্যই নও!'

কুধারণা এত মারাত্মক ব্যাধি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ ব্যাধি থেকে নিরাপদে রাখুন, আমীন! সুম্মা আমীন!

﴿وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

(سورة آل عمران : ١٨٥)

বয়ান- ৭

# বিস্ময়কর আটটি বিষয়

## تعجب کی آٹھ باتیں

বয়ান : শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী হাফিযাহুল্লাহ

তারিখ : ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ্রি.

স্থান : যয়নব জামে মসজিদ, মা'আদুল ফকীর আল ইসলামী, ঝাঙ্গ।

উপলক্ষ্য : জুমআর খুতবা।

## চয়নিকা

আপনাকে যদি এমন অফার দেয়া হয় যে, কয়েক বছরের জন্য একটি মহল অথবা সারা জীবনের জন্য একটি মাটির ঘর; এ দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি আপনার জন্য নির্বাচন করুন।

আপনি ভেবে-চিন্তে বলবেন, আমার এমন ঘর দরকার, যা সব সময়ের জন্য আমার হবে। অর্থাৎ মাটির ঘর।

আল্লাহ তাআলাও এমন কথা বলেছেন যে, 'ওহে আমার বান্দারা! এই দুনিয়ার ঘর অস্থায়ী। এখানে বসবাস করে তোমরা যদি আমার বিধান মেনে চলো, তবে আমি সব সময়ের জন্য তোমাদেরকে মহল দান করব।'

অথচ মানুষ এমনভাবে দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলেছে যে, যে পায়ে হেঁটে চলে সে সাইকেলআরোহীকে দেখে। সাইকেলআরোহী দেখে মোটরসাইকেলআরোহীকে। সে দেখে গাড়িওয়ালাকে আর গাড়িওয়ালার নজর থাকে নতুন মডেলের গাড়িওয়ালার দিকে...!

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ:

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ.

## কাফের ও মুমিনের জীবনের মধ্যে পার্থক্য

জীবন সম্পর্কে মানুষের ধারণা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। নাস্তিকদের ধারণা- আমরা নিজে নিজেই সৃষ্ট হয়েছি। এ জীবন উপভোগ ও আনন্দ লাভের জন্য। তাই তারা দুনিয়ার জীবনকেই সবকিছু ভেবে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। মুমিনের জীবন-ভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে ভাবে- আমাকে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়া হলো পরীক্ষার জায়গা। আমি পরীক্ষার হলে আছি। কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ হবে। ভালো কাজের বিনিময় পাওয়া যাবে আর মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া হবে।

ফলে মুমিন ব্যক্তির জীবন ভিন্নভাবে অতিবাহিত হয়। সে এই পৃথিবীর সুখ-দুখকে অস্থায়ী ভাবে। সে জানে, এ দুনিয়া নশ্বর; এর সবকিছুই অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। কাফেররা ভাবে, আমি বেঁচে থাকতেই দুনিয়ায় এসেছি। আর মুমিনরা ভাবে, আমি মরে যেতেই দুনিয়ায় এসেছি।

কাফেররা বলে- বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকতে দাও। ভালোভাবে বেঁচে থাকো আর ভালোভাবে বেঁচে থাকতে দাও।

মুমিনরা বলে- ভালোভাবে মৃত্যুবরণ করো আর মৃত্যুবরণ করতে দাও।

অর্থাৎ এমনভাবে জীবন অতিবাহিত করো, যাতে তোমাদের সুন্দর মৃত্যু হয়, ভালো পরিণতি হয়, আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় হয়ে যাও!

এ কারণেই পার্থিব জীবনের কোনো পেরেশানিই মুমিনকে চিন্তিত করতে পারে না। বড় বড় মুসিবত আসে, পরীক্ষা আসে, কিন্তু সে অত্যন্ত সবর ও ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করে যায়। সে জানে- কয়েকদিনের জীবন অবশেষে ফুরিয়ে যাবে। পার্থিব জীবন অস্থায়ী তাঁবু মাত্র। পরিশেষে সবাইকেই এখান থেকে বিদায় নিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُهُ الْعِبَادُ إِلَّا وَصَارِخٌ يَصْرُخُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِدُوا لِلتُّرَابِ، وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ، وَابْنُوا لِلْخَرَابِ

'প্রতি সকালে একজন ঘোষক ঘোষণা দেয়— হে লোকসকল! তোমরা কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নাও; ধ্বংস হওয়ার জন্য একত্র হও এবং বিরান হওয়ার জন্য বাড়ি নির্মাণ করো।'

(কানযুল উম্মাল : ৪৩০৪০; শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী : ১০২৪৬)

## দুনিয়ার ধোঁকা

দুনিয়ায় যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, সে মৃত্যুর জন্যই জন্মগ্রহণ করে; যে বাড়ি নির্মিত হয় তা ধসে পড়ার জন্যই নির্মিত হয়। সবকিছুর পরিণতি তো এমনই! পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ এসেছে, আবার সবাই চলেও গেছে। দুনিয়া হলো মুসাফিরখানা, সরাইখানা। এর মধ্যে আকর্ষণ এত বেশি যে, মানুষের অন্তরকে দুনিয়ামুখী করে দেয়। মানুষ তার পরিণতি ও কর্তব্য ভুলে দুনিয়াবি ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে।

বর্তমানে কোনো যুবতী মেয়েকে যদি বলা হয়- নামায পড়ো। তবে সে উত্তর দেয়- আমি কি দাদিমা হয়ে গেছি যে, আমাকে নামায পড়তে বলছেন? সে যেন ভাবছে- বুড়ি হওয়ার পর নামায আদায় করবে।

তেমনি কোনো যুবককে নেক কাজ করতে বলা হলে সে ভাবে- প্রথমে পড়াশোনা করব, তারপর চাকরি করব, গাড়ি-বাড়ি হবে, তারপর বিয়ে করব, ছেলে-মেয়ে হবে, বুড়ো বয়সে না হয় সৎভাবে জীবনযাপন করব!

এই হলো দুনিয়ার ধোঁকা।

তাই তো মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন : দুনিয়া হলো ধোঁকার স্থল। ভালো ভালো মানুষও এখানে ধোঁকায় পড়ে যায়।

রাসূল সা. দুটি শব্দে সব কথা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ

'দুনিয়া বড়ই মিষ্টি ও সবুজ-শ্যামল।'

(সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৭১২৪)

মিষ্টি খেতে সবারই মন চায়। পেট ভরে গেলেও মন ভরে না। দুনিয়াও এমন যে, মানুষ এখানে যতই আয়েশ করুক না কেন তার মন ভরে না। যত পায় ততই আরো বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। এটা করবে, ওটা করবে, তারপর এই করবে সেই করবে! ভাব দেখে মনে হয় যেন তার কখনো দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে না!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

'তোমরা এমন বাড়ি নির্মাণ করো, যেন তোমরা তাতে চিরদিন অবস্থান করবে!'

(সূরা শুআরা : ১২৯)

তাই প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হলো- সে যেন প্রতি মুহূর্তে এ কথা মনে রাখে যে, এ পৃথিবীতে আমি ক্ষণস্থায়ী মেহমান মাত্র। অবশেষে আমাকে বিদায় নিতেই হবে।

এ জন্যই রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন :

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ

'সকল স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।'

(তিরমিযী : হাদীস নং ২৩০৭)

এ কথা যখন মনে থাকবে যে, অবশেষে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে তখন দুনিয়ার সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী মনে হবে।

## আশি বছরের বুড়োর আত্মপ্রবঞ্চনা

একবার আমার এক দোস্ত বলছিল, আমার এক দাদা আছে। বয়স আশি বছর। এখনো নামায পড়েন না। আপনি তাকে কিছু নসিহত করুন।

তার সাথে সাক্ষাৎ হলো। সালাম-মুসাফাহার পর আমি ভালোভাবে তার সাথে কথা বলা শুরু করলাম। বললাম, 'এখন তো আপনার হাতে অনেক সময়

থাকে। এখন আপনার কাজ শুধু আল্লাহকে স্মরণ করা ও নামায আদায় করা। এছাড়া তো তেমন কোনো কাজ নেই।'

আমি নামাযের কথা বলামাত্রই বুড়ো তার হাঁটু ধরে বলল, 'পীর সাহেব! হাঁটুর ব্যথায় নামায পড়তে পারি না। দুআ করুন যেন ব্যথা সেরে যায়। তারপর আমি নামায আদায় আরম্ভ করব।'

আপনারা ভেবে দেখুন, এই বুড়ো কত বড় প্রবঞ্চনায় লিপ্ত হয়ে আছে! সে আশি বছর বয়সেও এ অপেক্ষায় আছে যে, হাঁটুর ব্যথা ভালো হয়ে যাবে, তারপর নামায আদায় শুরু করবে। একে প্রবঞ্চনা না বলে আর কী বলব? শিক্ষিতরাও ধোঁকায় পড়ে থাকে। যাদেরকে আমরা উচ্চ শিক্ষিত, ডক্টর বলি, তারা সবাই প্রবঞ্চনায় লিপ্ত থাকে। কারণ কী? মৃত্যুর স্মরণ না থাকা।

## এক সেক্রেটারি সাহেবের আত্মপ্রবঞ্চনা

এক সেক্রেটারি সাহেব ছিলেন, যিনি পাঞ্জাবের বাজেট পেশ করতেন। তিনি এত উপরের স্তরের অত্যন্ত যোগ্য মানুষ ছিলেন যে, পুরো পাঞ্জাব প্রদেশের বাজেট পেশ করতেন। অনেক সচ্চরিত্রবান ও সম্ভ্রান্ত, ভদ্র মানুষ ছিলেন। একবার তার কাছে গেলাম। জানতে পারলাম, তিনি নামায আদায় করেন না। তখন তিনি অবসর নিয়েছেন। অবসর নেয়ার মানে হলো স্বাভাবিকভাবেই তার বয়স ৬০-৬৫ এর কম হবে না। তার সাথে যখন সাক্ষাৎ হলো তখন তার কোলে তার নাতি ছিল। আমি নামাযের কথা বললে তিনি উত্তর দিলেন, 'হযরত, আপনি অনেক সুন্দর কথা বলেছেন। আমি একটা নিয়ত করেছি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী নিয়ত?'

বললেন, 'আমি নিয়ত করেছি, আমার এ নাতিকে হাফেয বানাব। যেদিন সে প্রথম নামায পড়াবে সেদিন আমি তার পেছনে নামায আদায় করব। এটা আমার পাক্কা নিয়ত!'

একে শয়তানের ধোঁকা না বলে আর কী বলা যায়? এত শিক্ষিত মানুষ! এত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন! হাজারও মানুষের মধ্যে তার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ তিনি প্রবঞ্চচনায় পড়ে আছেন!

তিনি কি নিশ্চিত যে, এ ছেলে হাফেয হতে পারবে?

তিনি কি নিশ্চিত যে, ততদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন?

এজন্যই দুনিয়াকে ধোঁকার স্থল বলা হয়েছে। এ ধোঁকায় অধিকাংশ লোকই নিপতিত হয়।

দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে মানুষ আল্লাহর বিধান অমান্য করে, রাসূল সা. এর সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আপন মর্জি মোতাবেক জীবনযাপন করে। কখনো একেবারে পশুর মতো কাজ করে, যেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তাই তো কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

'পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ বৈ অন্য কিছু নয়।'
(সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

## বিস্ময়কর আটটি বিষয়

এক বুযুর্গ বলেন, আটটি বিষয় বড় বিস্ময়কর।

### প্রথম বিষয়

তিনি বলেন, 'আমি বিস্মিত হই এমন লোককে দেখে, যে জানে তার মৃত্যু হবে, তারপরও সে অট্টহাস্য করে!'

যে ব্যক্তির ফাঁসির আদেশ হয় তার চেহারায় হাসি থাকে না। আমরা সবাই জানি মৃত্যু আসবে। মৃত্যু কতটা কষ্টদায়ক? হযরত আলী রা. বলতেন, 'কাঁচি দিয়ে কাটার চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক মৃত্যু! গনগনে আগুনে ডেগে ভুনা করার চেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু! সহজ উদাহরণ। চুলায় কাজ করতে গিয়ে কখনো যদি আপনার হাত সামান্য পুড়ে যায় তবে কেমন যন্ত্রণা হয়? কতদিন হাতে ব্যথা থাকে? এত যন্ত্রণা হওয়ার কারণ কী? কারণ হলো- যে অংশ পুড়ে গেছে সেখান থেকে রূহ সরে গিয়ে অন্য অংশে চলে গেছে। ভেবে দেখুন, সামান্য স্থান থেকে রূহ সরে গেলে যদি এত মারাত্মক বেদনা হয়, তবে সারা শরীর থেকে তা সরিয়ে নেয়া হলে কী অবস্থা হবে?

একবার রাসূল সা. এক সাহাবীকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখলেন। মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার বুকে হাত রাখলেন। সেই সাহাবী রাসূল সা. এর অনেক প্রিয় ছিলেন। তাই তিনি ফেরেশতাকে বললেন, 'ওহে মৃত্যুর ফেরেশতা! এর মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব করুন। সহজে জান কবজ করুন।'

ফেরেশতা বললেন, 'আল্লাহর প্রিয় হাবীব! আপনার সান্নিধ্য-ধন্য সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে। আমি তাদের রূহ অনেক আরামের সাথে

বের করি। তাদের রূহ এক আঙ্গুল দিয়ে বের করি আর সাধারণ মানুষের রূহ কবয করতে তার রূহে হাতের থাবা মারি।'

মৃত্যুর ফেরেশতা এসে যখন থাবা মারবে তখন সকল নেশা টুটে যাবে, সব উন্মত্ততা ভুলে যাবে। তখন মানুষ ভাববে- হায়, আমি যদি আল্লাহ তাআলার নাফরমানি না করতাম!

কবির ভাষায়—

اب پچھتائے کیا ہوت

جب چڑیا چگ گئی کھیت

'এখন আফসোস করে কী হবে,
পাখি যখন ফসল খেয়ে ফেলেছে!'

কথিত আছে, হযরত ঈসা আ. কে তাঁর জাতি বলল, আপনি আমাদেরকে কোনো মুজিযা দেখান। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক কবরের কাছে গেলেন। কবরে যে মৃত লাশ ছিল তার উদ্দেশ্যে বললেন-

قُمْ بِإِذْنِ اللهِ 'আল্লাহর নির্দেশে উঠে দাঁড়াও!'

আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ মুজিযা দান করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশে অল্প সময়ের জন্য মৃতকে জীবিত করতে পারতেন।

তো সেই কবর থেকে এক যুবক বের হয়ে এল। যুবক হলেও তার দাড়ি সাদা ছিল। হযরত ঈসা আ. তার সাথে কথা বললেন। সে বলল, 'যুবক বয়সেই আমার মৃত্যু হয়েছে। আমি অমুকের ছেলে। হাজার বছর আগে মৃত্যু হয়েছে আমার।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যুবক বয়সে মৃত্যু হয়ে থাকলে তোমার চুল পাকা কেন?'

সে বলল, 'মৃত্যুর সময় আমার যে যন্ত্রণা হয়েছে তা আজ হাজার বছর পরেও আমার শরীরে অনুভব করছি। আপনার কণ্ঠে قُمْ بِإِذْنِ اللهِ শুনে ভাবলাম, কেয়ামতের দিন এসে গেছে। ঐ দিনের ভয়ে আমার কালো চুল সাদা হয়ে গেছে!'

কুরআনের বিবরণ দেখুন—

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٧﴾

'যে দিনের বিভীষিকা শিশুদেরকে বানিয়ে দিবে বুড়ো।'
(সূরা মুযযাম্মিল : ১৭)

## দ্বিতীয় বিষয়

বুযুর্গ দ্বিতীয় যে কথা বলেন :
'আমি বিস্ময় বোধ করি ঐ ব্যক্তিকে দেখে, যে জানে এ দুনিয়া নশ্বর, তারপরও সে দুনিয়া অর্জনে আগ্রহের সাথে সদা সচেষ্ট থাকে।'

আপনাকে যদি এমন অফার দেয়া হয় যে, কয়েক বছরের জন্য একটি মহল অথবা সারা জীবনের জন্য একটি মাটির ঘর; এ দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি আপনার জন্য নির্বাচন করুন।
আপনি ভেবে-চিন্তে বলবেন, আমার এমন ঘর দরকার, যা সব সময়ের জন্য আমার হবে। অর্থাৎ মাটির ঘর।
আল্লাহ তাআলাও এমন কথা বলেছেন যে, 'ওহে আমার বান্দারা! এই দুনিয়ার ঘর অস্থায়ী। এখানে বসবাস করে তোমরা যদি আমার বিধান মেনে চলো, তবে আমি সব সময়ের জন্য তোমাদেরকে মহল দান করব।'
অথচ মানুষ এমনভাবে দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলেছে যে, যে পায়ে হেঁটে চলে সে সাইকেলআরোহীকে দেখে। সাইকেলআরোহী দেখে মোটরসাইকেলআরোহীকে। সে দেখে গাড়িওয়ালাকে আর গাড়িওয়ালার নজর থাকে নতুন মডেলের গাড়িওয়ালার দিকে...! যে যেখানে আছে সেখানে সে পরিতৃপ্ত নয়। আরো বেশি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা সবার মনে। অথচ দুনিয়ার সকল আনন্দ অস্থায়ী। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে যৌবন দান করেছেন তাও ক্ষণস্থায়ী।

এক বুড়ো হজে গিয়েছিল। তার পাশে উপবিষ্ট একজন জিজ্ঞেস করল, 'চাচা, আপনার বয়স কত?'
বলল, 'শরীর তো পঁচাত্তর বছরের হয়ে গেছে, কিন্তু মন পঁচিশ পার হয়নি!'

মানুষের মন এমনি। পঁচিশের উপরে যায় না। এজন্যই তো দুনিয়াকে ধোঁকার স্থান বলা হয়েছে। এ কারণেই মৃত্যুর আলোচনা ভালো লাগে না, মরতে ইচ্ছা হয় না। অন্যথায় যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকে সে অপেক্ষায় থাকে যে, কবে এই বন্দিশালা থেকে তার প্রাণ মুক্তি পাবে।

শরীয়তের নির্দেশ হলো- শিশুর জন্ম হলে এক কানে আযান, আরেক কানে ইকামত দিতে হবে। আর মৃত্যুর পর জানাযার নামায আদায় করতে হবে।

কবির ভাষায়—

آتے ہوئے آذان ہوئی جاتے ہوئے نماز
اتنی ذرا سی دیر میں آئے اور چلے گئے

'আগমনের সময় আযান হয়েছে আর বিদায়ের সময় নামায,
এত সামান্য সময়ে এল আর চলে গেল!'

এক বাদশাহ মহল নির্মাণ করে ঘোষণা দিল- 'কেউ এ মহলে কোনো খুঁত বের করতে পারলে আমি তাকে পুরস্কৃত করব।'

প্রাসাদটি এত সুন্দর ও উৎকৃষ্ট ছিল যে, কেউ তাতে কোনো খুঁত বের করতে পারল না।

এক বুযুর্গ প্রাসাদ দেখে বললেন, 'এতে দুটি খুঁত রয়েছে।'

লোকেরা তাকে বাদশাহর কাছে নিয়ে গেল। বাদশাহ বলল, 'আপনি এ প্রাসাদে কী দোষ দেখতে পাচ্ছেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'বাদশাহ! এতে বিরাট বিরাট দুটি খুঁত রয়েছে।

এক. এ প্রাসাদ চিরস্থায়ী নয়।

দুই. আপনি এখানে চিরদিন থাকতে পারবেন না।'

## তৃতীয় বিষয়

তৃতীয় যে কথা বলেন—

'আমি বিস্ময় বোধ করি ঐ ব্যক্তিকে দেখে, যে জানে, মানুষের ধন-সম্পদ ভাগ্য-নির্ধারিত, তবুও সে সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার কারণে আফসোস করে।'

অন্তরে যখন এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, আমার ভাগ্যে যা আছে তা আমি পাবই, তখন কিছু না পেলে আফসোস হবে কেন? এ কথা ভাবা উচিত যে, তা আমার ভাগ্যে ছিল না, আমার তাকদীরে ছিল না। এজন্যই কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে :

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

'এটা এজন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তাতে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে উল্লসিত না হও!' (সূরা হাদীদ : ২৩)

কথিত আছে, শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ. এর একটি ব্যবসায়িক জাহাজ বিদেশ থেকে আসার কথা ছিল। এক লোক এসে সংবাদ দিল- 'হযরত, সাগরে ঝড় উঠেছিল। আপনার যে জাহাজ আসার কথা ছিল তা ঝড়ে ডুবে যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে।'

তিনি সংবাদ শুনে আলহামদুলিল্লাহ বললেন।

কিছুক্ষণ পর আবার খবর এল যে, জাহাজটি ডুবতে ডুবতে কোনোমতে বেঁচে গেছে এবং নিরাপদে তীরে ভিড়েছে।

এ সংবাদ পেয়েও হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহ. আলহামদুলিল্লাহ বললেন।

তাঁর মজলিসে উপবিষ্ট এক লোক বিষয়টি লক্ষ করেছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'হযরত, জাহাজডুবির সংবাদ পেয়েও আপনি আলহামদুলিল্লাহ বললেন, আবার তীরে পৌঁছার খবর পেয়েও আলহামদুলিল্লাহ বললেন। এর কারণ বুঝতে পারছি না!'

তিনি উত্তর দিলেন, 'জাহাজডুবির সংবাদ পেয়ে আমি আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে খুঁজে দেখলাম যে, এ দুর্ঘটনার কারণে আমার মনে কোনো আফসোস নেই। তাই আমি আলহামদুলিল্লাহ বললাম। এরপর জাহাজ তীরে ভেড়ার সংবাদ পেয়েও হৃদয়ের গহীনে খুঁজে দেখলাম যে, আমার মনে কোনো আনন্দ ছিল না। তাই আমি আবারও আলহামদুলিল্লাহ বললাম।'

আল্লাহর উপর যার পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকে তার অবস্থা এমনি হয়। যা পায় তাতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে; আনন্দে আত্মহারা হয় না। আর কিছু না পেলেও সবর করে ও শুকরিয়া আদায় করে; হতাশ হয় না।

## চতুর্থ বিষয়

চতুর্থ যে কথা বলেন :

'ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আমি বিস্মিত, যে আখেরাতের হিসাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপরও দুনিয়ায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে।'

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফেতনা হলো- প্রত্যেক ব্যক্তি কামনা করে—

يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ

'হায়, কারূনের কাছে যে সম্পদ ছিল, আমার কাছেও যদি সে পরিমাণ সম্পদ থাকত!'

(সূরা কাসাস : ৭৯)

কারূনের সম্পদের পাহাড় দেখে সবাই বলত- হায়, আমার কাছেও যদি এত সম্পদ থাকত! বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ফেতনা এটাই। সবাই কারূনের মতো ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। এ কামনা করে না যে- আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে এমন সম্পদ দান করেন যা বিপদাপদমুক্ত। মনে রাখবেন, সম্পদ তার সাথে কোনো না কোনো বিপদ নিয়ে আসে! কমপক্ষে এ ক্ষতি তো হয়ই যে, মানুষ আর মরতে চায় না!

প্রাসাদ আছে, গাড়ি আছে, আনন্দ ও খুশির বসন্ত আছে। এত সব ভোগের বস্তু ছেড়ে যেতে কার মন চাইবে? মরার ইচ্ছাই হয় না! এটা হলো সর্বাপেক্ষা কম বিপদ। এর পরের বিপদ হলো- ভোগ-বিলাসের দরজা খুলে গেলে গুনাহের দরজাও খুলে যায়। সে হয়তো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, কিন্তু সন্তান-সন্ততি গুনাহে লিপ্ত হবে। তাই আল্লাহর কাছে সম্পদ চাইলে বিপদমুক্ত সম্পদ চাইবে। এভাবে- 'হে আল্লাহ, আমাকে এমন সম্পদ দিন, যাতে কোনো বিপদ ও ক্ষতি থাকবে না!'

আমরা সদা সচেষ্ট থাকব ঈমান ও শরীয়তের উপর জীবনযাপন করতে। এমন সম্পদ লাভ করে কী ফায়দা, যাতে আমি হয়তো সুখী হব কিন্তু আমার বংশধররা দীন থেকে দূরে চলে যাবে!

এক ধনী লোক আমার কাছে গর্বের সাথে তার ছেলের কথা বলছিল যে, সে অনেক শিক্ষিত, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক লাভবান হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষে বলল, শুধু নাস্তিক হয়ে গেছে, এই যা!

আপনারাই বলুন, ছেলে নাস্তিক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাবা কীভাবে তার সম্পদশালী হওয়ার ব্যাপারে আনন্দ প্রকাশ করতে পারে?

একটা হলো সম্পদশালী হওয়া আরেকটা হলো সম্পদের চৌকিদার হওয়া। সম্পদশালী তো সেই, যাকে আল্লাহ তাআলা অনেক সম্পদ দিয়েছেন আর সে তার সম্পদ দুই হাতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে। আর সম্পদের

চৌকিদার হলো সে ব্যক্তি, যে সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে- এখন কত হয়েছে? এখন আমার একাউন্টে এত লাখ টাকা এসেছে! এত কোটি টাকা হয়ে গেছে!

মনে রাখতে হবে—

حلالها حساب وحرامها عذاب

'হালাল সম্পদের হিসাব দিতে হবে আর হারাম সম্পদের কারণে আযাব হবে।'

হালাল সম্পদ থাকলেও তার হিসাব দিতে হবে আর হারাম সম্পদ থাকলে দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে। তাই আল্লাহর কাছে এভাবে দুআ করতে হবে যে, 'আল্লাহ, এতটুকু সম্পদ দান করুন, যেন অন্যের মুখাপেক্ষী না হতে হয় আর বিপদমুক্ত সম্পদ দান করুন!'

রাসূল সা. বলেন :

'আমার উম্মতের গরিবদেরকে ধনীদের চেয়ে পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।'

রাসূল সা. এ দুআ করেছেন :

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ

'হে আল্লাহ, আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবিত রাখুন, মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দিন আর মিসকিনদের সাথে আমার হাশর করুন!' (ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪১২৬)

রাসূল সা. আরো বলেন :

الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

'যার কোনো ঘর নেই, দুনিয়া তার ঘর। যার কোনো সম্পদ নেই, দুনিয়া তার সম্পদ। সম্পদ সেই জমা করে, যার জ্ঞান-বুদ্ধি নেই!' (শুআবুল ঈমান : ১০১৫৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩৫৭০৭)

এর কারণ কী? সম্পদের হিসাব দিতে হবে তার, অথচ আয়েশ করবে তার বংশধররা। বর্তমানে মানুষের অবস্থা যদি খেয়াল করেন তো দেখতে পাবেন, এই যে মানুষ সুদ খায়, ঘুষ নেয়, হালাল-হারামের বাছ-বিচার করে না, ধোঁকা-প্রতারণা করে সম্পদ উপার্জন করে, এর বাহানা হলো সন্তান-সন্ততির সুখ।

এক ঘুষখোরকে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কেন ঘুষ নেন?'
সে বলল, 'মৌলবী সাহেব, আমরা তো দুই রুটি খেয়েই জীবন কাটাচ্ছি। ঘুষ নিই শুধু এজন্য যে, আমার সন্তানরা যেন ভালোভাবে পড়ালেখা করতে পারে এবং ভালো খাবার খেতে পারে।'

দেখুন, এ লোক সন্তানাদির সুখের লক্ষ্যে নিজের জন্য জাহান্নাম কামাই করছে! এ কারণেই কুরআন মাজীদে সন্তানকে ফেতনা বলা হয়েছে—

إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

'নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি হলো ফেতনা!'
(সূরা তাগাবুন : ১৫)

তাই আল্লাহ তাআলা কাউকে এ নেয়ামত দান করলে তার কর্তব্য হলো- আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি খরচ করা, আখেরাতের জন্য ব্যয় করা।

হযরত উমর রা. এর খেলাফতকাল। তিনি বাইতুল মাল থেকে সামান্য ভাতা নিতেন। কয়েকজন সাহাবী একত্র হয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আলী রা.ও ছিলেন। তাঁরা আলোচনা করলেন, আমীরুল মুমিনীন খুবই সামান্য ভাতা গ্রহণ করেন। এতে তাঁর সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয় না। তাই তাঁর ভাতা বাড়ানো উচিত। সবাই এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, খলীফার ভাতা বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এ নিয়ে যে, খলীফাকে এ কথা বলবে কে? সবাই জানতেন যে, তাঁকে এ পরামর্শ দিলে চাবুক খেতে হবে। তাই ভয়ে কেউ বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। সবাই পরামর্শ করে এ বুদ্ধি বের করলেন যে, খলীফাকন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রা. কে এ দায়িত্ব দেয়া হোক। তিনি এক সুযোগে পিতাকে এ কথা বলবেন।

হযরত হাফসা রা. কে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি একদিন পিতাকে বললেন, 'সবাই চাচ্ছে, আপনার ভাতা যেন বাড়ানো হয়!'
উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কথা কে বলেছে?'
তিনি বললেন, 'আমি কারো নাম বলব না!'
উমর রা. বললেন, 'হাফসা, তুমি নাম বললে আমি তাদেরকে চাবুকপেটা করতাম!'

এরপর বললেন, 'হাফসা, তুমি তো রাসূল সা. এর ঘরে জীবনযাপন করেছ। তুমিই বলো, আমাদের নবীজির জীবন কেমন ছিল?'
তিনি বললেন, 'রাসূল সা. এর গেরুয়া রঙের দুটি কাপড় ছিল। কোনো কাফেলা আসলে তা পরিধান করতেন। ঘুমাতেন চাটাইয়ের উপর। মাথার নিচে থাকত খেজুরের ছাল দিয়ে বানানো বালিশ। একবার আমি রুটি বানানোর সময় ঘিয়ের ডিব্বার নিচে রয়ে যাওয়া সামান্য ঘি রুটিতে লাগিয়ে দিলাম। খাওয়ার সময় দেখি, রাসূল সা. সেই রুটি নিজেও আগ্রহ সহকারে খাচ্ছেন, অন্যদেরকেও খাওয়াচ্ছেন।
একদিন রাসূল সা. খানা খেতেন, পরেরদিন উপোস করতে হত। লাগাতার তিনদিন এমন কাটেনি, যাতে তিনি পেট পুরে খেয়েছেন।'

হযরত উমর রা. বললেন, 'আমার নবী যেভাবে জীবনযাপন করেছেন আমি যদি সেভাবে জীবনযাপন না করি তাহলে আমার মনজিল বদলে যাবে! আমিও এই পদ্ধতিতে চলব।'

এঁরাই আমাদের পূর্বসূরি। আর আমরা বসে বসে শুধু দুআ করি, এটা যেন পাই, ওটা যেন পাই। হ্যাঁ, দীনের কাজ করতে সবকিছু চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেবল পার্থিব আরাম-আয়েশের জন্য হারাম কাজ করা বা হারাম পদ্ধতিতে সম্পদ উপার্জন করা মূলত জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

## পঞ্চম বিষয়

বুযুর্গ বলেন :
'আমি বিস্ময় বোধ করি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে জাহান্নামের আগুনের কথা জানে, তারপরও সে গুনাহ করে!'

জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি মারাত্মক। হাদীস শরীফে এসেছে :

اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا

'জাহান্নামের আগুন তার প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ করে বলে- আমার কিছু অংশ (এত উত্তপ্ত যে, তা) অপর অংশকে খেয়ে ফেলে!'
(সহীহ বুখারী : হাদীস ৩২৬০)
কী ভয়ঙ্কর আগুন! এ আগুনে মানুষকে পোড়ানো হবে।

শিশুদেরকে স্কুলে পড়ানো হয় যে, আগুনের স্ফুলিঙ্গের সবচেয়ে ভেতরের অংশ হলুদ বর্ণের। তার একটু বাইরের অংশ লাল, যা একটু বেশি গরম থাকে। আর একদম বাইরের অংশ নীল, এটা সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত থাকে। এরচেয়ে বেশি গরম থাকে সর্বশেষ অংশ, যা দেখাই যায় না। বোঝা গেল, আগুন যত বেশি উত্তপ্ত হয় তত বেশি কালো হয়। আর রাসূল সা. চৌদ্দশ বছর পূর্বে বলে গেছেন, জাহান্নামের আগুন যত বেশি গরম হবে তত বেশি অন্ধকার থাকবে।

আমি একবার এক স্টিল মিলে গিয়েছিলাম। সেখানে নিজ চোখে দেখেছি, লোহা এমনভাবে গলে যায় যে লোহার ছোটখাট নহর পানির মতো প্রবাহিত হয়। সেখানকার লোকেরা আমাকে জানায় যে, লোহা গলানোর মেশিনের তাপমাত্রা এত বেশি থাকে যে, আগুন চোখে পড়ে না, অথচ লোহা ভেতরে যাওয়ামাত্রই গলে যায়।

ঐ আগুন দেখে আমি মনে মনে বললাম, হায় আল্লাহ, জাহান্নামের আগুন কেমন হবে?

মানুষের এ সকল গুনাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিয়ে যাবে। তাই গুনাহ থেকে আমাদের তাওবা করে পুণ্যময় জীবনযাপন করার নিয়ত করতে হবে। কয়েক মুহূর্তের গুনাহের জন্য শত শত বছর আগুনে জ্বলতে হবে। আমি বিস্ময় বোধ করি ঐ ব্যক্তিকে দেখে, যে জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহতা জেনেও আল্লাহর নাফরমানি করে।

## ষষ্ঠ বিষয়

বুযুর্গ বলেন :

'আমি বিস্মিত হই তাকে দেখে, যে জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও অন্য কিছু পেয়ে আনন্দ বোধ করে।'

মুমিন যখন জান্নাতের পরিচয় পাবে যে, আল্লাহ তাআলা কেমন জায়গা বানিয়ে রেখেছেন, তখন তার উচিত, একেবারে জান্নাতে গিয়ে দম ফেলা। সারাক্ষণ আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করা। রাসূল সা. আমাদেরকে এ দুআ শিক্ষা দিয়েছেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسئلك الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নাত কামনা করি আর জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'
(মুসনাদে সিরাজ : নং ১৯৬)

মুমিনের অন্তরে এ আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে তাঁর পছন্দনীয় স্থান জান্নাত দান করেন।

কুরআন মাজীদে আছে :

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ

'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শান্তির ঘরের দিকে আহ্বান করেন।'
(সূরা ইউনুস : ২৫)

আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দাওয়াত দিচ্ছেন। মহান আল্লাহই যখন আমাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন, তখন আমাদের এমন আমল করা উচিত, যাতে আমরা জান্নাতে পৌঁছে দম ফেলতে পারি। আর জান্নাত লাভ হয় নেকির মাধ্যমে।

জান্নাতে সর্বোত্তম যে নেয়ামত পাওয়া যাবে তা হলো আল্লাহর দীদার (দর্শন) ও তাঁর সন্তুষ্টি। এরচেয়ে বড় আর কোনো নেয়ামত হতেই পারে না যে, বান্দা তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। এরপর সবচেয়ে উত্তম যে নেয়ামত লাভ হবে তা হলো- রাসূল সা. এর সাথে সাক্ষাৎ এবং অন্য নবীগণের সাথে সাক্ষাৎ। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে এ সকল নেয়ামত লাভের দুআ করা উচিত।

কুরআন মাজীদে আছে :

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

'যোগ্য আসনে; সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।' (সূরা কামার : ৫৫)

মহান প্রতাপশালী আল্লাহ তাআলার কাছে যেন স্থান লাভ করতে পারি, যেখানে তাঁর দীদার নসিব হবে।

মানুষের আসল আরাম-আয়েশ তো হবে জান্নাতে। তাই তো মহানবী সা. বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَه

'হে আল্লাহ, আখেরাতের শান্তি ছাড়া তো কোনো শান্তিই নেই!'
(সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৪১৩-১৪)

জান্নাতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে ছোট প্রভুত্ব দান করবেন। কুরআনে তিনি বলেন :

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾

'সেখানে তোমাদের জন্য সে সব কিছু থাকবে, যা তোমরা চাইবে এবং যা তোমরা কামনা করবে!'
(সূরা হা-মীম-সাজদাহ : ৩১)

দুনিয়ায় কারো বাসায় মেহমান আগমন করলে মেজবান তার সামনে এমন আয়োজন করার চেষ্টা করে যাতে সে খুশি হয়। কিন্তু সবকিছু তার মর্জি মোতাবেক করা সম্ভব হয় না। আল্লাহ তাআলা সর্বাধিপতি, সৃষ্টিকর্তা। তিনি এমন জান্নাত বানিয়েছেন যে, তিনি বলেন : ওহে আমার মেহমানেরা! তোমাদের অন্তরে যত আকাঙ্ক্ষা থাকবে, তার সবই পূরণ করা হবে।
সত্য কথা হলো, গায়ের চামড়া কেটে নেয়ার বিনিময়েও যদি আমরা জান্নাতে যেতে পারি এবং আল্লাহর দীদার লাভ করতে পারি, তবুও তা খুবই লাভজনক হবে।

## সপ্তম বিষয়

তিনি বলেন :
'ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আমি আশ্চর্য বোধ করি, যে শয়তানকে শত্রু জেনেও তার অনুসরণ করে।'

আল্লাহ তাআলা শয়তানকে মানুষের শত্রু বলে ঘোষণা দিয়েছেন—

إِنَّ الشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরাও শয়তানকে শত্রু বানিয়ে রাখো।'
(সূরা ফাতির : ৬)

একদিকে আমরা স্বীকার করি যে, শয়তান আমাদের দুশমন, অপরদিকে তার কথাই মান্য করি। অথচ শয়তান আমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন। আমার কথা একটু খেয়াল করে শুনুন! কেউ যদি আপনার বাবা-মার শরীর থেকে কাপড় সরিয়ে দেয় তাহলে আপনি কী পরিমাণ রেগে যাবেন? তাকে আপনার ভয়ঙ্কর শত্রু মনে করবেন না? আর কেউ যদি আপনার বাবা-মার

কাপড় খুলে ঘর থেকে বের করে দেয়, তাহলে আরো বেশি ক্রোধান্বিত হবেন না? এবার শুনুন, শয়তান আমাদের এমনি দুশমন। সে আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আ. ও আদি মাতা হযরত হাওয়া আ. এর শরীর থেকে জান্নাতের পোশাক সরিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। সে মিথ্যা কসম খেয়ে তাঁদের দুজনকে ধোঁকা দিয়েছিল। কুরআনে এর বিবরণ রয়েছে। ভেবে দেখুন, যে মিথ্যা শপথ করে আমাদের বাবা-মায়ের সাথে এমন জঘন্য ব্যবহার করেছে সে আমাদের কত বড় শত্রু!

শয়তান আমাদেরও কল্যাণ চায় না। সে আমাদেরকেও জাহান্নামে পাঠাতে সারাক্ষণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাই বলা হয়, শয়তান আমাদের এমন দুশমন, যে ঘুষ নেয় না। সে আমাদের এমন মহাশত্রু, যে তোষামোদেও গলে না। এমনটি কখনো হবে না যে, আপনি কিছুক্ষণ শয়তানকে তোষামোদ করলেন আর সে খুশি হয়ে বলল যে, আমি তোমাকে আর প্ররোচিত করব না।

অথবা আপনি তাকে ঘুষ দিয়ে বললেন যে, এই যে ঘুষ নাও এবং আমাকে ছেড়ে দাও।

শয়তান যেহেতু আমাদের এত বড় দুশমন, তাই আমাদের অবশ্যকর্তব্য হলো- আমরা শয়তানের কথা শোনার পরিবর্তে দয়ালু আল্লাহর বান্দা হয়ে জীবনযাপন করব।

আমরা কী করি? মজলিসে ও প্রকাশ্যে শয়তানকে আমাদের দুশমন সাব্যস্ত করি আর গোপনে সেই শয়তানেরই আনুগত্য করি। এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾
وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ
أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

'হে আদমসন্তান! আমি কি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা নিইনি যে, তোমরা শয়তানের আনুগত্য ও ইবাদত করবে না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আর আমার ইবাদত করবে। এটাই সরল পথ।

শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি?'
(সূরা ইয়াসীন : ৬০-৬২)

তাই আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করব যে, তিনি যেন বিতাড়িত শয়তান থেকে আমাদেরকে হেফাযত করেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বার্ধক্যে এ দুআ করতেন : 'হে আল্লাহ, আমাকে চুরি ও ব্যভিচার থেকে রক্ষা করুন!'
কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এত বৃদ্ধ বয়সেও এমন দুআ করছেন! (অথচ বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত কেউ চুরি-ব্যভিচার করে না)'
তিনি উত্তর দিলেন,

كيف امن على نفسي والشيطان حي؟

'শয়তান যখন জীবিত, আমি কীভাবে নিজের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারি?'

শয়তান যেহেতু জীবিত, তাই আমাদের উচিত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা।

আল্লাহর এক নেক বান্দি ছিলেন হযরত রাবেয়া বসরী রহ.। তিনি তাহাজ্জুদে উঠে দুটি কথা বলতেন। প্রথম কথা হলো- 'হে আল্লাহ, দুনিয়ার সকল বাদশাহ তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু তোমার দুয়ার এখনো খোলা আছে। আমি তোমার সামনে আমার আঁচল পেতে দিচ্ছি!'
দ্বিতীয় কথা হলো- 'হে আল্লাহ, আপনি যেভাবে আকাশকে জমিনে পতিত হওয়া থেকে বিরত রেখেছেন, তেমনি শয়তানকে আমার থেকে দূরে রাখুন!'

আমাদেরও উচিত, আমরা দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর কাছে এ দুআ করব- হে আল্লাহ, শয়তানকে আমাদের উপর প্রবল হতে দিবেন না! আমাদেরকে রক্ষা করুন! আপনার সাহায্য ছাড়া আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারব না। আয় আল্লাহ! শয়তান আমাদেরকে দেখে, আমরা তাকে দেখি না। তাই আমরা শয়তানের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যাই। অথচ শয়তান চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের পেছনে লেগে থাকে।
হে আল্লাহ! শয়তান ঈমান হরণকারী! এর থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন!
দুনিয়ার একটি নিয়ম হলো, কোনো কাফেলার সম্পদ লুণ্ঠিত হলে বা কারো সম্পদ চুরি হলে তার প্রতি সবার করুণা হয়। হে আল্লাহ! আমরা লুণ্ঠিত কাফেলার মতো! এই হতভাগা শয়তান আমাদের নেক কাজসমূহকে নষ্ট করে

দিয়েছে; কখনো রিয়া-লৌকিকতার মাধ্যমে, কখনো হিংসার মাধ্যমে আর কখনো অন্য কোনোভাবে। আমরা লুণ্ঠনের শিকার! দুনিয়ার মানুষ লুণ্ঠিতদের করুণা করে, আপনিও দয়া করুন এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন!

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে শয়তান তার পুরো শক্তি ব্যয় করে। বর্ণিত আছে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. অন্তিম মুহূর্তে কয়েকবার 'লা' (না) বললেন। এরপর চুপ হয়ে গেলেন। তাঁর শিষ্যরা হতবাক! যিনি মুহাদ্দিসদের ইমাম, যুগের সেরা ফকীহ, এত বড় ব্যক্তিত্ব, কুরআনের মাখলুক হওয়ার মাসআলায় যিনি অটল, জীবনের শেষ মুহূর্তে না না বলছেন কেন!

আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুক্ষণ পর তাঁর অবস্থা একটু ভালো হলো। তখন কেউ জিজ্ঞেস করল, 'হযরত, আপনি না না বলছিলেন কেন?'

তিনি বললেন, 'তখন শয়তান আমার সামনে উপস্থিত হয়ে আমাকে বলেছিল- হে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল! আপনি ঈমান রক্ষা করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন!

আমি প্রত্যুত্তরে বলছিলাম- না না। আমার শেষ নিঃশ্বাস বের না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার প্ররোচনা থেকে বাঁচতে পারব না!'

আমাদের আকাবির এভাবে শয়তানের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতেন।

## অষ্টম বিষয়

ঐ বুযুর্গ সর্বশেষ যে কথা বলেন—

'ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আমি আশ্চর্য বোধ করি, যে আল্লাহ তাআলার সত্তা সম্পর্কে অবগত, তবুও সে অন্য কারো স্মরণে নিমগ্ন থাকে।'

মানুষের অন্তর দেখুন, সবাই সৃষ্টিজীবের স্মরণে মগ্ন। একজন আরেকজনকে বলে- আমি তোমাকে অনেক মিস করি!

আমরা কি আল্লাহ তাআলাকে এভাবে মিস করি?

আমরা কি মহান আল্লাহর জন্য উদাস হই?

যে ব্যক্তি আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব জানে, আল্লাহকে স্মরণ করার স্বাদ ও মজা যে পেয়ে গেছে, আল্লাহর স্মরণ ছাড়া অন্য কিছুতে সে প্রশান্তি লাভ করে না। সে বলে- হে আল্লাহ, আপনার স্মরণ ছাড়া দুনিয়ায় আর কী আছে!

ইমাম রাযী রহ. বলেন :

'আয় আল্লাহ! তোমার স্মরণ ছাড়া দিন ভালো কাটে না!
তোমার সাথে নির্জনে কথা না বললে রাত ভালো লাগে না!'
আমাদের জীবনও যেন এমন হয়ে যায়!
আমরাও যেন কবির সাথে সুর মেলাতে পারি—

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے
تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانۂ دل آباد رہے
سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے، دل شاد رہے
سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے
اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان اے میرے الٰہ
لا الٰہ الا اللہ، لا الٰہ الا اللہ، لا الٰہ الا اللہ، لا الٰہ الا اللہ

'তোমার স্মরণে সব ভুলে যেতে চাই, কিছুই যেন আমার মনে না থাকে!
তোমার চরণে ঘরবাড়ি সব লুটিয়ে দিব, হৃদয়ের ঘর যেন আবাদ থাকে!
সব খুশিতে আগুন লাগিয়ে দিব; তোমার বেদনায় অন্তর যেন খুশি থাকে!
সবাইকে দৃষ্টি থেকে ফেলে দিব; কেবল তোমার কাছেই ফরিয়াদ জানাব!
শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মুখে কেবল তোমার নামই থাকবে!
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!'

نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے
تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے

'কারো সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না, শুধু নিজের কাজই করব।
তোমার যিকির, তোমার ফিকির, তোমার নাম ও তোমার স্মরণে কাটাব!'

হে আল্লাহ, আমাদের জীবনও এমন বানিয়ে দিন, যেন আমরা আপনার স্মরণে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ধোঁকার ঘর দুনিয়ার প্রবঞ্চনা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন এবং ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার তাওফীক দিন, আমীন!

﴿وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

## শায়খ যুলফিকার নকশবন্দী হাফিযাহুল্লাহুর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন

### প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
১. মেট্রিক, ফার্স্ট ক্লাশ ১৯৬৭ ঈ.
২. বিএসসি পাঞ্জাব, প্রথম বিভাগ ১৯৭১ ঈ.
৩. রুল অব অনারের সম্মান লাভ ১৯৭১ ঈ.
৪. বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্স্ট ডিভিশন ১৯৭৬ ঈ.
৫. কম্পিউটার প্রজেক্টের বিশেষ সম্মান ৪০০/৪০০
৬. ম্যানেজমেন্ট কোর্স ১৯৭৬ ঈ.
৭. ম্যানেজমেন্ট কোর্স এম.এপি ১৯৯০ ঈ.
৮. স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট কোর্স ১৯৯০ ঈ.
৯. শর্টকোর্স ইন লাইব্রেরি সাইন্স ১৯৯০ ঈ.
১০. প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স সুইডেন, ১৯৯০ ঈ.
১১. হিউম্যান রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট কোর্স ১৯৯১ ঈ.

### সামাজিক অবদান
১. অপারেন্টস ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ১৯৭৬ ঈ.
২. পাকিস্তান সোসাইটি অব সুগার টেকনোলোজিস্ট-এর মেম্বার ১৯৭৭ ঈ.
৩. এসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ১৯৭৮ ঈ.
৪. ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ১৯৭৯ ঈ.
৫. মেম্বার, পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং কাউন্সিল ১৯৭৯ ঈ.
৬. চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ১৯৮২ ঈ.
৭. গোল্ড মেডেল [সমৃদ্ধ প্রবন্ধের জন্যে] ১৯৮৪ ঈ.
৮. সিনিয়র মেম্বার অব ইনস্ট্রুম্যান্ট সোসাইটি আমেরিকা ১৯৮৪ ঈ.
৯. জেনারেল ম্যানেজার প্লানিং ১৯৯১ ঈ.
১০. এশিয়াভিত্তিক কেমিকেল ইনস্ট্রুম্যান্ট কনফারেন্স সিঙ্গাপুর-এ অংশগ্রহণ ১৯৯১ ঈ.

### ধর্মীয় তৎপরতা
১. হিফযুল কুরআন
২. দ্বীনি শিক্ষাগ্রহণ ও পাঠদান ১৯৬২-১৯৮২ ঈ.
৩. দাওরায়ে হাদীস [সম্মানজনক সনদ] জামিয়া রহমানিয়া জাহানিয়া মাণ্ডি
৪. দাওরায়ে হাদীস [হিজাযী সনদ] জামিয়া কাসেমুল উলূম মুলতান
৫. সিলসিলায়ে নকশবন্দিয়ার বাইআত গ্রহণ ১৯৭১ ঈ.
৬. হযরত মুরশিদে আলম গোলাম হাবীব রহ. থেকে খেলাফত লাভ ১৯৮৩ ঈ.
৭. দারুল উলূম জঙ্গ-এর মুহতামিম ১৯৮৪ ঈ.
৮. ওয়াশিংটন সামার স্কুলে পাঠদান ১৯৮৬ ঈ.
৯. জামিয়া আয়েশা মহিলা মাদরাসার পরিচালক ১৯৮৯ ঈ.
১০. জামিয়াতুল হাবীব ফয়সালাবাদ-এর প্রধান
১১. জামিয়াতুস সালেহা ফয়সালাবাদ-এর প্রধান
১২. মাদরাসা তা'লীমুল ইসলাম ফয়সালাবাদ-এর প্রধান
১৩. মা'হাদুল ফকীর ইকবাল টাউন-এর পরিচালক
১৪. জামিয়া যয়নাব ইসলামাবাদ-এর পরিচালক
১৫. জামিয়া ইহয়াউল উলূম করাচি-এর পরিচালক

### দাওয়াতী সফর
১. ইসলাম সম্পর্কে সুইডেনে বিভিন্ন লেকচার ১৯৯০ ঈ.
২. গলফ ক্লাবে লেকচার ১৯৮৯ ঈ.
৩. রোটারি ক্লাবে লেকচার ১৯৯৫ ঈ.
৪. সউদি আরব, মিসর, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আমেরিকা [২২ প্রদেশ], উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, গিরগিস্তান, তাতারিস্তান, রাশিয়া, ইউক্রেন, আফগানিস্তান, হাঙ্গেরী, ব্রিটেন, জার্মান, নরওয়েসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে দাওয়াতী সফর করে ইসলাম সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন।

মাকতাবাতুল আযহার পরিবার হযরতের দীর্ঘ হায়াত কামনা করে।


maktabatulazhar@yahoo.com

MAKTABATUL AZHAR
মাকতাবাতুল আযহার

**প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র**
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
9881532, 01924076365

**বাংলাবাজার শাখা**
১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা : 01715023118

**যাত্রাবাড়ি শাখা**
৩৪, ৩৫, ৩৬ কিতাব মার্কেট, জামেয়া মাদানিয়া
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। 01975023118

cover . kazi jubair mahmud. 01830338105